দর্পণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

7.2.53
Agartala

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

কলিকাতা

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়েচার টাকা

লেখকের কথা

প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটি পাটনার একটি মাসিকে মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। অন্য নাম দিয়েছিলাম। কিছুদিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। অসমাপ্ত বইখানা সম্পূর্ণ করে দর্পণ নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম।

এই বইখানা যে করিয়ে ছেপে প্রকাশ করতে প্রকাশক বুক এম্পোরিয়ামের শ্রীবীরেন ঘোষ যে অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। কপি দেওয়া আর প্রুফ দেখার ব্যাপারে ভদ্রলোককে যে কত জ্বালাতন করেছি তা তিনি জানেন আর আমি জানি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়, ১৩৫২

এই লেখকের কয়েকখানি বই—

পুতুল নাচের ইতিকথা	(৩য় সংস্করণ)	৫৲
পদ্মানদীর মাঝি	(৪র্থ সংস্করণ)	৩৲
দিবারাত্রির কাব্য	(২য় সংস্করণ)	২৸০
প্রতিবিম্ব	(২য় সংস্করণ)	১৸০
চিন্তামণি		১৸০
জীয়ন্ত		৪৲
সোনার চেয়ে দামী		২৲
ঐ	(২য় খণ্ড)	২৷৷০
শ্রেষ্ঠ গল্প		৫৲
ইতিকথার পরের কথা	(যন্ত্রস্থ)	

রম্ভা ছিল ঝুমুরিয়া গাঁয়ে। রামপাল কলকাতায়।

রম্ভা ঝুমুরিয়ার বীরেশ্বর মাইতির মেয়ে। বাড়ন্ত মেয়ে, অতি বাড়ন্ত। তার ভাইদের সকলেরই লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা, কেবল ছোটজন ছাড়া। জন্মেই নিজের মাকে খাওয়ায় সে মায়ের দুধ পায় নি। সকলের মতে বেচারীর কৃশ আর খর্ব্ব হওয়ার কারণ তাই। রম্ভা কিন্তু বলে যে তা নয়, এটা বেশী আদর খেয়ে পেটরোগা হবার পরিণাম।

রম্ভা বাপমার এক মেয়ে। আদর সেও কিছু কম পায় নি। তাতে স্বভাব যদি তার বিগড়ে গিয়ে থাকে, দেহের কিছু হয় নি। গোড়ায় সে লম্বা হয়েছে বাঁশের মত, তারপর পুষ্ট হয়েছে বর্ষার কলাগাছের মত। কলাগাছের মত আগাগোড়া সর্ব্বাঙ্গে সমানভাবে নয়, লঘু গুরুত্বের মেয়েলি ছাঁদটা বজায় রেখে। যেমন, তার কাঁকাল যেন মোটেই মোটা হয় নি, দশ এগার বছর বয়সে যেমন ছিল তেমনি সরু থেকে গেছে। ঈষৎ অনুজ্জ্বল মোলায়েম বাদামী রঙের এই প্রতিমার ধাঁচে গড়া দেহটির জন্য তার অহঙ্কার কতখানি হয়েছে জানা যায় না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই বড় সে রাগী আর তেজী। রূপের গর্ব্ব যদি তার জন্মে থাকে বড় হয়ে, তেজের সঙ্গে মিশে সেটাকেই তা আরও জোরালো করেছে। এ স্বভাবটা সে পেয়েছে তার বাপের কাছে। বদমেজাজ আর জিদের জন্য বীরেশ্বরের এ অঞ্চলে রীতিমত খ্যাতি আছে। মেয়ের বাড়াবাড়ি অবশ্য মাঝে মাঝে বীরেশ্বরের মেজাজে আগুন ধরিয়ে দেয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তর্জনগর্জনের তাপটুকুই শুধু রম্ভার গায়ে লাগে, আর কোন শাস্তি সে পায় না। শাসনের ব্যবস্থা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। কারণ, মেয়ের স্বভাবের এই গুরুতর তেজস্বিতার দোষের জন্যই নিজের অজান্তে বীরেশ্বর তাকে বড় পছন্দ করে।

বিয়ের বয়স রম্ভার পার হয়ে গেছে, ভালমত পাত্র জোটে নি। চাষীর ঘরের পক্ষে তার বেমানান ও নিন্দনীয় রূপ যৌবনটা অবশ্য তার বড় কারণ নয়। ঘরে ঘরে না থাক, এমন অনেক রূপসী মেয়ে আছে অনেক চাষীর ঘরে, চাষী সমাজে যাকে ভাল পাত্র বলা চলে সেরকম পাত্রেরও তাদের অভাব ঘটে নি। বীরেশ্বরের প্রকৃতি আর পছন্দ ওসব লোকের মত হলে কবেই হয় তো রম্ভারও বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু কতকগুলি বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংস্পর্শে বীরেশ্বর জীবনে কতগুলি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। চেতনার যে পরম রসায়ন সকল বিরোধী শক্তির সঙ্গে হার মানার আপোষ করে কোনমতে বেঁচে থাকার সন্তোষ নষ্ট করে দেয় তারই ছিটেফোঁটা সঞ্চারিত হয়েছে তার শোণিতে। তাই রক্তের যে উষ্ণতা তাকে সাধারণ নিয়মে নিছক একজন হিংস্র প্রকৃতির কলহপ্রবণ দাঙ্গাবাজ মানুষে পরিণত করে দিত সেই উষ্ণতা আগুন হতে শিখেছে তার মনের অনুমতি নিয়ে, মন যখন সায় দিয়েছে যে না, এ অন্যায় সত্যই সহ্য করা যায় না। ভালমন্দ পছন্দ-অপছন্দের একটা বিচারবুদ্ধি আছে বীরেশ্বরের, যা প্রায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির সামিল, অবশ্য চাষাড়ে পর্যায়ের।

গাঁয়ের প্রধান, বামুন আর জাতভাইরা মেয়ের জন্য তাকে জাতে ঠেলবার চেষ্টা করে, সে একরকম ব্যক্তিগত জোরজবরদস্তিতে সে চেষ্টা বাতিল করে দেয়।

বলে, 'জাতের বদলে সবাইকে না পারি, দু'একটাকে ফাঁসাবই তোমাদের, মা কালীর দিব্যি। ফাঁসি যেতে হবে? যাবো!'

একবার সে দাঙ্গা করে খুনের দায়ে জেলে যেতে বসেছিল, ঘটনাচক্রে দু'বছর জেল খেটেই রেহাই পায়। আরও কয়েকবার স্বদেশী বাবুদের সংসর্গ দোষের জন্য পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এসব সকলের মনে আছে। বয়স বাড়লেও স্বভাব তার শুধরেছে কিনা সন্দেহ। জাত

মারলে ঠিক কাকে সে ফাঁসাবে তাও ঠিক নেই। সমাজ তাই ব্যক্তিগত-ভাবে ভয় পেয়ে ভাবে, আর কিছুদিন যাক্।

তবে গায়ের জোর আর বেপরোয়া জিদ ছাড়া কি আর আছে বীরেশ্বরের যে সকলকে চিরকাল ভয় দেখিয়ে কাবু করে রাখবে! সে রাজাও নয়, ধনীও নয়, পুলিশও নয়। কাজেই জাত তার শেষে যায়-যায় হল। সাতাইবুনীর লক্ষ্মণ বা পাঁচনিখের কেষ্ট দাসের সঙ্গে রম্ভার বিয়ে দেওয়া অথবা জাত ছাড়া—এ ছাড়া আর পথ রইল না।

রম্ভার বড় ভাই শ্যামলাল, তার বৌয়ের নাম সুরবালা। তাকে রম্ভা জানিয়ে দিল, 'আনো ওদের যেটাকে খুসী, শোন বলি কিন্তু। বিয়ের রাতে খুঁজে পাবে না আমাকে। না পালাই তো বিয়ের আসরে খাড়া লাথি মারব মুখপোড়ার মুখে।'

সুরবালা চোখ কপালে তুলে বলল, 'কেন লো মন্দামাগী? কেষ্টর রঙ তো ফর্শা বেশ?'

'ফর্শা নাকি? তা তুমি এনে পিরীত কোরো, আমি ওতে নেই।'

সুরবালা তখন তামাসা করে বলে, 'সূয্যিবাবুকে বিয়ে করবি?'

তার তামাসায় রম্ভা হাসে না, তামাসা করে না। হঠাৎ নিরীহ শান্ত বনে গিয়ে চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'হুঁ।'

সুরবালা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রম্ভা তামাসা করছে না এটুকু টের পেয়েই সে অবাক হয়। ভাবে একি উদ্ভট পছন্দ বাবা মেয়ের! বিশ বাইশ বছরের রোগা কালো এক ছোকরা, চালচুলো নেই বললে চলে, গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার হুকুম যার নেই, রোজ যাকে পাঁচনিখে থানায় হাজিরা দিতে হয় আর দাগী চোরের মত ধরে আছে কিনা জানতে চৌকীদার কানাই গভীর রাতে নাম ধরে হাঁক দিয়ে যায়, তাকে মনে ধরেছে রম্ভার এত বর থাকতে! যেমন পাগল তার শ্বশুর, তেমনি পাগল তার এ মেয়ে।

রাত্রে চুপি চুপি শ্যামলালকে কথাটা সে জানিয়ে দেয়। শ্যামলাল শুনে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'বাড়ী ঢুকতে দেয়া উচিত নয় ছোঁড়াকে। বাবা যে কি দেখেছে ছোঁড়ার মধ্যে, হাঁ করে বসে গিলবে কথাগুলো। গুরু ঠাকুর এয়েছেন যেন, খাতির কত!'

'মেয়ের বাপ নয় গো খালি, মেয়েও কথা গেলেন হাঁ করে। অ্যাদ্দিন কি টের পেয়েছি ছুঁড়ির মনে কি আছে?'

কথাটা নিয়ে বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে ক'দিন গুঞ্জন চলে—রম্ভা ছাড়া। বীরেশ্বরের মেজ ছেলে জীবনলালের বৌ মায়া অন্য সকলের সামনে গম্ভীর মুখে বলে, 'মাগো! একি কাণ্ড?'—তারপর রম্ভাকে একা পেলে একগাল হেসে শুধোয়, 'আমায় কেন বলিস নি অ্যাদ্দিন? বল্ ভাই সব, বলতে হবে।'

অ্যাদ্দিন বলার কি ছিল রম্ভা ভেবে পায় না। সূর্য্যকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই এর চেয়ে বেশী কি বলার আছে তাও সে ভেবে পায় না।

পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে কথাটা একটু নাড়াচাড়া করেই চুপ করে যায়। শ্যামলাল একবার সূর্য্য সম্পর্কে বাবাকে সতর্ক করতে গিয়ে এত বয়সে এমন প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিল, যা প্রায় গালের সামিল। বীরেশ্বরের কাছে আবার এবিষয়ে কথা তোলার সাহস কারো ছিল না।

বর্ষায় ঝুমুরিয়া ও ঝুমুরিয়ার চারিদিক কাদায় কাদাময় হয়ে যায়। লোনা জলের বন্যাও আসে কোন কোন বছর, সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যায়। বৃষ্টি মাথায় করে জলকাদা ভেঙ্গে সূর্য্যকে পাঁচনিখে যেতে আসতে হয় বলে এ বছর সূর্য্যের জন্য মমতা আর যে অপ্রত্যক্ষ শক্তি বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে রাগটা রম্ভার যেন বেশী হয়। জোরে বর্ষা নামলেই নিজেকে তার মনে হয় বন্দিনী, ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে সে হাতে হাত কচলায়। তারপর ধৈর্য্য হারিয়ে উঠানে নেমে জলে ভিজে

-আসে এবং অসময়ে ঝোঁকের মাথায় চুল ভেজানোর আপশোষে নিজের ওপর রাগ করে গুম্ খেয়ে বসে থাকে!

হঠাৎ ওঘরে গিয়ে বলে, 'বাবা, শুনছো? সেই গপ্পোটা বলো দিকি। সেই যে কার সঙ্গে কোথায় ক'মাস ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলে ধরা দেয়ার আগে?'

বীরেশ্বর মনে মনে খুসী হয়। বাইরে বিরক্তি জানিয়ে বলে, 'হাজারবার 'তো শুনলি।'

তা ঠিক। শুনে শুনে সে কাহিনীর খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত রম্ভার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু প্যাঁজলঙ্কা দেয়া পুরাণো চালভাজার মত বেশ লাগবে -বাদলার দিনে আবার সেই পুরাণো রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে।

'আবার বলো।'

চৌকীর এক কোণে পা তুলে দু'হাতে বুকের কাছে হাঁটু জড়িয়ে বসে হাঁটুর জোড়ে থুতনি রেখে রম্ভা গল্প শোনে। গল্প শেষ হলে খানিক চুপ করে থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'গরীব হলে তো মানুষ কষ্ট পাবেই, না?'

বীরেশ্বর গরীবের কষ্ট পাওয়ার কথা কিছু বলে নি। প্রশ্নটা সে বুঝতে পারে না।

রম্ভা আপন মনে বলে, 'তবে যে সূর্য্যবাবু বলে বড়লোকদের জন্য গরীবরা কষ্ট পায়? বড়লোকরা চোর, ডাকাত?'

বীরেশ্বর ভেবে চিন্তে বলে, 'হাঁ, গরীবরা সব দেশে কষ্ট পায়। তবে আমাদের মত নয়, এই আর কি।'

বর্ষার পর মেয়েকে নিয়ে বীরেশ্বরের একবার কলকাতা যেতে হল।

লোকনাথ দত্ত কলকাতায় থাকেন। কয়েকটা কারখানা আছে, মস্ত -বড়লোক। তার বাপের ছোটখাট জমিদারী ছিল ঝুমুরিয়া ও আশে-

পাশের গাঁয়ে। এখন সামান্য অবশিষ্ট আছে। বাকীটুকুও যাক, লোকনাথ অবশ্য তা মোটেই চান না, তবে এই সামান্য আয়ের জমিদারী-টুকুর জন্য নিজে তিনি আর বিশেষ মাথা ঘামাতে বা কষ্ট করতে রাজী নন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই ঝুমুরিয়ার বাড়ীতে থেকে জমিদারীটুকু দেখা শোনা করতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর বড় ছেলে বিদেশে চাকরী করে। পরিবার প্রতিপালন ও বাপের দায়িত্ব পালন করার ভার পড়েছে অন্য ছেলেটির ঘাড়ে। তার নাম শশাঙ্ক। সে ঘরবাড়ী আগলায় আর যতদূর সম্ভব কম পরিশ্রমে খাজনাপত্র যা কিছু আদায় করে তাই দিয়ে মা, বোন আর বৌয়ের ভরণপোষণ চালায়।

শশাঙ্ক কলকাতায় যাবে। তার সঙ্গে কালীঘাটে কালী দর্শন ও গঙ্গাস্নান করতে যাবে তার মা আর রম্ভার পিসী।

রম্ভা প্রথমে আবদার এবং তারপর জিদ ধরল, সেও পিসীর সঙ্গে কলকাতা যাবে। বেশ, ফিরে আর সে আসবে না, আসতে চায় না। হয় গঙ্গায় ডুবে নয় হাওয়া গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে। আর যেতে যদি তাকে না দেওয়া হয়, বাড়ীর কাছেই পুকুর আছে, দড়িরও কিছু অভাব নেই ঘরে।

মেয়ের জন্য এতদিন যত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জ্বালাটা এবার বীরেশ্বরের পড়ল গিয়ে মেয়ের ওপরে। কাটারি নিয়ে সে রম্ভাকে কাটতে গেল। চকচকে ধারালো সে কাটারি, বীরেশ্বর রাগের মাথায় কোপ বসিয়ে দিলে মানুষ একঘায়েই হয়তো দু'খণ্ড হয়ে যাবে—কটা কোপ বসিয়ে সে ক্ষান্ত হবে কেউ জানে না। বাড়ীর কেউ, ছেলেরা পর্য্যন্ত, বাপকে গিয়ে আটকাতে ভরসা পেল না। রম্ভার মা বেঁচে থাকলে কি করত বলা যায় না।

রম্ভা গলা বাড়িয়ে দিল না বটে কিন্তু এক পা না নড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কাটারির কোপের প্রতীক্ষায়। বীরেশ্বর যেন থ' বনে গেল

কাছাকাছি গিয়ে মেয়েকে দেখে। মেয়ের দুঃসাহসে নয়, মেয়েকেই দেখে। মেয়ে বড় হয়েছে জেনেও বাপেরা সহজে জানতে পারে না ছেলেমেয়ে ঠিক কেমন আর কত বড় হয়েছে, বিশেষ করে মেয়ের বেলায়। আজ বিশেষভাবে নজর পড়ায় মেয়ের বদলে এক যুবতীকে দেখে সে যেন চমকে গেল।

এত বেড়ে গেছে রম্ভা!

কাটারি দিয়ে মেয়েকে অবশ্য বীরেশ্বর কাটত না। বদমেজাজী হলেই মানুষ তো আর পাগল হয় না। তবে কাটতে গিয়ে রম্ভাকে এভাবে না দেখলে সে হয়তো পিসী আর শশাঙ্কের মা সঙ্গে থাকবে এই ভরসায় মেয়েকে শশাঙ্কের হেফাজতেই কলকাতা বেড়িয়ে আসতে পাঠিয়ে দিত। এবার সে ভাবল, সর্ব্বনাশ! সে নিজে সঙ্গে না থাকলে এই মেয়ে কি কারো সঙ্গে কোথাও যেতে দেওয়া যায়! সেই সঙ্গে একথাও সে ভাবল যে কি সর্ব্বনাশ! এখনো মেয়ের সে বিয়ে দেয় নি!

রম্ভা আর তার পিসীকে নিয়ে বীরেশ্বরকে অগত্যা নিজেই শশাঙ্কের সঙ্গে কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হল। অল্প বয়সে রম্ভা একবার কলকাতা গিয়েছিল, আবছা আবছা মনে আছে দালান, রাজপথ, গাড়ী-ঘোড়া মানুষের দিশেহারা ভিড়ের সমারোহ। রওনা হওয়ার দিন সকালে রম্ভা যখন উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে আছে, সূর্য্য এল। ক্লিষ্ট মুখে ম্লান হেসে বলল, 'আমারও এমন যেতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায়!'

সূর্য্যকে দেখেই হঠাৎ উত্তেজনা কমবার প্রতিক্রিয়ায় রম্ভার বুকে তোলপাড় উঠেছিল। সে কথা কইতে পারল না।

'একটা কিন্তু সুখবর আছে। এখন থেকে হপ্তায় একবার পাঁচনিখে গেলেই চলবে।'

শুনে রম্ভা ভাবল যে বর্ষার আগে এটা হলে কত কষ্ট বাঁচত সূর্য্য-বাবুর! কালও রম্ভা সূর্য্যকে দেখেছে কিন্তু আজ গাঁ ছেড়ে দূরে যাবার

চেতনা নিয়ে সূর্য্যকে তার বড় বেশী জীর্ণ শীর্ণ ঠেকল, মনে হল তার যেন অসুখ হয়েছে, কঠিন অসুখ। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রম্ভার। কলকাতা সে যাচ্ছে বটে মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, কিন্তু শৈশবে একবার এবং এত বড় হয়ে আরেকবার যে কলকাতা যায়, যাওয়াতে কি তার দিনের হিসাব থাকে? ফিরে আসবার কথা কি সে ভাবতে পারে যাবার সময়? অনেক দূরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠা পর্য্যন্ত রম্ভা তাই কাতর হয়ে রইল। তারপর রেলগাড়ীতে চেপে চলার আনন্দ ও উদ্দীপনার মাদক রসে রম্ভার যখন নেশা ধরে গেল, গতিশীল জড় ও জীবন্ত সব কিছুকে তীব্রভাবে ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, তখন সূর্য্যর কথা তার মনেই রইল না।

কলকাতায় পৌঁছে তারাও শশাঙ্কের সঙ্গে লোকনাথের প্রকাণ্ড বাড়ীতে উঠল। তাদের মত অনাহুত ও তুচ্ছ আত্মীয়-পরের অস্থায়ী বসবাসের জন্য বাড়ীতে স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে।

এই বাড়ীতে রামপালের সঙ্গে দেখা হল রম্ভার।

লোকনাথের একটি কাঠের গোলা ও আসবাব তৈরীর মস্ত কারখানা আছে। বিস্তৃত অঙ্গনে করাতিরা চেরে নানা কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি, কারখানার মধ্যে তৈরী হয় নানা ধাঁচের ও নানা দামের চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক কৌচ আলমারি। রামপাল এখানে মিস্ত্রির কাজ করে।

প্রথমে সে কমদামী সাধারণ আসবাব তৈরীর কাজ আরম্ভ করেছিল, তারপর অল্পদিনে সে দামী সৌখীন জিনিষ তৈরীর কাজে লেগেছে। তার হাতের কাজ বড় সুন্দর হয়, তৈরী জিনিষের কারুকার্য্য একটা সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ পায়। কয়েক টুকরো দামী কাঠ নিয়ে সে খানিকটা ফাঁকি দিয়ে ও খানিকটা অবসর সময়ে ছোট একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স তৈরী করছিল, কারুকার্য্য যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কারখানার

ম্যানেজার স্বয়ং উমাপদর কাছে একদিন ধরা পড়ে। এসব বজ্জাতি উমাপদর সয় না। গালাগালি খেয়ে রামপাল সেদিন হয়তো বরখাস্ত হয়ে যেত, বাক্সটি দেখে হঠাৎ স্ত্রী লিলির কথা উমাপদর মনে পড়ে যাওয়ায় জিনিষটাই শুধু সে বাজেয়াপ্ত করে নিল।

গম্ভীর মুখে বলল, 'কাজে ফাঁকি দিও না।'

বাক্সটি নিয়ে উমাপদ চলে যায়, রামপাল বলল, 'একটু বাকী আছে বাবু।'

নেড়ে চেড়ে দেখে কোন ত্রুটি কিন্তু উমাপদর চোখে ধরা পড়ল না। '—কেন, এই তো বেশ হয়েছে।'

তারপর রামপালের তৈরী অনেকগুলি ছোট ছোট কাঠের জিনিষ লিলির ঘরের শোভাবর্দ্ধন করেছে। সময় লেগেছে অনেক। রামপাল বড় আস্তে ধীরে সুস্থে কাজ করে।

রামপাল মানুষটাও ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির, কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় একটু আলস্যপ্রিয়। কথা সে কম বলে, শোয়া বসা সব অবস্থাতেই নড়াচড়া কম করে, অনেক বিষয়েই আগ্রহ দেখায় কম। পাঁচজনের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা হাসি তামাসা সমস্তই সে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু তাকে মনে হয় আনমনা। উত্তেজিত আলোচনার মধ্যেও চোখ তার মাঝে মাঝে বুজে যায়, ভাবুক মনে হয় তাকে। তার এই খাপছাড়া প্রকৃতির জন্য অন্য করাতি আর মিস্ত্রী মজুরদের কাছে তার অস্তিত্ব একটু স্পষ্ট। অনেকে এজন্য তাকে পছন্দ করে না। তার নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাবের মধ্যে অনড় অচল হয়ে বসার ভঙ্গির মধ্যে, মুখ বুজে চিন্তা ভাবনা করার মধ্যে সাধু, পণ্ডিত, পূজারী আর বাবুদের সঙ্গে সাদৃশ্যের যেটুকু ইঙ্গিত আছে সেটা এদের সংস্কারকে পীড়ন করে। রামপাল রাগারাগি গালাগালি হানাহানি অশ্লীল আলাপ, হাসাহাসি আর বাহাদুরী সকলের সঙ্গে

সমান তালে করে না বলে তাকে কেমন বেজাত ভেবে এরা বিদ্বেষ অনুভব করে। তবে মাঝে মাঝে খেনো খেলে রামপাল বেশ ভালরকম মাতামাতি হৈহুল্লোড় করে, বিদ্বেষের ভাবটা সাময়িকভাবে একেবারে উপে যায় এবং পরে আবার ফিরে এলেও জোরালো হতে পায় না। নির্ব্বিরোধী স্বভাবের জন্য রামপালের প্রতি অনেকের একটু টানও আছে, যারা নিজেরাই নিরীহ গোবেচারী মানুষ এবং যারা শেষ পর্য্যন্ত মানুক না মানুক সব বিষয়ে বুড়োদের পরামর্শ নিতে ও হিতোপদেশ শুনতে চায়, বুড়োদের জ্ঞানী ও গুণী বলে জেনে শ্রদ্ধা করে। রামপালের মধ্যে এরা স্থবিরের গুণাবলীর প্রতিফলন অনুভব করে।

মাঝে মাঝে কিন্তু অকারণে তার মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা দেখা দেয়, দেশী মদ খেয়ে হৈ চৈ করার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। বড় সে ছটফট করে, কাজ কামাই করে সহরময় ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো সামান্য কারণে মাবামারি পর্য্যন্ত করে বসে। তবে দু'চার দিনেই এভাবটা তার কেটে যায়।

উমাপদ কারখানার মালিক লোকনাথের ভাগ্নে। বড়লোক মামাটামার চেয়ে তাদের ভাগ্নেটাগ্নেরা চিরকালই বেশী দড় হয়। উমাপদর কর্ত্তালিতে সমস্ত কারখানা জুড়ে জোরালো অসন্তোষ গুমরে বাড়ছিল, একদিন সে নাথু করাতিকে মেরে বসায় হাঙ্গামা বেধে গেল। করাতিরা স্বভাবতই বদমেজাজী আর অপমান-কাতর হয়। বিশেষত দোষ না করে অন্যায় গালাগালি শুনতে তাদের বেশী লাগে। বেমাপে চিরে দামী কাঠ নষ্ট করেছে বলে উমাপদ তাকে গাল দিতে আরম্ভ করায় নাথুর সইল না।

'খবর্দ্দার বাবু, মুখ সামলে।'

পায়ের কাছে কাঠের একটা গোঁজ পড়ে ছিল। উমাপদ সেটা তুলে ছুঁড়ে মারল। লাগল নাথুর মাথার পাশে। রক্তারক্তি হয়ে গেল।

উমাপদ সেদিন হয়তো খুন হয়ে যেত, তাকে বাঁচালো রামপাল

নিজের দেহ দিয়ে তাকে আড়াল করে সে হাঁকতে লাগল: 'খুন হয়ে যাবে, সবাই মিলে মারলে খুন হয়ে যাবে···খুন! পুলিশ হাঙ্গামা! হুঁসিয়ার!'

উমাপদ ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে কোন রকমে আপিস ঘরে পালাল।

করাতি ও মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে আরম্ভ করল জটলা। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অবস্থায় রামপালের কাজে তারা বিরক্ত হয়েছে। নাথু তার চাটগাঁ'র ভাষায় অকথ্য গালাগালি দিতে লাগল রামপালকে।

রামপাল কৈফিয়ত দিয়ে বলল, 'একটা লোক মেরে দু'চার জন ফাঁসি গিয়ে, দশ বিশজন জেল খেটে লাভ কি হত শুনি!'

'খুন কিসের? খুন কিসের? দু'চার ঘা খেত শালা।'

এ অবস্থাতেও রামপালের মুখে হাসি দেখা দিল।

'ভদ্দরলোকের ব্যাটা—তোমরা দু'চার জন এক ঘা করে দিলেই রক্ত হেগে মরে যেত।'

কথাটা সকলের ভাল লাগল। উমাপদকে এ একটা গাল দেওয়ার সামিল। এ একটা ঘোষণা—উমাপদর জীবন ঠুনকো, তারা কিন্তু সহজে মরে না।

'নাথুকে যে মারল তার কি হবে?' শ্রীপতি মিস্ত্রী শুধোল।

'মাপ চাইবে।'

হ্যাঁ, মাপ চাইতে হবে উমাপদকে। হেড মিস্ত্রী গণি সাক্ষী, বেমাপে চিরে নাথু কাঠ নষ্ট করেনি, গণি যেমন বলেছিল সেই মাপে চিরেছে। নিজে ভুল করে উমাপদ গাল দিয়েছে নাথুকে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মাপ না চেয়ে সে আজ যাক দিকি কারখানার বাইরে! মাপ তাকে এখুনি চাইতে হবে। তাকে কারখানা থেকে না সরালে কেউ কাজ করবে না।

উমাপদকে সরাবার কথাটা শুধু ভাসা ভাসা ভাবে উঠে রইল, দু'চার—

জন বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। সকলের সায় পেয়ে সমবেত দাবীর স্পষ্ট রূপ নেওয়া স্থগিত রইল উমাপদর মাপ চাওয়া চুকে যাবার জন্য। ওটা আগে চাই, এখুনি চাই।

দায়িত্বটা আপনা থেকে পড়ল গিয়ে রামপালের ঘাড়ে। সে উমাপদকে বাঁচিয়েছে, মাপ চাওয়ার কথা পেড়েছে, ঘটনাস্রোতকে এ পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিনা নির্ব্বাচনেই সে তাই মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হয়ে গেল। শুধু মধ্যস্থ নয়, দায়ীও হল। মুখে কেউ কিছু না বললেও এটা স্পষ্ট হয়ে রইল যে তাকেই উমাপদকে দিয়ে মাপ চাওয়াতে হবে।

এটা নেতা হওয়ার সামিল। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে রামপাল করাতি ও মিস্ত্রিদের নেতা হয়ে গেল। উমাপদর কাছ থেকে মাপ চাওয়া আদায় করার ভারটা তার এবং এই কাজটা করাব জন্য সে কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিতে বললেও এখন সবাই তা পালন করবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাজটা সম্পন্ন করতে না পারলে অবশ্য তার মুস্কিল আছে।

ভেবে চিন্তে রামপাল উমাপদর কাছে গেল।

'ওরা কি বলছে, রামপাল ?'

'বড হাঙ্গামা হয়েছে, বাবু। নাথুকে না মারলেই পারতেন। ওর দোষ নেই। গণি মিস্ত্রী সোয়া ইঞ্চি বলেছিল, নাথু সেই মাপে চিরেছে। আপনার ভুল হয়েছিল।'

উমাপদ চটে বলল, 'তাই কি ? ভুল হয়েছিল বলে আমার মুখের ওপর হুমকি দেবে ?'

রামপাল তখন অবস্থাটা বুঝিয়ে দিল। মাপ না চাইলে উমাপদকে কারখানা থেকে বার হতে দেওয়া হবে না। রাগের মাথায় সবাই হয়তো অপিস ঘরে এসেই—

'অ্যাঁ!' উমাপদর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। 'নাথুকে মেরেছি তো ওদের সকলের কি ?'

'সবাই ক্ষেপে গেছে।'

টেবিলে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে দামী পেনের মসৃণ গোড়াটা ঠোঁটে বুলিয়ে বুলিয়ে উমাপদ ভাবে। আক্রোশ আর ভয়ের উত্তেজনায় মনে তার আলোড়ন চলতে থাকে অনিশ্চয়তার। কি করবে ? কি করা যায় ? লোকনাথ দত্তের বড় ভাগ্নে হয়ে, কারখানার বড় ম্যানেজার হয়ে মাপ চাইবে একটা করাতির কাছে ? সকলের সামনে মাপ চাইবে ! কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে এখনকার মত মাপ চেয়ে বাঁচা কি ভাল নয় ? পরে নয় দেখা যাবে কার ঘাড়ে কটা মাথা ! অথবা যদি—

'কি করি বলত রামপাল।'

'আজ্ঞে মাপ না চেয়ে রেহাই নেই।'

রেহাই নেই ! রেহাই নেই ! ছোটলোক কুলিমজুরের কি আস্পর্দ্ধা ! 'আচ্ছা, বলোগে আমি আসছি।'

রামপাল বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উমাপদ পুলিশে ফোন করে দিল।

পুলিশ আসতেও সময় লাগে। প্রতীক্ষা করতে করতে সকলের উত্তেজনা বাড়তে থাকে, তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। মিনিট কুড়ি পরে রামপাল তাগিদ দিতে এল।

'বলোগে আসছি। নাথুর খুব লেগেছে, না ? বলোগে নাথুকে আমি একশো টাকা দেব—ক্ষতিপূরণ দেব। এই হিসাবটা দেখেই আসছি।'

এখন এই অবস্থায় উমাপদ হিসাব দেখছে !

খানিক পরেই লরী বোঝাই পুলিশ এসে কারখানা দখল করে বসল। করাতি ও মিস্ত্রীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করত না, ক্ষমাপ্রার্থী

উমাপদর বদলে হঠাৎ পুলিশের আমদানী হওয়ায় সকলেই অল্প বিস্তর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সময় দিলে করাতি ও মিস্ত্রীরা আপনা থেকেই চলে যেত। তবে জনতা পালাতে আরম্ভ করলেও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কর্ত্তব্য রীতিমত পালন করার প্রথা পুলিশ মেনে চলে। গোটা কয়েক মাথা একটু ফাটল, কয়েকজন ঘা কতক মার ও গুঁতো খেল।

রামপাল মধ্যস্থ, তাই দলে ভেড়েনি। একটু তফাতে একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে বিড়ি টানতে টানতে আপিস ঘরের দিকে তাকিয়ে ছিল, কখন উমাপদ বেরিয়ে আসে। অঙ্গন সাফ হয়ে যাবার পর দেখা গেল সে একা তখনও কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে আছে।

উমাপদ বেরিয়ে এসেছিল। রামপালকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওই ব্যাটা পালের গোদা, ওই সকলকে ক্ষেপিয়ে আমায় ডাকতে গিয়েছিল। অ্যারেষ্ট করুন।'

অপরাহ্নে লোকনাথ নিজে গিয়ে রামপালকে ছাড়িয়ে আনলেন এবং পুলিশের হাঙ্গামা চাপা দেবার ব্যবস্থা করে এলেন। কারখানার হাঙ্গামা তিনিই মেটাবেন, সে পর্য্যন্ত কারখানায় পুলিশ পাহারা থাকলেই হবে, আর কিছু দরকার নেই।

উমাপদ মামার কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্পনায় গেঁথে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। কারখানার কর্ম্মচারীদের কাছে লোকনাথ আসল ব্যাপারের খুঁটিনাটি সব শুনেছিলেন। তাঁর কাছে মিথ্যা বলার জন্য উমাপদকে তিনি বকলেন এবং পুলিশে ফোন করার জন্য তার বুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁর আরও কারবার ও কারখানা আছে। এটা তাঁর জানাই ছিল কারখানা চালাতে গেলে মাঝে মাঝে লোকদের সঙ্গে গোলমাল হয়। অশিক্ষিত নেশাখোর ছোটলোক তো সব! বাড়ীতে

একটা চাকর থাকলে তার সঙ্গে পর্য্যন্ত খিটমিটি না বেধে যায় না, কারখানায় এমন কত লোক কাজ করে!

রামপালকে তিনি একেবারে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। উমাপদকে বাঁচাবার জন্য প্রশংসা করলেন এবং দশ টাকা পুরস্কার দিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন, 'কাল আমি সব মিটিয়ে দেব।'

লোকনাথ জানতেন শ্রীপতি মিস্ত্রী তাঁর কাঠের কারখানার লোকদের দলপতি, সকলের হয়ে সেই এতদিন অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছে, কথাবার্ত্তা চালিয়েছে। রামপালকে হঠাৎ ওদের নেতা হতে দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন।

রামপালকে জলখাবার দেবার হুকুম হয়েছিল। প্রজা জমিদার-বাড়ী এলে তাকে খেতে দেবার সেকেলে প্রথাটা লোকনাথের বাপ মেনে চলতেন, ব্যবসায়ী হলেও লোকনাথের আমলে সেটা টিকে আছে। খিদেও রামপালের পেয়েছিল প্রচণ্ড। চাকরের সঙ্গে সে বাড়ীর আনাচে খেতে গেল। রামপালের শ্রেণীর লোকদের খাওয়াবার জন্য মুড়ি, চিড়ে, ছাতু আর আটার রুটির স্থায়ী বরাদ্দ আছে। গুড় দিয়ে যা খুসী খেতে পারে। সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা আছে। অবশ্য সে পরিমাণে সকলে পায় না, খায়ও না।

'কি নেবে?'

'দাও যা খুসী।'

হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে রামপালের, বিতৃষ্ণা জেগেছে। গারদে বসে উমাপদর চালাকি আর প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদানে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে তার বিস্ময় আর ক্রোধের সীমা থাকে নি। হঠাৎ লোকনাথ স্বয়ং গিয়ে তাকে মুক্ত করে নিজের গাড়ীতে চাপিয়ে আদর করে বাড়ী আনায় রাগ দুঃখ তার চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা ভুল হয়েছিল, সেটা সংশোধন হল ভেবে সে পরম স্বস্তিও বোধ করেছিল। পুরস্কারের দশটা টাকা সে নিয়েছিল,

গারদে গিয়ে কষ্ট পাওয়ার মজুরি হিসাবে। এখন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছে যে এ তো শুধু তার প্রতি ভুল করার প্রতিকার হল, এতে তার তো খুসী হওয়া উচিত হয় নি! নাথু মার খেয়েছে, উমাপদ [illegible] নি, ফাঁকি দিয়ে পুলিশ ডেকেছে, কয়েকজন আহত হয়েছে—এসবের কোন প্রতিকার হয় নি।

লোকনাথ বলছে, কাল সব মিটিয়ে দেবে।

কিন্তু তাকে তো দেখতে হবে ঠিকমত মিটমাট যাতে হয়? ঠিকমত মিটমাট কি হওয়া উচিত তাকে তো স্থির করতে হবে ভেবেচিন্তে আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে? এমন একটা মীমাংসা চাই তো লোকনাথ যা মেনে নেবে এবং ওরাও যাতে খুসী হবে?

হঠাৎ নেতা হয়েই রামপাল ঠিক নেতার মতই ভাবতে শিখেছে। মুড়ির সঙ্গে বাতাসা পেয়েও খেয়ে সে স্বাদ পেল না। কেবল খিদের তাগিদে মুড়ি চিবিয়ে গেল।

এমন সময় বাপের সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে রম্ভা ফিরে এল। অন্য অনেকের মতই রামপাল তাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু রম্ভার মনে হল এ যেন সেভাবে দেখা নয়।

আনাচের অন্দর থেকে খানিক পরে রম্ভা একবার বেরিয়ে এল রামপালকে আরেকবার দেখবে বলে। বাড়ীর কত পুরুষের চোখে সে দেখেছে তার পরিহিত শাড়ী সেমিজ ভেদ করা চাউনি। তার মধ্যে উমাপদর চাউনিটাই সবচেয়ে তেজী, চোখ দিয়ে সে যেন তার সর্ব্বাঙ্গ আঁচড়ায়। রামপালের মত মানানসই একটি পুরুষের মিষ্টি দৃষ্টি দেখে তাই রম্ভার চেতনায় ঘা লেগেছিল। অন্দরে গিয়ে তার কেবলি মনে হচ্ছিল লোকটাকে আরেকবার না দেখলে তার চলবে না, ভুল দেখেছে কি না এ সংশয়টা মেটাতেই হবে।

খাওয়া শেষ করে রামপাল তখন চলে গেছে।

লোকনাথের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীতে লোক অনেক, আত্মীয় কুটুম্ব আশ্রিত আশ্রিতা চাকর ঠাকুর দাই দাসী মালী ঝাড়ুদার দারোয়ান ইত্যাদি নানা জাতের হরেকরকম মানুষ। মানুষ পুষে লোকনাথ সুখ পায়, তার কাছে সংসারে যত পোষ্য যত সমারোহ কর্ত্তা হবার বাহাদুরিও ততখানি। বাজে লোকের ভিড়ে সংসারের আসল মানুষদের কোন অসুবিধা হয় না। এক বাড়ীতে বাস করলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক। আসলেরা ভিড়ের সান্নিধ্য শুধু ততটুকু মঞ্জুর করে, তাদের জীবনযাত্রার কলরব ঠিক ততটুকু কানে আসতে দেয়, যা বরদাস্ত করতে কষ্ট নেই, গর্ব্ব আছে। বাড়ীর যে পরিমাণ স্থান এরা পেয়েছে এদের দাবীর জোরে তা এদের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী। এত বড় বাড়ীতেও তাই অন্যদের স্থানের অকুলান হয়, বাস করতে হয় একটু ঘেঁষাঘেঁষি কোনঠাসা হয়ে। অবশ্য তাও কি কম ভাগ্য?

নানা গণ্ডীতে, নানা প্রক্রিয়ায় বিচিত্র শব্দ তুলে এ বাড়ীর জীবনধারা বয়ে যায়। ভোর চারটে থেকে মানুষের ঘুমই ভাঙ্গে বেলা দশটা, এগারটা পর্য্যন্ত। যাদের কাজ করতে হয তারা কাজ আরম্ভ করে। আর যাদের কোন কাজ নেই তারা আরম্ভ করে সময় কাটাবার চেষ্টা, শুয়ে বসে হাই তুলে আড্ডা দিয়ে গল্প করে তাস খেলে রেডিও শুনে। সাধারণ কথার একটানা গুঞ্জন ছাপিয়ে কাণে আসে ডাকাডাকি, ধমকানি, কলহ, ছোট ছেলের কান্না, ঠাকুর ঘরে আরতির শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি শব্দ। উপরের স্তরেব মেযেপুরুষদের জীবন সব সময়েই শ্লথ মন্থর, সকালের দিকে আরও ঝিমিয়ে থাকে। পুরুষেরা তবু লোকনাথের বিভিন্ন আপিসে মোটা বেতনে হাল্কা কাজের চাকরী করতে যায়, মেয়েদের কাজের অভাবটাই সাংঘাতিক। সকলের চেয়ে নিশ্চল জবুথবু ও শব্দহীন লোকনাথেব তিরানব্বই বছরের বুড়ী মা, এদের অলস জীবনের চরম প্রতীকের মত।

বাড়ীতে দু'বেলা সব চেয়ে সমারোহ হয় চারটি রান্নাঘরে। এক ঘরে লোকনাথ ও তার আপনজনের, এক ঘরে পরের পর্য্যায়ের সম্পর্কিতদের, এক ঘরে নিরামিষ এবং এক ঘরে বাকী সকলের। শেষের রান্নাঘরে অন্ন ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাকলেও পরিমাণটা হয় বিপুল। তবু সকলের শেষে যারা খায়, শেষে ছাড়া খাবার অধিকার যাদের নেই, তাদের প্রায়ই সব জিনিষ কম পড়ে। কোনদিন থাকে শুধু আধপেটা ভাত আর একটু ডাল, কোনদিন থাকে শুধু দুটি শুকনো নুন ভাত, কোনদিন কিছুই থাকে না। হিসেব করেই দেওয়া হয় সব জিনিষ, কিন্তু সেটা মাথা পিছু হিসেব, খিদের হিসেব নয়।

পোষ্য পোষা নিয়ে বড় ছেলে হীরেনের সঙ্গে লোকনাথের একটু মতানৈক্য আছে। তবে হীরেনের পক্ষে অনৈক্যটা সম্পূর্ণ নীতিগত ব্যাপার। এই আবেষ্টনীতে মানুষ হওয়ার ফলে বাড়ীব অবস্থাটা তার এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে পরিবর্ত্তন ঘটানোর বিশেষ জোরালো তাগিদ সে অনুভব করে না। কেবল এই এক বিষয়ে নয়, বেশ খানিকটা পিতৃভক্তি থাকলেও বাপের সঙ্গে তার তেমন বনে না। ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে একটা সমালোচনার ভাব থাকাটা তার কারণ। বাপকে সে পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারে না। প্রচুর বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও লোকনাথের মনেও ছেলের সম্বন্ধে পুরাপুরি সায় নেই। তবে মতানৈক্য থাকলেও বাপ ছেলের মধ্যে এপর্য্যন্ত তেমন মনোমালিন্য ঘটেনি। অমিলের মধ্যেও মিল থাকায় খানিকটা সামঞ্জস্য হয়েছে, মতামত ও পছন্দ অপছন্দের অতীত পিতৃভক্তি আর বাৎসল্য বাকীটা সামলে রেখেছে।

সম্প্রতি উমাপদকে উপলক্ষ করে দু'জনের মধ্যে খাঁটি একটা মনোমালিন্য ঘটবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। কাঠের কারখানায় গোলমাল হবার আগে থেকেই উমাপদর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা তার কানে

আসছিল; একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য চাপও পড়ছিল তার উপর। চাপ দিচ্ছিল কৃষ্ণেন্দু আর মমতা। দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের কথাটাই হীরেনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এদের দু'জনের চাপের সঙ্গে তার নিজের মনের সঙ্গতি ঘটায় ব্যাপারটা গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশী। উমাপদকে সে পছন্দ করে না। কেবল অপছন্দ নয়, এই পিসতুতো দাদাটির উপর তার মনে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবও বহুদিন থেকে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। বাড়ীর মানুষগুলির অমার্জ্জিত স্থূল মানসিকতা সে শুধু অবজ্ঞা আর উদাসীনতা দিয়ে বরদাস্ত করে যায়, তার আগেকার যুগের মানুষ বলে ক্ষমা করে কিন্তু প্রায় সমবয়সী ও সুশিক্ষিত উমাপদর রুচিহীন কৃষ্টিহীন ভোঁতা অনুদার জীবনযাপন তাকে পীড়ন করে।

কিন্তু মুখে উপদেশ বা ধমক দিতে লোকনাথের আপত্তি না থাকলেও উমাপদর স্বভাবের সংশোধন হওয়ার মত শাসন করতে লোকনাথ রাজী নন। উমাপদর ব্যবহারে তিনি দোষের বিশেষ কিছু দেখতে পান না বলে শুধু নয়, তাকে শাসন করার একটু মুস্কিলও আছে।

জীবন-বীমার কোম্পানী খুলে লোকনাথ প্রথম ব্যবসায় জীবন আরম্ভ করেন তাঁর ভগ্নীপতি রাখালের সঙ্গে, উমাপদ যার ছেলে। সে কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশীদার ছিল রাখাল। কোম্পানী যখন দাঁড়িয়ে গিয়ে দিন দিন বড় হচ্ছে এবং পরামর্শ চলছে অন্য কারবার পত্তন করবার তখন রাখাল মারা যায়। তারপর অন্য কারবার লোকনাথ একাই কয়েকটা গড়ে তুলেছেন, সেগুলিতে উমাপদর কোন অংশ না থাকলেও জীবন-বীমা কোম্পানীটির সে অর্দ্ধেকের মালিক। কোম্পানী আরও অনেক ফেঁপেছে, বহু টাকার কারবার দাঁড়িয়েছে।

রাখালের মৃত্যুর সময় উমাপদ ছোট ছিল। যতদিন পারা যায় লোকনাথ তাকে লেখাপড়া নিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তারপর তাকে ব্যাপৃত রেখেছেন অন্য কারবার চালাবার কাজ শিখিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে।

জীবন-বীমা কোম্পানীর ধারে কাছেও তাঁকে ভিড়তে দেন নি। সে ইচ্ছাও তাঁর নেই। ওই একটি কোম্পানীর ভিতরের ব্যাপার তিনি উমাপদকে জানতে দিতেও চান না, পরিচালনার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে দিতেও চান না।

উমাপদ মাঝে মাঝে আজকাল একটু গম্ভীর মুখে এই কোম্পানীটি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে সুরু করেছে, নানা প্রশ্ন করেছে। দু'একবার আপনা থেকে কোম্পানীর আপিসে ঘুরেও এসেছে ইতিমধ্যে। লোকনাথ জানেন, একদিন এই ব্যাপার নিয়েই ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধবে, উমাপদ পাওনা দাবী করবে। কিন্তু তার এখনো দেরী আছে। আরও কতগুলি বছর তিনি উমাপদকে সামলে চলতে পারবেন। এখন অকারণে ওর স্বাধীনতা খর্ব্ব করার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর স্বাধীন হবার প্রবৃত্তি উস্কে দিয়ে লাভ কি হবে? তাও কুলীমজুরদের সঙ্গে একটু কড়া ব্যবহার করার জন্যে!

হীরেন এটুকু বোঝে না। বুঝবার মত বুদ্ধিও তার নেই ভেবে লোকনাথের আপশোষ হয়—রাগও হয়। ভয় হয় এই ভেবে যে সঙ্গ দোষে ছেলেটার বুদ্ধি একেবারে বিগড়ে না যায়।

কৃষ্ণেন্দু আর মমতার সঙ্গে হীরেন পাটনায় এক কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিল। এসব কনফারেন্সে হীরেন কেন যায় লোকনাথের মাথায় ঢোকে না,—যারা জেল খেটেছে আর দরকার হলে আবার জেলে যাবে তাদের এই কনফারেন্সে? তবে হীরেন কলকাতায় না থাকায় এক বিষয়ে রক্ষা পাওয়া গেছে। কাঠের গোলার ঘটনাটা নিয়ে সে নিশ্চয় বাড়াবাড়ি করত।

ফিরে এসে গোলমাল করবে। কিন্তু তিনি নিজে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন আর উমাপদকে আচ্ছা করে শাসন করে দিয়েছেন বলে হয়তো অল্পেই তাকে ঠাণ্ডা করা যাবে। শ্রীপতি যে কৃষ্ণেন্দুকে টেলিগ্রাম করে

দেবে লোকনাথের জানা ছিল না। রামপাল কিছু করতে পারবে এ বিশ্বাস শ্রীপতির ছিল না। সেই সঙ্গে কারখানায় তার পদটিতে রামপাল উড়ে এসে জুড়ে বসবে এ ভয়ও ছিল।

শ্রীপতিকে মধ্যস্থ করেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা হল। বাকী রাতটা এক রকম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলাই রামপাল হাজির হল লোকনাথের বাড়ী। রাত্রির আলোচনায় কি হলে তারা খুসী হবে স্থির করে ফেলা হয়েছিল, লোকনাথকে সর্ত্তগুলি জানিয়ে দিতে তার তর সইছিল না। শ্রীপতি জানলে রামপালকে আটকে রাখার চেষ্টা করত, নতুবা তার সঙ্গে যেত। রামপাল একা লোকনাথের সঙ্গে কথা চালাবে পরামর্শ সভায় এমন কোন কথা হয় নি।

সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল। ন'টার আগে লোকনাথ কারো সঙ্গে দেখা করেন না,—নিজের দরকারে অথবা বিশেষ লোক ছাড়া।

অস্থিরতা চেপে বসে থাকতে থাকতে রামপালের আবার খিদে পায়। জলখাবার নিয়ে খেতে গিয়ে আবার সে স্বাদ পায় না। তার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে কৌতূহলী বীরেশ্বর। রম্ভা যোগ দেয় পরে।

'হাজত যাও নি তুমি?' বীরেশ্বর দরদের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'যাই বা না যাই।' উদাসভাবে রামপাল জবাব দেয়।

'তাই বলছিলাম। ওই এক কাজ জানে পুলিশ, ধরে ধরে হাজতে পোরা। আমি জানিনে? ঘুরে আসিনি কবার জেল থেকে?' বীরেশ্বর গরম হয়ে ওঠে। তার জেলে যাওয়ার কাহিনী শুনতে শুনতে রামপালের উদাসীন ভাব কেটে যায়।

'কর্ত্তা ভাল করেছেন তোমায় ছাড়িয়ে এনে। কর্ত্তা লোক ভাল।'

এ কথায় রামপাল সায় দিতে পারে না। কাল রাত্রে সকলের আলোচনা শুনে এই জ্ঞানটুকু তার জন্মেছে যে তার ওপর যে অন্যায় করা

হয়েছিল তার প্রতিকারের জন্য লোকনাথ 'তাকে ছাড়িয়ে আনেন নি, হাঙ্গামাটা চাপা দেওয়াই ছিল তার সকল উদ্দেশ্য।

'ভালো ? হা, ভালোই বটে ! কেউ বলে না ভাল।'

'সূর্য্যবাবুও তাই বলেন। বড়লোকরা লোক ভাল না।' রম্ভা তার উত্তেজিত জোরালো সমর্থন জানায়। তার চোখ দুটি বিস্ময়কর দীপ্তিতে চক চক করে। নিশ্বাস তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই একটু দ্রুত হয়ে উঠেছে। রামপালের চোখে মুখে আজ উদাসীন নির্ব্বিকার ভাব নেই, চাপা অস্থিরতা এক অদম্য রুদ্ধ শক্তির থমথমে অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে। কথা তার ঝাঁজালো কিন্তু মানে বোঝা সহজ। গরীব মিস্ত্রিমজুরদের হয়ে সে লড়াই করেছে বড়লোক বাবুদের সঙ্গে, হাজতে গিয়েছে, তারপর বাড়ী বয়ে লড়াই করতে এসেছে স্বয়ং বড় কর্ত্তার সঙ্গে ! রম্ভার কেবলি মনে হতে থাকে এ লোকটি যেন ঝুমুরিয়ার জীর্ণশীর্ণ অশক্ত শ্রীহীন সূর্য্যের সুস্থ সবল রূপবান প্রতিনিধি—শক্তিশালী, সক্ষম। সহরের আলো দেখে রম্ভার মনে হয় নি এ তার গাঁয়ের প্রদীপ আর ডিবরির আলোরই উজ্জ্বল চোখ ঝলসানো রূপ। ঝুমুরিয়ার কালো সূর্য্যের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তি দিয়ে জীইয়ে রাখা শিখাটিই আজ রামপালের প্রদীপ্ত অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে তাকে অভিভূত করে দিল।

লোকনাথ রামপালকে দর্শন দিলেন সাড়ে ন'টার সময়। বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল আবার ?'

রামপালের বক্তব্য শুনে বললেন, 'বটে ? আগে মিটমাট না করে দিলে কেউ কাজ করবে না ? ওদের বলগে বাপু, ওসব ওস্তাদি চলবে না আমার সঙ্গে। কাজ যদি বন্ধ করে তো কিছুই করব না আমি।'

রাগে লোকনাথ গরগর করতে থাকেন। তার কথা শুনতে শুনতে রামপালেরও মনে হয় কথাগুলি তিনি খাঁটিই বলছেন। খোঁজখবর না নিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ না করে, ব্যাপারটা ভালরকম বিবেচনা করে না

দেখে, হঠাৎ কি করে তিনি মিটমাট করে দেন! তিনি ব্যস্ত মানুষ, কিছুদিন সময়ও তো লাগবে তাঁর সব বুঝে শুনে নিতে। ততদিন কি কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে কারখানায়? তিনি কথা দিয়েছেন মিটিয়ে দেবেন, কারো নালিশ করার কিছু থাকবে না, তাই কি যথেষ্ট নয়?

'আজ্ঞে, তাই বলি গে' বুঝিয়ে।'

লোকনাথ শান্ত হয়ে নরম সুরে বললেন, 'কি বলে ওরা কাল জানিয়ে যেও।'

রামপালের কথা শুনে কেবল শ্রীপতি নয়, আরও অনেকেই হাসল। কারো কারো চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও দেখা গেল। এখানে এদের কথা শুনতে শুনতে রামপালের মনে হল, এরাও তো ঠিক কথাই বলছে। বোকার মত সে-ই লোকনাথের সহজ চালটি ধরতে পারে নি! তাই বটে, কারখানায় কাজ বন্ধ করা এখন খুব কঠিন নয়, কিন্তু কয়েকদিন কাজ করার পর আস্তে আস্তে সকলের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এলে সেটা তো সহজ হবে না! তখন দুটো মিষ্টি কথা বলেই হয় তো লোকনাথ ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারবেন। মীমাংসাব সর্ত্ত সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে প্রতিশ্রুতি না পেয়ে কাজ আরম্ভ করা তো উচিত হবে না!

ন'টার আগে লোকনাথের সঙ্গে দেখা হবে না জেনেও রামপাল পরদিন সাতটার খানিক পরেই আবার তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। টের পেয়ে খুসী হল যে রম্ভাও তাব অপেক্ষা করছিল।

বীরেশ্বরের এখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। ইতিমধ্যেই বাড়ীর একজন ড্রাইভারের সঙ্গে তার একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভারটিকে সে হয়তো মেরেই বসত কিন্তু তার আগেই উমাপদ নিজে এসে ড্রাইভারটিকে ধমকে দেওয়ায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে পারে নি।

অতিথির মান আরও বাড়াবার জন্য উমাপদ বলেছিল, 'তুমি বললে ওকে ডিসমিস করে দিই বীরেশ্বর।'

বীরেশ্বর তাতে একটু অপমান বোধ করেছিল। এরকম পিঠ-চাপড়ানো খাতির তার সহ্য হয় না। সে যেন অসহায়, অরক্ষিত মানুষ, উমাপদর অধীন। ড্রাইভারকে ধমকে বড়ই সে অনুগ্রহ করল তাকে। এরকম অনুগ্রহ উমাপদ তাকে আরও করবার চেষ্টা করেছে, তাতেও অপমান বোধ করেছে বীরেশ্বর। তাছাড়া, এখানে বড় বেশী পরাধীন শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে হয়। লোকনাথের কাছে যে ব্যবহার আশা করেছিল তাও সে পায় নি। কোন ব্যবহারই পায় নি।

মেয়ে সায় দিতেই সে ঝুমুরিয়া ফিরে যাবার আয়োজন করল। রম্ভারও এখানে বড় খারাপ লাগছিল। বড়লোকের বাড়ী বলেই প্রথম থেকে তার বিতৃষ্ণা জাগে নি, এখানে বাস করতে করতে তার অস্বস্তি বাড়ছিল। রামপালের সঙ্গে জানাশোনা হবার পর থেকেই তার কেবলি মনে হয়েছে যে সে শত্রুপুরীতে বাস করছে, অস্বস্তি যেন পরিণত হয়েছে বিদ্বেষে।

খবর শুনে উমাপদ বিষণ্ণ হয়ে শশাঙ্ককে বলল, 'ওরা আর কিছুদিন থেকে যাক না শশাঙ্ক?'

শশাঙ্ক বয়সে বড়। কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে উমাপদর সম্পর্ক বেশী ঘনিষ্ঠ কিনা, তাই সে তাকে তুমি বলে।

শশাঙ্ক চিন্তিত হয়ে বলল, 'থাকবে কি?'

'বীরেশ্বরকে একটা কাজে লাগাব ভাবছি। ভাল মাইনে।'

'কাজ করবে কি?'

'বলেই দেখ না?'

'বলে লাভ হবে কি কিছু?'

রক্ত মাংসের দেবতাদের প্রশ্ন ও প্রস্তাবকে নাকচ করা জবাব দ্বিধাসন্দেহ ভরা প্রশ্নের দ্বারা দেওয়াই শশাঙ্কের স্বভাব।

তার ধারণা, এতে উভয় পক্ষেরই সম্মান বজায় থাকে।

'বললে দোষ কি?'

'কি দোষ?'

শশাঙ্কের রকম দেখে উমাপদ দমে যায়। অতি উদাসীন ভাব অবলম্বন ক'রে বলে, 'থাকগে তবে, বলে কাজ নেই। একটা লোক দরকার ছিল তাই, নইলে বীরেশ্বর থাকলো বা গেল, আমার কি?'

উমাপদ নিজেই বীরেশ্বরকে বলতে পারে। কিন্তু সে যদি অনুরোধ না রাখে? তাতে বড়ই অপমান হবে।

শশাঙ্ক চলে গিয়েছিল, খানিক পরেই জুতো জামা পরে সে ফিরে এল। সলজ্জ একটু হেসে বলল, 'পাঁচটা টাকা হবে ভাই?'

'টাকা নেই।'

মুখখানা ম্লান করে শশাঙ্ক ফিরে যাচ্ছে, উমাপদ হঠাৎ তাকে ডেকে বলল, 'শশাঙ্ক, দাঁড়াও টাকা দিচ্ছি।'

দাঁড়াতে বললেও উমাপদ তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে না। শোবার ঘরের পাশে তার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। পাঁচ টাকার একখানি নোটের বদলে দশ টাকার কয়েকখানা নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'তোমার স্ত্রী তোমার কথা শোনে শশাঙ্ক?'

শশাঙ্ক গাল উথলানো হাসি হাসে।—'শোনে না? চোখ কান বুজে শোনে। সহুরে মেয়ে নাকি যে কথা শুনবে না?'

বলি বলি করেও বলতে উমাপদর বাধে। মনটা বড় তিতো হয়ে যায়। ভয় ও ভদ্রতার বাধায় বলতে না পারার তিক্ততা। দু' একদিনের মধ্যে রম্ভা নাগালের বাইরে চলে যাবে,—হয়তো চিরদিনের জন্য! রম্ভা হয়তো ভাববে, কি কাপুরুষ বাবুটা, কি ভীরু!

কথাটা বলতে শেষের চিন্তাটাই তাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শশাঙ্ক রম্ভাকে বলে গেল সে যেন আজ দিগম্বরীর ঘরে শোয়। রাত্রে সে বাড়ী ফিরবে না।

উমাপদর বৌ লিলি বড় ঘুমকাতুরে। মাস আষ্টেকের একটি তার ছেলে আছে, অন্ধ ছেলে। দশটার আগেই ঘরে এসে ছেলেকে মাই দিতে দিতে দশ মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে। উমাপদ ঘুম ভাঙ্গালে কান্নার একেবারে বন্যা বইয়ে দেয়। ছেলেটা নির্জীব, বেশী জ্বালাতন করে না। চিঁ চিঁ করে একটু সে কাঁদলেই ঘুমের মধ্যেই লিলি আবার তার মুখে মাই গুঁজে দেয়। একটা দাই আছে ছেলে রাখার, কিন্তু লিলি তাকে ছেলে দিতে চায় না। ছেলে ছাড়া তার ঘুমোতে কষ্ট হয়। নেহাৎ যেদিন বেশীরকম জ্বালাতন করে, অসুখের জন্য মাই না টেনে কাঁদে, শুধু সেদিন দাইকে ডেকে এনে তার জিম্মা করে দেওয়া হয়। দাইয়ের কাছে ছেলে কাঁদে কি না কাঁদে লিলি বা উমাপদ কেউ টেরও পায় না, দাইয়ের ঘর অনেক তফাতে। ঘুমের ঘোরে লিলি শুধু মাঝে মাঝে বিছানাটা হাতড়ায়।

আজ লিলি ঘরে এল প্রায় সাড়ে দশটায়। নিজের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে উমাপদ তখন বই পড়ছে, বিলাতের নতুন যুগের এক আদর্শ বীরের কাহিনী—কপর্দ্দকশূন্য বেকার এক তরুণ বুদ্ধি খাটিয়ে বাছা বাছা ধনী ঠকিয়ে কি করে নিজে বড়লোক হয়ে প্রতারণার চালবাজিতে হার-মানা ওই একজন ধনীর মেয়েকেই ভালবেসে বিয়ে করে সুখী হল। বইখানার একুশটি এডিসন হয়েছে—চার বছরের মধ্যে।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে লিলি বলল, 'শুনছ ? ডাক্তার দেখাবে বলেছিলে যে আজ ?'

'মনে ছিল না।'

'তা কেন মনে থাকবে ? কেমন ঘায়ের মত হয়ে গেছে প্যাচড়াগুলো, নিজের হলে বুঝতে। খোকারও হচ্ছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কাল ডাক্তার ডাকব।'

'বড় ডাক্তার ডেকো।'

'ডাকব।'

ঘুম-কাতুরে লিলির মান অভিমান কলহ বিলাপের জের টানার ক্ষমতা নেই, শুতে পারলেই সে বাঁচে।

সে শুয়ে পড়তেই বই রেখে উমাপদ বেরিয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানে। একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে শশাঙ্কের ঘরে যেতে হলে এই বারান্দা পার হতে হয়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রম্ভা এল।

সমস্ত বাড়ী তখনো সজাগ। এ বারান্দা দিয়ে লোক যাওয়া আসা করছে। কোন ঘরের আলোই প্রায় নেভেনি।

'আমার স্ত্রী তোমায় একবার ডাকছিলেন রম্ভা।'

'এত রাতে ? শুনে আসি যাই তবে।'

উমাপদ তাকে শয়নঘরের বদলে বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

বলল, 'বোসো, একটু আলাপ করি তোমার সঙ্গে। তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ আজকালের মধ্যে ?'

রম্ভা বলল, 'উনি কই ?'

উমাপদ সংক্ষেপে বলল, 'বোসো। ভয় কি ?'

ভয় ? কথাটা রম্ভার ভাল লাগল না। এ বাড়ীর এরকম অনেক ঘরেই ঢুকে সে একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই বলে পালিশ করা মেঝে রঙীন দেয়াল ঝালরপর্দ্দার আর চকচকে ঝকঝকে আসবাব আলোয় ঝলমল করছে দেখে সে ভয় পেয়েছে ভাবল লোকটা !

ভয় পাওয়ার অন্য মানেটা রম্ভা তখনো আন্দাজ করতে পারেনি।

তারপর উমাপদ এসে তার বাঁ হাতটি ধরে অতি মৃদু ও মিহি এবং একটু ধরা গলায় কথা বলতে সুরু করায় চকিতে রম্ভা সব আন্দাজ করে নিল। একটু তার ভয় হল এবার। গোলমাল হয়ে একটা কেলেঙ্কারি না হয়! হাত নিয়ে হঠাৎ টানাটানি করতে তার সাহস হল না। উমাপদর মুখ দেখে আরো বেশী ভয়ে ও বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। প্রথম এসে উমাপদর যে মুখখানা তার এত সুন্দর আর কোমল মনে হয়েছিল সে মুখে যেন ঝুমুরিয়ার নিতাই পাগলার মুখের ছাপ পড়েছে, চোখ দুটি অবিকল এক রকম! বিনানুমতিতে পুরুষ হঠাৎ হাত ধরেছে এ অভিজ্ঞতা রম্ভার ছিল। ঝুমুরিয়ার কালীবর্দ্ধনও পুকুরঘাটের নির্জ্জন গাছতলায় এর চেয়েও জোরে তার হাত চেপে ধরেছিল, তার মুখ তো এমন দেখায় নি, বরং সে মুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে কয়েক মূহুর্ত্ত তাকে প্রায় অবশ করে রেখেছিল। কালাবর্দ্ধনের বেলা রাগ হয়েছিল, ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ গা জ্বালা করেছিল রাগে। এখন রম্ভার কেমন ঘেন্না করতে লাগল, মনে হল উমাপদর স্পর্শ যেন অশুচি।

উমাপদর মুখের দিকে রম্ভা আর তাকাতে পারল না। মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিগম্বরী বারান্দার এদিকের কোণের ছোট ঘরখানিতে দরজার সামনে যেন রম্ভার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে ঢুকেই সে জিজ্ঞেস করল, 'উমা ঠাকুরপো কি বলছিল রে তোকে?'

'কিছু না।'

'কিছু না কিলো ছুঁড়ি? তোকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল দেখলাম না নিজের চোখে?'

'শুধোচ্ছিলেন আমরা কবে যাব।'

দিগম্বরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রম্ভার মুখের দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল,

'একথা শুধোবার জন্য একটা সোমথ মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবার দরকার! উমা ঠাকুরপোর কাণ্ডজ্ঞান নেই সত্যি।'

দিগম্বরীকে সব খুলে বলার জন্য রম্ভার মনটা আকুলি বিকুলি করছিল। কিন্তু একথা বলা যায় না। উমাপদকে খাতির করে নয়, মমতা করেও নয়। জানাজানি হয়ে বীরেশ্বরের কানে উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। ভাগ্নেবাবুকে কীচক বধ করে হয়তো সে ফাঁসি যাবে। একজন তার হাত ধরেছে বলে বাপ তার ফাঁসি যাবে, এটা রম্ভার মোটেই সঙ্গত মনে হল না।

'এত রাতে তুই যে ওপরে এলি?'

'তোমার কর্ত্তাই তো আসতে বলল দিগুদিদি?'

দিগম্বরী আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'উনি আসতে বললেন?'

আজ রাত্রে ফিরবে না বলে শশাঙ্ক রম্ভাকে তার কাছে শুতে বলে গেছে শুনেও দিগম্বরীর বিস্ময় কমে না। কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় না।

'রাত্রে ফিরবেন না? আমায় তো বলেন নি কিছু।'

'বলেন নি?'

'না। তুই ভুল শুনেছিস রম্ভা। রাতে উনি বাড়ী ফিরবেন না, সেকথা আমায় না বলে তোকে বলে যাবেন? তোর মাথা খারাপ হয়েছে। কি শুনতে কি শুনেছিস তুই!'

রম্ভার কথা সে কানেই তুলতে চায় না। বলে, 'আমি বলে ভাত এনে ঢেকে রাখলাম ওঁর জন্যে, উনি ফিরবেন না!'

রম্ভা মুচকি হেসে বলে, 'বলে যেতে সাহস হয় নি হয় তো।'

দিগম্বরী চটে বলে, 'চোপাস্ নি রম্ভা। সাহস আবার কি? স্ত্রীকে বলে যেতে সোয়ামীর সাহস! এমনি বাইরে গিয়ে কোথাও আটকে

গেলেন, সে হল ভিন্ন কথা। রাতে ফিরবেন না ঠিক করে গেলেন, তোকে বললেন আর আমায় বললেন না, এ কথনো হয় ?'

দিগম্বরীর দিশেহারা ভাব দেখে রম্ভা চুপ করে থাকে। একটা সহজ সাধারণ কথাকে দিগম্বরী কেন এত বাড়িয়ে তুলছে তাও সে ভেবে পায় না। সমস্ত দুপুরটা সহর দেখে বেড়িয়ে সে শ্রান্তি বোধ করছিল। হাই তুলে সে জিজ্ঞেস করে, 'খেয়ে এসেছো তো দিগুদিদি ?'

দিগম্বরী গালে হাত দিয়ে বলে, 'শোন মেয়ের কথা। ওনার আগে খাবো কি লো ?'

রম্ভা চেয়ে দেখে, একটি আসনের সামনে একটি মাত্র থালা এবং গেলাস। পাশে অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্রগুলি আছে, কিন্তু আর থালাও নেই, গেলাসও নেই। বুঝেও সে না বোঝার ভান করে।

'পাতে খাবে বুঝি কত্তার ?'

দিগম্বরী জবাব দেয় না।

'ভাতে যদি কম পড়ে দিগুদিদি ?'

দিগম্বরী চুপ করে থাকে।

স্বামীই হোক আর যেই হোক একজন আরেকজনের পাতে বসে খাবে এটা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার নয় রম্ভার কাছে, সে নিজেও কতবার কতজনের পাতে খেয়েছে। দিগম্বরীর নীরবতার মানে সে বুঝতে পারল না।

'সোয়ামীর পাতে না খেলে কি হয় দিগুদিদি ?'

'পাপ হয়।'

'কেন ? ভুক্ লাগলে মানুষ খাবে নি ?'

'সোয়ামীর আগে মেয়ে মানুষের ভুক লাগবে কেন লো ছুঁড়ি ? আগে সোয়ামী হোক, তখন বুঝবি।'

'চাইনি বাবা !' বলে এত দুঃখেও রম্ভা হেসে ফেলল। তখন

ফিরে এল শশাঙ্ক। তার অবস্থা একটু টলমল, যা দেখে জয়ের গর্ব্বে রম্ভার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাবার মুখটা দিগম্বরীর ফসকে গেল।

'আপনি বলে ফিরবেন না?'

'একটা কথা কইতে এয়েছি।'

বলে শশাঙ্ক ইসারা করে দিগম্বরীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। মিনিট দুই পরে উমাপদ ঘরে ঢোকামাত্র বাইরে থেকে কে যেন শিকল তুলে দিল দরজায়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম রম্ভা।'

রম্ভা অনড় অচল হয়ে বসে তাকিয়ে রইল।

'একটা উপহার এনেছি তোমার জন্য।'

উমাপদ একটি ঝলমলে সোনার নেকলেশ রম্ভার সামনে মেলে ধরল। বিদ্যুতেব আলোয় প্রতি মুহূর্ত্তে শত তীক্ষ্ণ চমক চমকাতে লাগল।

রম্ভার মনে হল, এ লোকটা চোখ আর গয়না দিয়ে খুঁচিয়ে আর আঁচড়িয়েই শুধু কেবল পিরীত করতে জানে আর কোন পথ জানে না।

'নাও? এটা তোমার। তোমায় দিলাম।'

রম্ভা নীরবে মাথা নাড়ল।

যতক্ষণ পারা যায় নিজেকে সে সংযত রেখে চলবে। লাথি যদি মারতে হয় মানুষটাকে মারবে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে। বিশ্রী একটা ফাঁদে যে সে পড়েছে রম্ভা সেটা ভাল ভাবেই টের পাচ্ছিল। গণ্ডগোল এড়িয়ে যাবার ভরসা তার বিশেষ ছিল না। এ লোকটার লজ্জাসরম নেই, কেলেঙ্কারির ভয়ও বোধ হয় বিশেষ করে না। শশাঙ্ক আর দিগম্বরী এর দলে জুটে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এ এখন ধীরে সুস্থে যা খুসী করে যাবে। সে অবশ্য সহ্য করে যাবে যতক্ষণ পারে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। বন্ধ ঘরে এ যখন তাকে একা

পেয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে সে অবস্থার সৃষ্টি হতে যখন গোলমালের ভয়ে চুপ করে থাকলে তার চলবে না! ভয় দেখাবে? উমাপদকে ভয় দেখিয়ে দেখবে কি হয়?

এইসব ভাবছে রম্ভা, শিকল খুলে দিগম্বরী ঘরে ঢুকল। সমস্ত ষড়যন্ত্র সমস্ত কদর্য্যতা হাল্কা হাসিতে শূন্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'চটলেন ঠাকুরপো, বৌদির তামাসায়?'

উমাপদ বলল, 'না।'

দরজার বাইরে থেকে শশাঙ্ক চাপা গর্জ্জন করে ডাকল, 'শুনছো? বাইরে শুনে যাও।'

দিগম্বরী বলল, 'ঠাকুরপো বসুন।'

শশাঙ্ক আবার ডাকল, 'এই! শুনে যাও বাইরে—শুনে যাও বলছি।'

দিগম্বরী প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কি হল ঠাকুরপো, বসুন না?'

তখন উমাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। শশাঙ্ক ঘরে ঢুকেই দিগম্বরীর গালে বসিয়ে দিল একটা চড়। রম্ভার দিকে তাকিয়ে দিগম্বরী ধমকে উঠল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? পালাতে পারিস নে বোকা হাবা ছুঁড়ি? বেরো—বেরো আমার ঘর থেকে।'

শশাঙ্ক আবার চড় মারে আর বলতে থাকে, 'তোর তাতে কি? তোর তাতে কি এলো গেলো হারামজাদি মাগি?'

দিগম্বরী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'তোমার অকল্যাণ হবে যে গো। এ পাপ তোমার সইবে না, অকল্যাণ হবে তোমার।' নত হয়ে শশাঙ্কের পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমায় মেরে ফ্যালো, আমি পারব না।'

শশাঙ্কের লাথি খেয়ে সে মেঝেতে একটা গড়ান দিয়ে ওঠে। গায়ে লেগে কাঁসার পিকদানিটা যায় উল্টে। সঞ্চিত পানের পিক মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হয় যেন রক্তারক্তি হয়ে গেল।

শশাঙ্কের চোখ পিট্ পিট্ করে। বিছানায় উঠে উল্টানো পিক-দানিটার দিকে চেয়ে সে গুম্ খেয়ে বসে থাকে। দিগম্বরী মেঝে সাফ করা সুরু করলে তাকে দেখতে দেখতে শশাঙ্কের মনে হয়, বৌটা তো তার মন্দ নয় দেখতে! খাসা গড়ন, কোমল রঙ, মোলায়েম মুখ। রূপসী তো এমন কিছু কম নয় দিগম্বরী! আর ভাল যে কত তার তুলনা হয় না। সাত বছর তাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে—দেবতার মত পূজা করে। তার অকল্যাণ হবে বলে তাকে অন্যায় পর্য্যন্ত করতে দেয় না। সাত বছর ধরে দিগম্বরী—এখন যাকে আশ্চর্য্যরকম সুন্দরী দেখাচ্ছে—দৈনন্দিন অসংখ্য পূজার কথা ভাবতে ভাবতে গর্ব্বে শশাঙ্কের বুক ফুলে ওঠে। কে বলে সে মানুষ নয় মানুষের মত, পুরুষ নয় পুরুষের মত?

কলসীর জলে মেঝে ধুয়ে ঘরের নালা দিয়ে দিগম্বরী জল বার করে দেয়, ন্যাতা দিযে মেঝে মুছে ফেলে, দরজা খোলে না। শশাঙ্ক তাকে দেখছে, শশাঙ্ক চিন্তামগ্ন হয়েছে, এ সব সে না তাকিয়েই টের পায়। সে শশাঙ্কের কথার প্রতীক্ষা করে থাকে। সে জানে শশাঙ্কই প্রথমে কথা বলবে।

'লেগেছে নাকি?'

সজল চোখে হাসি মুখে মৃদু উদাসীনতা অভিমান ও অভিযোগ মেশানো সুরে দিগম্বরী জবাব দেয়, 'না।'

'সহরে এসে বিলিতী খাবার সখ হল একটু।'

'দিশি বিলিতী কিছুই ওসব তোমার সয় না। যা খাও না, যা সয় না, কেন খেয়ে কষ্ট পাও?'

এই স্নেহের অনুযোগের জবাব শশাঙ্ক দিতে না পারায় দিগম্বরী সুর পালটে বললে, ভাত খাবে না এখন?'

শশাঙ্ক খায়। খেতে খেতেই বাঁ হাতে একবার দিগম্বরীর গাল টিপে দেয়। কৃতার্থ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে দিগম্বরী বলে, 'ধেৎ!'

খাওয়া দাওয়া চুকবার পর শোয়া। দিগম্বরীকে বুকে টেনে নিয়ে শশাঙ্ক বলে, 'তুমি বড় ভাল দিগু।'

রোমাঞ্চিত দিগম্বরী গদগদ ভাষায় বলে, 'কাল কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব তোমার জন্যে। তোমার সময়টা যাতে ভাল হয়।' বলতে বলতে অসহ্য আবেগে দিগম্বরী যেন ক্ষেপে যায়, হু হু করে কেঁদে বলে, 'তোমার জন্যে আমি মরতে পারি, জানো? জানো তোমার জন্যে আমি লাখোবার মরতে পারি?'

বাইরে পা দেওয়ামাত্র দিগম্বরীর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রম্ভা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। রাগে ক্ষোভে বুকটা তার জ্বলে যেতে থাকে। হাত পা থর থর করে কাঁপছে টের পেয়ে এগিয়ে গিয়ে রেলিংটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে। চুপচাপ সব সয়ে যাবার কষ্টটাই এখন তার অসহ্য মনে হয়। উমাপদর চেয়ে রাগটা তার বেশী হয়েছিল শশাঙ্কের উপর। উমাপদ কেঁচো শ্রেণীর অপদার্থ জীব, এখনো রম্ভার মনের গভীর অবজ্ঞা ঠেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মাথা তুলতে পারছিল না। একটা বঁটি এনে শশাঙ্ককে কেটে ফেলবার সাধটা তার প্রায় অদম্য হয়ে উঠেছে।

দিগম্বরী ধম্‌কে ঘর থেকে বার করে না দিলে সে হয়তো গেলাস বাটি ছুঁড়ে শশাঙ্ককে মেরে বসত।

শশাঙ্কের পায়ে ধরে দিগম্বরীর নাকি কান্নার কথা কানে আসতে রম্ভা সেখান থেকে সরে গেল। শশাঙ্ক যখন ফিরে এসেছে, নীচে গিয়ে নিজের যায়গায় শুয়ে পড়তে তার বাধা নেই। রম্ভা দেরী করছিল দম নেবার জন্য। একটু শান্ত হয়ে নীচে না গেলে বীরেশ্বর হয়তো তার মুখ দেখে আর কথা শুনে কিছু সন্দেহ করে বসবে। গায়ের জ্বালায় ঝোঁকের মাথায় নিজেই হয়তো বা সে বাপের কাছে সব বলে বসবে।

সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরকে সব জানিয়ে উমাপদকে যত না হোক, শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য রম্ভার ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছিল। বাপের বদমেজাজের জন্য বাপের কাছে কোন কোন কথা গোপন করার প্রয়োজনটাও রম্ভা অল্পকাল হল অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, গোপন করা এখনো অভ্যাস হয় নি।

বারান্দা প্যাসেজ আর সিঁড়িতে বাড়ীটা রম্ভার কাছে গোলকধাঁধার মত ঠেকে। তেতালায় অন্দরের পিছন দিকে পূর্ব্বোত্তর অংশটি নির্জ্জন। দুতিনটি পাক দিয়ে রম্ভা সেখানে পৌছল। চাঁদ ছিল বাড়ীর এই পিছন দিকে, সরু বারান্দাটি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একপ্রান্তে লোহার প্যাচানো সিঁড়ি, একেবারে নীচে থেকে উঠে এসে ছাদে চলে গেছে। বারান্দার অন্য প্রান্তটি শেষ হয়েছে এক তলা বন্ধ ঘরের দরজায়। নীচের ছোট উঠানটিতে পড়েছে সামনে গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী দু'টির ইঁট বার করা পিছনের দেওয়ালের ছায়া। ভেসে আসছে ঘর ধোয়া আর বাসন মাজার শব্দ। এত জোরে এরা ঝাঁটা চালায়! এত আওয়াজ তোলে বাসনপত্রের! লোকনাথের ছোট ছেলেটির বাঁশী এখনো বেজে চলেছে। উপরের খোলা ছাদ থেকে ভেসে আসছে লোকনাথের সন্ন্যাসী ভাই সোমনাথের গম্ভীর উঁচুগলার সাধন সঙ্গীত। ঝুমুরিয়ায় এখন গভীর রাত, ঘরে ঘরে সব ঘুমিয়ে আছে। এ বাড়ীতে অর্দ্ধেক মানুষ এখনো জেগে। ঘরে গিয়েছে, হয়তো শুয়েও পড়েছে, কিন্তু চোখে ঘুম নেই!

ঘুমের কথা ভাবতে গিয়ে রম্ভার ধীরে ধীরে ঘুম পায়। গায়ের জ্বালাও জুড়িয়ে আসে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাবে ভাবছে, কোণের অন্ধকার ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে লোকনাথের বিধবা বোন কালীতারা। সেখানে খানিকটা স্থানে জ্যোৎস্না পড়েনি। প্রতিফলিত স্তিমিত আলোয় একখানা সাদা ধবধবে থান কাপড় যেন ডাইনীর মায়ায়

আপনা থেকে ভাঁজ হয়ে মানুষের রূপ নিয়ে রম্ভাকে আঁতকে দিতে চেয়েছে।

'কে ওখানে?' কালীতারা কাছে এগিয়ে আসে।

'আমি রম্ভা।'

'রম্ভা কে? নতুন ঝি? এখানে কি করছিস?'

'ঝি নই। ঝুমুরিয়া থেকে এয়েছি শশাঙ্ক বাবুর সাথে।'

'তা বেশ করেছো। এখানে কি করছ শুনি এত রাতে?'

কি ঝাঁঝ কালীতারার কথার! যেন কামড়ে দিতে চায়।

'কি আর করব? দাঁড়িয়ে আছি।'

ঝাঁঝালো গলায় ফোঁস করা জবাব দিয়ে ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ রম্ভা গট গট করে লোহার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দু'দিন আগে এই কালীতারাই তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেছিল। কি মিষ্টিই লেগেছিল কথাগুলি রম্ভার কাছে! কি ভালোই লেগেছিল সেদিন মানুষটাকে!

সিঁড়ির শেষে শুধু একজনের সঙ্গে রম্ভার দেখা হল,—ঝাড়ুদার সুখলাল। সুখলাল মাত্র কয়েক ধাপ ওপর উঠেছিল, রম্ভাকে নামতে দেখে নেমে গিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ঝাড়ুদার সুখলাল আশ্চর্য্যরকম সুপুরুষ। কোন রাজা মহারাজা কিম্বা দেশী বা বিদেশী সম্ভ্রান্তঘরের রূপবান পুরুষের ঔরসে তার জন্ম হয়েছে সে জানে না। জানবার দরকারও নেই। কিছু এসে যায় না। সমাজ তাকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যে স্তরে তার স্থান তার চেয়ে নীচু স্তর তো আর নেই, কারো তাই ক্ষমতাও নেই তাকে নীচে নামায় বা বর্জ্জন করে। আস্তাকুঁড় থেকে আবর্জ্জনাকে বর্জ্জন করার ঠাঁই কই?

পিসী জেগে ছিল। রম্ভা ডাকতেই উঠে দরজা খুলে দিল। বীরেশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার ঘুম ভাঙ্গল না। শুয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রম্ভাও ঘুমিয়ে পড়ল।

কালীতারা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে। রন্তার বেয়াদবিতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। সামান্য একটু আঘাত পেলেই নিজের জন্য কালীতারার কান্না পায়। খানিকটা সীমাবদ্ধ আকাশে কিছু ছড়ান সাদা মেঘে জ্যোৎস্নার ছোঁয়াচ দেখতে দেখতে সে যেন হৃদয় জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা ব্যথার অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করে। চোখ দু'টি তার সজল হয়ে আসে।

ওপরে উঠে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সুখলাল সন্তর্পণে কালীতারার অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কালীতারাকে তন্ময় দেখে বেরিয়ে এসে তার বাহুমূলে আস্তে টোকা দিল।

'আজ যা। যা বলছি।

কালীতারার গলা আবেগের শ্লেষ্মায় ভেজা। চোখ তার চাঁদমাখা ওপরের চাঁদোয়ায়। মুখ তার ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, যেন ওপর হতে সুধার ধারা মুখে ঝরে পড়বে তারই তৃষ্ণার্ত্ত প্রতীক্ষায়—কাত করা শিশি থেকে রোগীর হাঁ করা মুখে ওষুধ ঝরে পড়ার সেই বিজ্ঞাপনের ছবির মত। সুখলালের দিকে সে চেয়েও দেখল না। সুখলাল চকিতে উধাও হয়ে গেল।

কালীতারা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে চলল তার ভাবাবেগ। সে মাঝবয়সী। তার দেহ মোটা। অন্তহীন অবসরের মৃদু সৌখীন একটানা ঘষায় মনের তার ছালচামড়া উঠে গেছে অনেককাল, তার আত্মদর্শনে কাঁচা মাংসের লালিমা। কোথায় গেলে কি করলে তাঁকে পাওয়া যায় যিনি জীবন-দেবতা—এ ব্যাকুলতা একবার জাগলে আর রক্ষা নেই, কালীতারার নেশা ধরে যায়। এবং নেশা একবার ধরলে চড়্ চড়্ করে নেশা চড়তেই থাকে।

প্রায় যখন আর সইছে না কালীতারার, তখন হঠাৎ সে নীরেনের বাঁশী আর সোমনাথের সাধন সঙ্গীত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। গটগট

করে নীরেনের ঘরে গিয়ে হাত থেকে বাঁশীটা ছিনিয়ে নিয়ে গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'গলায় রক্ত উঠে মরবি ?'

ভাইপোকে শাসন করে কালীতারা যায় ছাতে।

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু, হীরেন, মমতা ও আরিফ কলকাতা পৌঁছল। আরিফ মমতার বাবার অতিশয় প্রিয় ছিল। মমতার বাপ বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক, নাম আছে। একালের বৈজ্ঞানিকদেরও সেকেলে ঋষিদের মত সমসাময়িকদের সম্পর্কে দারুণ ঈর্ষা থাকলেও ছাত্রের মেধা থাকলে তাকে প্রায় ছেলের মতই ভালবাসতে পারেন। আরিফকে মমতার বাবা প্রায় ছেলের মতই ভাল বাসতেন। কিন্তু হঠাৎ ডক্টরেটের চেয়ে দেশের স্বাধীনতাকে বেশী মূল্যবান মনে করে রিসার্চ্চ বন্ধ করে স্বদেশীপনা আরম্ভ করার পর থেকে আরিফকে তিনি বড় অপছন্দ করছেন।

আরিফ বলেছিল, 'দেশে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন। নোবেল প্রাইজ পর্য্যন্ত পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু আমার দেশের কি লাভ হয়েছে ?' মমতার বাবা বলেছিলেন, 'দেশের মর্য্যাদা বেড়েছে —পৃথিবীর লোক জেনেছে আমরা তুচ্ছ নই। আমাদের মাথা আছে।'

আরিফ বলেছিল, 'তার তো কোন প্রমাণ পাই না। পৃথিবীর লোক জানে আমরা অসভ্য—জংলী। ইংরেজ আমাদের সভ্য করেছে। আমরা এমন অসভ্য যে ধর্ম্ম নিয়ে হানাহানি করি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সামলে চলেছে। আমার কি মনে হয় জানেন ? আমরা যখন আমাদের দু'চারজন বড় বড় লোককে নিয়ে গৌরব করি— সমস্ত জগৎ হাসে! আমাদের গৌরব করার যদি কিছু সাজে সেটা শুধু

গান্ধী, জিন্না, জহরলাল, [illegible]লতে—অবিশ্যি আরও নাম করা যায়। ওঁরা কেউ [illegible]

[illegible] বাবা বলেছিলেন, 'আরিফ, তুমি ভুল করছ! দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব সকলের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সবাই কি পলিটিক্‌স নিয়ে মেতে থাকবে? দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য চুলোয় যাবে? স্কুল কলেজ উঠে যাবে?'

মমতা মাঝখান থেকে মন্তব্য করেছিল, 'আপনি সত্যি ভুল করেছেন। আপনার ব্রিলিয়াণ্ট ফিউচার—'

আরিফ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'ব্রিলিয়াণ্ট? ডক্টরেক্ট ডিগ্রি পাব, একটা প্রফেসারি পাব, ছেলে খেলার একটা ল্যবরেটারীতে কাজ পাব। হয়তো ভিটামিন সম্পর্কে মস্ত একটা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব। আমার দেশের কোটি কোটি কঙ্কালের গায়ে এক আউন্স মাংস বাড়বে?'

মমতার প্রতিরোধ শুনেও তার বাবা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি মমতার মত তর্ক করতে শিখেছ আরিফ।' আরিফ মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় নি। তার দৃষ্টি দেখে মমতার মনে হয়েছিল তার অজান্তে সে ফকির হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় আগামী দিনের এক জ্ঞানের রাজ্য—সম্রাটের চেয়ে বড় জ্ঞানীর গৌরব—ত্যাগ করার ফকিরী নিয়েছে আরিফ।

পরে আরিফ তাকে বলেছিল, 'উনি ভেবেছেন তুমি আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছ মমতা।'

মমতা গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'তাকি সত্যি নয়?'

আরিফ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল।—'বোধ হয় সত্যি, বোধ হয় সত্যি। হাঁ, সত্যি বৈকি, নিশ্চয় সত্যি।' তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলেছিল, 'সায়ান্টিষ্ট হয়ে তাই বা বলি কি করে! আমার কোন দোষ

নেই—আমার বেলা তুমি শুধু ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করেছো। মাথা তুমি বিগড়ে দিচ্ছ হীরেন বাবুর।'

মমতা তখন আরিফের দু'কাঁধে দু'হাত রেখে বলেছিল, 'আরিফ!'

'বেগম সাহেব?'

'তোমার একটা বিশ্রী বদ্‌খত ধারণা আছে। আমি জানি আছে।'

'কি ধারণা?'

'আমি তোমায় ভালবাসি কিন্তু তুমি মুসলিম বলে—'

'ভালবাসো না?'

'তা নয়। তোমার ধারণার কথা বলছি। তুমি ভাবছ, তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু তুমি মুসলিম বলে তোমায় বিয়ে করতে রাজী নই।'

'বিয়ে? বিয়ের কথা কোনদিন বলি নি।'

'তাইতো বলছি।'

মেধাবী উচ্চাভিলাষী আরিফের যে কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটেছে মমতা সেটা টের পেয়েছে পাটনা কনফারেন্সে তার বক্তৃতা শুনে। হীরেন বক্তৃতা দিয়ে বেশ হাততালি পেয়েছিল। মমতা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে হীরেন এমন ঘষামাজা যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারে। গর্ব্বের তার সীমা থাকে নি। সমসাময়িক মানব সভ্যতার পটভূমিকায় ভারতের সমস্যাগুলির এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ সে খুব কম শুনেছে। আরিফের বক্তৃতা হাততালির তারিফ পেল না। সভা যেন চাবুক খেয়ে সম্বিত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবরাজ্য থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এল। পুলিশ রিপোর্টাররা এতক্ষণ অনেকটা গা-ছাড়া ভাবে টুকছিল, তারাও চমকে উঠে জোরে পেন্সিল চেপে ধরল। প্রথমে মমতার মনে হয়েছিল আরিফ বড় তীব্র বড় ঝাঁঝালো কথা বলছে। মাথা গরম হয়ে উঠছে আরিফের। তারপর সে বুঝতে পারল, আরিফ উত্তেজিত হয়নি, মার্জ্জিত সুশ্রাব্য

সাজানো গোছানো ভাষার বদলে সোজা স্পষ্ট কাটা কাটা কথা বলছে বলেই এত রূঢ় আর তীব্র শোনাচ্ছে তার কথা।

সেই থেকে সভার সুর যেন বদলে গেল। পরে যাঁরা বললেন তাঁদের বক্তৃতা অনেকটা মাটির পৃথিবী ঘেঁষে ঘেঁষেই চলতে লাগল। সভার শেষে মমতা দু'হাতে আরিফের হাত চেপে ধরল।

'আরিফ, আর দু'একবার এ রকম বক্তৃতা শোনালে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলব।'

বলতে বলতে সে তাকিয়ে দেখল, হীরেনের মুখখানা ঈর্ষায় একটু লম্বা হয়ে গেল।

কাজেই খানিক পরে মমতা তাকে বলল, 'তুমিও সুন্দর বলেছ।'

কৃষ্ণেন্দু কাছে ছিল। সে একটু হাসল।

মমতা তাকে বলল, 'তুমি কিছুই বলতে পার না কেষ্টদা। ঠিক যেন অফিসিয়াল রিপোর্ট পড়ছ মনে হয়, একটানা একঘেয়ে। এরা সব নতুন, তুমি পাকা লোক হয়েও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পার না। লোকে তোমার কথা শোনে কেন তাই ভাবি।'

'লোকের কথা বাদ দাও। তুমি শোন কেন?'

'তোমার মনে ব্যথা লাগবে বলে।'

কথা বলতে বলতে দুজনে কয়েক হাত তফাতে সরে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু মমতার বাহুতে আঙুল দিয়ে আঘাত করে বলল, 'মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড় কষ্ট হয়, না? হীরেন দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? না, ও মানুষ নয়?'

'তাই ভাবছি।'

'কতকাল ভাববে? ভাবতে ভাবতে তো বছর কেটে গেল।'

'তুমি কি ওর হয়ে ঘটকালি করছ কেষ্টদা?'

'তোমার কাছে ঘটকালি? তোমায় চিনিনে আমি? বেচারার যদি

যা কোন চান্স থেকে থাকে, কেউ বলতে এলে তুমি বেঁকে বসবে না? বন্ধুর হয়ে একটু ওকালতি করছি বলতে পা... একটু অন্যায় হচ্ছে মমতা। এবার ওকে তোমার রেহাই দেওয়া উচিত।'

'তোমার হুকুমে?'

রাগ হলে মমতা মুখ উঁচু করে একটু সামনে হেলে দাঁড়ায়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে গাল দিয়ে কলহ করতে দাঁড়াবার মেয়েলী ভঙ্গিতে।

কৃষ্ণেন্দুব মুখে জয়ের ছাপ দেখে ঠোঁট কামড়ে মমতা শরীর আলগা করে দিল। বলল, 'সম্পত্তি জ্ঞানটি বেশ টনটনে ভাবছ তো?'

কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে বলল, 'তা তোমার একটু অহঙ্কার আছে বৈকি!'

'সম্পত্তিজ্ঞান আর অহঙ্কার বুঝি এক?'

'কিছু না থাকলে কি নিয়ে অহঙ্কার হবে? হীরেন ফসকে যেতে পারে জানলে কবে তুমি মন স্থির করে ফেলতে।'

'তা ঠিক। বলতাম ফসকে যাও।'

'কিন্তু ওদিকে তুমি নিশ্চিন্ত, তাই ওর কথা না ভেবে কেবল নিজের হিসেব করছ। ছেড়ে দিতে সাধ নেই, ধরা দিতেও ভরসা পাচ্ছ না। হীরেনকে জানতে বুঝতে তোমার বাকী নেই—থাকা উচিত নয়। এতকাল মেলামেশা করেও ওকে যদি না বুঝে থাকো, কোনদিন বুঝতে পারবে না। আসল কথা তা নয় মমতা। তোমার সমস্যা ভিন্ন। তুমি বেশ ভাল করেই জানো তোমার এখানকার জীবনকে কতটুকু কাটছাঁট করতে হবে, কতটুকু কম্প্রোমাইজ, কতটুকু ত্যাগ দরকার হবে। এ দাম দেবে কিনা, যা পাবে এ দাম দিয়ে তা কেনা উচিত কিনা সেটাই তুমি ঠিক করতে পারছ না। ভেবে পাচ্ছ না ঠকবে না জিতবে।'

কথা কইতে কইতে তারা প্ল্যাটফর্ম্মের একপ্রান্তে এসে পড়েছিল। মমতা জোরে নিশ্বাস টেনে মুখোমুখি হয়ে বলল, 'তুমি যে আমায়

সোসাইটি বাজারের মেয়ে বানিয়ে দিলে কেষ্টদা! মস্ত বড় লোকের ছেলে বলে ওকে খেলি..! তুলছি এটুকু বলতে ছাড়লে কেন?'

কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেলল, 'খেলাবার দরকার ফুরিয়ে যাবার পরেও ওকে খেলাচ্ছ বলে।'

মমতা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার হৃদয়টা তো উড়িয়ে দিলে। আমি শুধু হিসেব করি!'

কৃষ্ণেন্দু হাসি মুখেই বলল, 'তোমায় গাল দিই নি ভাই। হৃদয় উড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক বরং বলেছি তোমার জোরালো একটা হৃদয় আছে। কোন জমিতে বন্যা আসে জানো তো? নীচু সেঁতসেঁতে জমিতে। প্রেমের বন্যা আসাটা হৃদয়ের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। সে বন্যায় ভেসে যাওয়া তো রীতিমত ছ্যাবলামি করা। হিসেব করবে না? এত বড় একটা ব্যাপারে? একেবারে খাতাপত্র নিয়ে বসে হিসেব করবে। তাছাড়া এতো ফ্রি লভের কথা নয়, বিয়ের ব্যাপার। তাও আবার হিন্দুমতে। আমি বলতে চাই, হিসেব হয়ে গেছে, এবার ইতস্ততঃ না করে মন স্থির করে ফেল।'

কৃষ্ণেন্দু ফিরবার জন্য পা বাড়াতে মমতা তার জামা ধরে আটকে রাখল। বলল, 'তুমি কিছুই বোঝ নি কেষ্টদা। ওসব হিসেব বহুদিন চুকে গেছে। আমার আসল সমস্যা ছিল ভিন্ন। আমার ভাবনা হল, ওকে আমার সঙ্গে কাজে নামাতে পারব কি না। আমার সঙ্গে মানে, আমাদের কাজে। আমি চাষী মজুরদের জন্য খাটব আর আমার স্বামী মিলের মালিক হয়ে তাদের রক্ত শুষবেন, তাতো হয় না।'

'তুমি কি চাও বাপের সম্পত্তি ত্যাগ করে এসে হীরেন আমাদের সঙ্গে কাজ করবে?'

'তা কেন? আমরা কি মিল তুলে দিতে চাইছি? ও আদর্শ কারখানা করবে, মজুরদের অধিকার স্বীকার করে নেবে, সংগঠন

গড়ে তুলতে কাজ করবে, আন্দোলন চালাবে—হাসছো নাকি কেষ্টদা ?'

'না ভাই, হাসি নি।'

কৃষ্ণেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। মমতা তার মন্তব্য শুনবার প্রত্যাশা করছে টের পেয়েও চুপ করে রইল।

খানিক অপেক্ষা করে মমতা বলল, 'শুনবে তবে ? আমি মন এক রকম ঠিক করে ফেলেছি। ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে কেষ্টদা, একটা বিদ্রোহের ভাব আছে, তুমিও বোধ হয় যার পরিচয় পাও নি। দেশের জন্য সত্যিকার দরদ আছে, আমাদের কাজে সহানুভূতি আছে। আমি জানি, ওকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারব।'

কৃষ্ণেন্দু তর্ক না করে সংক্ষেপে বলল, 'পারবে না।'

মমতা মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'ও আমার জন্য সব করবে।'

আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিতে মমতার টানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে থাকে। তার মুখ উজ্জ্বল দেখায়। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, মমতাকে এত সুন্দর সে কখনো দেখেনি। বেতনাদিতে তার বাপের মাসিক আয় হাজার দেড়েক টাকা কিন্তু মমতা কখনো সাধারণ মিলের শাড়ী ছাড়া দামী কাপড় পরে না। সুন্দরী মেয়েকেও যে সাজসজ্জা রূপ-প্রসাধনের অভাবে দর্শকের অনভ্যস্ত চোখে তেমন সুন্দরী দেখায় না, মমতা যেন তার প্রমাণের মত। একটু দ্বিধা করে কৃষ্ণেন্দু অন্তরের প্রতিবাদ জোর করে অবহেলা করে বলে, 'মমতা, জগতে এমন পুরুষ নেই যে প্রেমের জন্য নিজেকে বদলাতে পারে। একটি মেয়েকে ভালবেসে তার জন্য মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু নতুন মানুষ, ভিন্ন মানুষ হতে পারে না। পুরুষটির মধ্যে যা আছে তাকেই মেয়েটি বিকাশ করতে পারে, পরিণত করতে পারে, নতুন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ থাকলে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু

স্ফুলিঙ্গটি থাকা চাই। এইখানে প্রেমের শক্তির সীমা। হীরেন তোমায় ভালবাসে, তুমি মজুরদের ভালবাসো। শুধু এইজন্য মজুরদের ভালবাসার ক্ষমতা হীরেনের কোনদিন হবে না। হীরেনের মধ্যে অনেক কিছু আছে, ওকে দিয়ে তুমি অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারবে সত্যি, কিন্তু তুমি যে সব অনেক কিছুর কল্পনা করছ তা কল্পনাই থেকে যাবে।'

মমতা চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে? প্রমাণ চাও? কাঠের কারখানার হাঙ্গামার ব্যাপারটাতেই প্রমাণ দেব চল।'

'কি প্রমাণ দেবে?'

'তুমি কিছু কোরো না। আমি হীরেনকে দিয়ে মিস্ত্রীরা যা চায় তার চেয়ে বেশী পাইয়ে দেব।'

'তাতে কি প্রমাণ হবে?'

'দেখো। দেখে নিও।'

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে গেল। মমতা এখন বুঝেও বুঝবে না। সে বুঝতে চায় না। আত্মবিরোধের আপোষ মীমাংসার শর্ত নিজে স্থির করে নিজেই সে গ্রহণ করেছে। এতদিনের সঞ্চিত চাপা আবেগ মুক্তির পথ পাবে। উৎসাহে উত্তেজনায় মমতা হঠাৎ টগবগিয়ে উঠেছে।

এদিকে রামপালের অস্থায়ী নেতৃত্ব ও দায়িত্বের অবসান ঘটে গেল। শ্রীপতির ঈর্ষা ও আশঙ্কার ফলে নয়, লোকনাথের সঙ্গে রামপালের আলোচনার ব্যর্থতায়। এসব ব্যাপারে রামপাল যে নেহাৎ কাঁচা, নেহাৎ ছেলেমানুষ এটা টের পেয়ে সকলে আস্থা হারিয়েছে। রাগ কেউ করেনি অনেকে বরং তার সরলতা বনাম বোকামিতে বেশ খানিকটা কৌতুক বোধ করেছে।

রামপালকে সকলে বারণ করে দিয়েছে সে যেন আর লোকনাথের

কাছে দরবার করতে না যায়। অপমানে অভিমানে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছে রামপালের। এ নিষ্ঠুর অবিচারের মানে সে বুঝতে পারে নি। একেবারে সুরু করা থেকে, সকলের হাতে উমাপদর খুন হয়ে যাওয়া নিবারণ করা থেকে, এ ব্যাপারটা সে নিয়ন্ত্রণ করে আসেনি এ পর্য্যন্ত? একমাত্র সেই কি হাজতে যায় নি এ ব্যাপারে? কেন তবে তাকে বাদ দেওয়া হবে? যে কাজ সে আরম্ভ করেছে কেন তা শেষ করতে দেওয়া হবে না? রামপাল অনুরোধ জানিয়েছে, আরেকবার তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। কেউ কানে তোলে নি। রামপাল উত্তেজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে লোকনাথকে পটাতে না পারলে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে উমাপদকে মেরে আধমরা করে দশ বছর জেল খাটবে। তার আস্ফালনে কেউ বিশ্বাস করে নি, অনেকে টিটকারি দিয়েছে। শ্রীপতি তাকে জানিয়ে দিয়েছে, পরদিন কৃষ্ণেন্দু আসছে, যা করবার সেই করবে, রামপালের আর বাহাদুরী করবার দরকার নেই। সে কেরামতি দেখিয়েছে অনেক, আর না দেখালেও চলবে। তখন রামপাল ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হয়ে চুপ করে গেছে। খানিক পরে নীরবে উঠে চলে গেছে আসর ছেড়ে।

শ্রীপতি ও গণি কৃষ্ণেন্দুদের আনতে ষ্টেশনে এসেছিল। দিনটা সুরু হয়েছে বাদলায়। কাঠগোলার কাছে মিস্ত্রী ও করাতিরা অপেক্ষা করছিল। ষ্টেশন থেকে সেখানে যাবার পথে ট্যাক্সিতে শ্রীপতি সব জানাল। তাকে প্রশ্ন করল মমতা। কৃষ্ণেন্দু প্রায় আগাগোড়াই নির্বিকার ভাবে শুনে গেল। মমতা আগেই তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে দিয়েছিল। রামপালের সম্বন্ধে সে কেবল কয়েকটি প্রশ্ন করল। উমাপদকে রামপাল সকলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল শুনে সে যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছে মনে হল শ্রীপতি এই তুচ্ছ ঘটনাটি উল্লেখ করাও দরকার মনে করে নি, কিন্তু

-কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল: 'নাথুকে মারবার পর সকলে কি করল? চুপ করে রইল?'

'সবাই ক্ষেপে গিয়েছিল। তাইতো বলছি কেষ্টবাবু, নাথুর অপমান সবাই গা পেতে নিয়েছে।'

'তখন কেউ কিছু করে নি? নাথুকে মারবার সময়?'

গণি উৎসাহিত হয়ে বলল, 'করেনি? সবাই তেড়ে গিয়েছিল মারতে। উমাবাবু খুন হয়ে যেতেন।'

শ্রীপতি অনুযোগের সুরে বলল, 'রামপাল কিছু করতে দিলে না কেষ্টবাবু। সবাইকে ঠেকিয়ে রাখল। ওর জন্যে নইলে কি পুলিশ আনতে পারে? উমাবাবু উদিকে পুলিশকে ফোন করেছেন, ও এসে আমাদের ভাঁওতা দিয়ে বসিয়ে রাখলো চুপচাপ—উমাবাবু আসছেন, উমাবাবু মাপ চাইবেন, উমাবাবু নাথুকে একশো টাকা দেবেন, আরও কত কি!'

কৃষ্ণেন্দুর ভ্রুকুটি দেখে গণি আরেকটু ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলল, 'রামপাল নিজে ভাঁওতা দেয় নি। ও লোক ভাল, বুদ্ধি একটু কম। উমাবাবু যা বলে দিয়েছেন, ও এসে আমাদের তাই বলেছে। ওর দোষ নেই।'

শ্রীপতি খোঁচা দিয়ে বলল, 'দোষ নেই কিসের? ফফরদালালি করতে আসে কেন যেচে?'

কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করল, 'রামপাল সবাইকে ঠেকাল কেন গণি? উমাবাবুকে খাতির করে?'

গণি জবাব দিল, 'না, খুন হয়ে যাবেন বলে। খুন হলে পুলিশ আসবে, দু'চারজন ফাঁসিতে লটকাবে—কাজটা ঠিক করেছিল।'

'ওর বুদ্ধি কম বলছ কেন তবে?' মন্তব্য করে কৃষ্ণেন্দু তখনকার মত চুপ করে গেল। কিন্তু পরে আবার প্রশ্ন করল, 'পুলিশ শুধু রামপালকে অ্যারেষ্ট করল কেন?'

গণি বলল, 'বোকা তো, সবাই মার খেয়ে পালাল, ও ঠায় বসে রইল। উমাবাবু ওকে ধরিয়ে দিলেন।'

মমতা হীরেনের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'শুনছ? রামপাল ওর প্রাণ বাঁচাল, রামপালকে ভুলিয়ে উনি পুলিশ ডাকলেন, শেষে রামপালকেই ধরিয়ে দিলেন। এর একটা বিহিত করা চাই। তুমি যদি কিছু না কর—'

একবার তার চোখে চোখ মিলিয়ে বাইরে তাকিয়ে হীরেন কাঠ হয়ে বসে রইল। আরিফ ষ্টেশন থেকেই বাড়ী চলে গেছে। একটা ট্যাক্সিতে তারা গাদা হয়ে বসেছে—শ্রীপতি ও গণির সঙ্গে। গণি বসেছে মমতার পাশে, গা-ঘেঁষে, চেপে। তার দোষ নেই। সে নিরুপায়। মমতা ঠেলে সরে এসে শেষ প্রান্তে একটু স্থান করে গণিকে ডেকে সেখানে নিজের পাশে বসিয়েছে। মমতার কোমল দেহের কতখানি অংশের কত নিবিড় স্পর্শ গণি পাচ্ছে এ পাশে বসে নিজের একটানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকেই হীরেন তা অনুমান করতে পারছিল। জেদি একগুঁয়ে শক্ত মমতার শরীরটা যে এত নরম এতদিন হীরেন ভাবতেও পারে নি, এতদিন সে ছিল প্রাণের প্রাচুর্য্যে স্বতোৎসারিত সদা উৎফুল্ল সুন্দর একটি অনিবার্য্য তীব্র আকর্ষণ, মর্ম্মান্তিক রূপে কাম্য।

ফাঁদে যেন আটকা পড়েছে মনে হয় হীরেনের। প্যাঁক বেঁধে কয়েকটা বিপরীত শক্তি একসঙ্গে বিভিন্ন দিকে টানছে। শ্রীপতি ও গণি এমন ভাবে কথা বলছে, সে যেন উপস্থিত নেই। মমতা ও কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে যাচ্ছে। কাঠের কারখানা যেন তার বাপের নয়, উমাপদ যেন তার ভাই নয়, তার সামনে তার বাপ ভায়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি ও গণির যা খুসী বলে যাওয়া যেন মোটেই অসঙ্গত নয়! প্রথমে একান্তে ওদের কাছে সব শুনে নিয়ে মমতা তাকে বলতে পারত, কৃষ্ণেন্দু

বলতে পারত। তার সামনে ওরা কি বলে এ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে?

কৃষ্ণেন্দুকে সিগারেট ধরাতে দেশলাই দিতে গিয়ে গণি কি মমতার বুকে কনুই ঠেকাবে?

'এই রোখকে।'

ফুটপাথ ঘেঁসে ট্যাক্সি দাঁড়াল, আইন বাঁচানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা অকথ্য যৌবনে ফোলা একটি ন্যাংটো স্ত্রীলোকের বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো পুরুষত্বহানির অব্যর্থ ওষুধ বিক্রী এক দোকানের সামনে! হীরেন লক্ষ্য করল, কুঁজো হয়ে বসে টাকওলা চোখা নাক ঘুমন্ত শকুনির মত দোকানদারটি মোটর থামার শব্দে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আশার ঔৎসুক্যে সিধা হয়ে বসেছে। হীরেনের ইচ্ছা হল, হাসে। এগার বছর আগে কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় একদিন এমনি ভাবে, হয়ত প্রায় এমনি সময়ে, কলেজ যাবার পথে এই খানে গাড়ী থামিয়ে এই লোকটির কাছ থেকে বশীকরণ কবচ কিনেছিল। ক্লাশের একটি মেয়েকে বশ করতে চেয়ে। মেয়েটির নাম আজ মনে নেই। চেহারাও কল্পনা হয়ে গেছে। শুধু মনে আছে তার সর্ব্বাঙ্গের স্পষ্ট উদ্ধত আহ্বান, হাসি কথা বিতরণের প্রাণঘাতী কার্পণ্য আর অন্তহীন অবহেলা। কবচ ধারণ করে আলাপ জমাতে গিয়ে সে পাত্তা পায় নি। তারপর একদিন, অত্যন্ত হঠাৎ একদিন তাকে গাড়ীতে উঠতে দেখে মেয়েটি এসে বলেছিল, আপনার নিজের গাড়ী? বাড়ী পৌছে দেবেন আমায়? 'তৃতীয় দিন বাড়ী পৌছে দেবার পথে সে হঠাৎ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাঁধে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিয়েছিল। বশীকরণ কবচের এই অব্যর্থ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে সে সেইদিন সন্ধ্যায় দশটাকার নোট ভরা খাম এই মহাপুরুষ দোকানীর হাতে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে আর

কোন দিন গাড়ীতে তোলে নি। তিন দিন তার কাছে অর্থহীন বাজে কৈফিয়ৎ শোনার পর মেয়েটি মুখ গম্ভীর করে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু সে ঘটনা জানে।

'মনে আছে কেষ্ট? সেই বশীকরণ কবচ?

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল যে শ্রীপতি আর গণি নেমে গিয়ে কাঠের কারখানায় চলে যাক, সকলকে কাজে লাগতে বলুক। আজকেই মীমাংসা হয়ে যাবে—। 'তুমি বলেছিলে না বিহিত করতে হবে? বাড়ী গিয়ে এখুনি বিহিত করছি।'

মমতা খুসী হয়ে বলল, 'সব কথা শোনা হল না কিন্তু।'

হীরেন প্রায় ধমক দিয়ে বলল, আর শুনতে হবে না।'

কিছু দূরে খালের ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল। ওখানে মোড় ঘুরে খাল পাড়ের রাস্তা ধরে খানিক এগোলেই লোকনাথের কাঠের কারখানা।

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'একেবার ঘুরে গেলে হত না পাঁচ মিনিটের জন্যে, সবাই অপেক্ষা করছে।'

হীরেন সংক্ষেপে বলল, দরকার নেই।'

লোকনাথ তার সদর বৈঠকখানায় তিনজনকে অভ্যর্থনা করলেন। মমতাকে বললেন, 'এসো মা বোসো।' কৃষ্ণেন্দুকে বললেন, 'কেষ্ট বাবু যে!' দমক মারা ভঙ্গিতে মুখ তুলে ছেলের দিকে একনজর তাকিয়ে সামনের দেয়ালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া অথবা তার পাশে সম্রাট এডওয়ার্ডকে সম্বোধন করে বললেন, হঠাৎ কোথায় চলে যাও, বলেও যাও না একবার যাবার আগে।'

'বাড়ীতে সবাই জানে। আপনাকে বলেনি?'

'অাঁ?' লোকনাথ গড়গড়ার নলে একটি মাত্র টান দিলেন, হ্যাঁ, বলেছে বৈকি। চলে যাবার পরে শুনলাম। আমায় জানিয়ে যাবার

কথা বলছিলাম। দরকারী কথা থাকে, পরামর্শ থাকে। বড় হয়েছ, দায়িত্ব গ্রহণ করছ, সব তো বুঝে শুনে নিতে হবে তোমাকেই। আমি আর কদিন ?' আরেকবার নলে টান দিলেন, 'যাক গে।'

ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, উদার, মহৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ, কুটিল, সাবধানী ও হিংস্র। এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির সমবেত ওজন একা আয়ত্ত করে যেন লোকনাথ ভারিক্কি হয়েছেন। আধহাত উঁচু চৌকীতে বিছানো ফরাসের এককোণে হীরেনকে মাথা নীচু করে সন্তর্পণে বসতে দেখে মমতার বুকটা একবার ধড়াস্ করে ওঠে, মনে হয় কোন আশা নেই, সব ভুল। ঘরের সাজসজ্জা ও আসবাব পত্র সমস্তই যেন লোকনাথের পক্ষ নিয়ে নিঃশব্দ মাহাত্ম্যে তাদের দমন করতে চায়। প্রকাণ্ড ঘরে বসবার ব্যবস্থা দু'রকম। ভিতরের দিকের দেওয়াল ছুঁয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক-প্রান্ত পর্য্যন্ত মস্ত ফরাস। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট এক টেবিল, তার চওড়া প্রান্তের একদিকে লোকনাথের নিজস্ব গদি আঁটা একটি এবং বাকী তিনদিকে গদিহীন গোটা দশেক চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে তিনটি সোফা। আসবাবগুলি সব লোকনাথের কারখানায় তৈরী কিন্তু আশ্চর্য্য রকম সাদাসিধে, মোটা এবং ভারী।

মমতার আশঙ্কা বাতিল হয়ে যেতে কিন্তু বেশী দেরী হল না। সে যে প্রমাণ দেখাবে বলেছিল। আসল কথা আরম্ভ হবার দশ মিনিটের মধ্যে সে প্রমাণ সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে বসল। হীরেন ও লোক-নাথের মধ্যে এমন সংঘর্ষ বাধল যে মনে হল বাপ ব্যাটায় বুঝি চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার সার্সিতে আওয়াজ হচ্ছে চিড়ে ভাজার। লোকনাথ ফরাসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল টানছিলেন, গরম হতে হতে নিজের অজান্তেই সরতে সরতে কখন ফরাসের প্রান্তে এসে পা নামিয়ে বসেছেন। হাতের সঙ্গে গড়গড়ার নলটা কাঁপছিল, হঠাৎ সেটা তিনি

ছুড়ে দিলেন। দু'হাতে ফরাসের প্রান্ত চেপে ধরে মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। মেঝে মাত্র আধহাত নীচে। হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে রইল। হাতে ভর দিয়ে তিনি যেন দোল খাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, দোল খেতে খেতে ডিগবাজী খাবার কসরৎ দেখাবেন, কুর্তা গায়ে সরুপাড় কোঁচানো ধুতি পরা অভিনব এক অভিজাত অ্যামেচার ম্যাজিকওয়ালার মত হঠাৎ-জাগা খেয়াল-খুসীতে একটু তামাসা করবেন। শুধু বসবার ভঙ্গিতেই হঠাৎ তিনি যেন ওজন হারিয়ে হালকা হয়ে গেলেন! এটা দেখবার চোখ অবশ্য ছিল শুধু কৃষ্ণেন্দুর। সে একটু নিশ্চিন্ত হল।

লোকনাথ কথাও বললেন ভিন্ন সুরে। অত্যন্ত গম্ভীর ও মর্ম্মাহত ভঙ্গিতে। 'তুমি ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে আমায় কাবু করতে চাও?'

'না—ভয় দেখানো হুমকি দেবার কোন কথা নেই। একটা বিশ্রী অন্যায় হয়েছে, আমি তার প্রতিকার করতে চাই। আমি আপনার বড় ছেলে আমার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আমার নিশ্চয় এটুকু অধিকার আছে। আপনি যদি তা স্বীকার না করেন, বিদায় হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় কি আছে বলুন?'

লোকনাথ হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ায় হীরেনও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। একটু থেমে সে বুদ্ধিমানের মত যোগ দিল, 'উমাপদ সোজাসুজি কাউকে মেরেছে শুনলে আমার এত রাগ হত না বাবা। একজনকে মেরে সবাইকে ধাপ্পা দিয়ে ফের আবার পুলিশ আনিয়ে সবাইকে সে মার খাইয়েছে। কি বীভৎস নোংরা কাণ্ড!'

'নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওরকম অবস্থায় পড়লে তুমিও পুলিশ ডাকতে।'

'না। পুলিশ না ডেকে গলায় দড়ি দিতাম। কিন্তু এও জানবেন,

ওরকম অবস্থাতে উমাপদরাই পড়ে, আমি কখনও পড়তাম না। একজনকে কেন, আমি আপনার যে কোন কারখানায় গিয়ে অন্যায় করে যদি দশজনকেও জখম করি, অপমান করি, তারা আমার কাছেই নালিশ করবে, আমাকে মারতে আসবে না।'

মমতা সগর্ব্বে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ চাঁচছিল, মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে মাথাটা বার কয়েক অর্থহীন অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতে নেড়ে দিল।

লোকনাথ বললেন, 'যাই হোক, অন্যায় করে থাকলেও উমাকে তো আর চাবুক মেরে শাসন করা যাবে না। তুমি কি নিয়ে তর্কাতর্কি রাগারাগি করছ বুঝতে পারছি না হীরেন। আমি তো অনেক আগেই ঠিক করেছি উমা আর ওখানে যাবে না।'

তিনজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। এতক্ষণ লড়ায়ের পর লোকনাথ এত সহজে লড়ায়ের আসল কারণটাই এমন আচমকা উড়িয়ে দিতে পারেন, এ যেন তাদের বিশ্বাস হতে চাইল না।

লোকনাথ নির্ব্বিকার। বলে চললেন, 'আমি তো পাগল নই। সব ব্যাটা ওখানে এমন ধারা ক্ষেপে রয়েছে, উমাকে আমি যেতে দেব কোন ভরসায়? মাথায় যদি একজন লাঠিই মেরে বসে হঠাৎ?' পিছু হটে গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল তুলে নিয়ে লোকনাথ প্রায় চোখ বুজে ফেললেন।

হীরেন বলল, 'আরও দুটো দাবী আছে। যাদের চোট লেগেছে তারা একমাসের মাইনে কম্পেনশেসান পাবে। আর—'

লোকনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'ওতে আমায় টানো কেন? তুমি অর্ডার দিলেই তো হবে। যাকে যা দেবার তুমিই দিও।'

'উমাপদকে মাপ চাইতে হবে।'

লোকনাথ ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। মুখের চেহারায়

স্পষ্ট সঙ্কেত দেখা গেল ক্রোধে তিনি এইবার ফেটে যাবেন। কিন্তু ফেটে তিনি গেলেন না। হীরেনের বদলে কৃষ্ণেন্দুকে উদ্দেশ করে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেষ্টবাবু, একি পাগলামি আপনাদের? উমা আর কারখানায় যাবে না স্বীকার করলাম, তবু তাকে মাপ চাইতে হবে? আপনি ওদের জানেন, আপনাকেই বলি। যে কারণেই আমি উমাকে কারখানায় যেতে না দিই, ওরা জানবে ওরাই তাকে সরিয়েছে। এতে ওদের পায়া কত ভারী হয়ে যাবে বলুন তো?'

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'পায়া ভারী হবে না, তবে ভবিষ্যতে এরকম অন্যায় আরেকটু কম সহ্য করবার সাহস জন্মাবে।'

লোকনাথ বললেন, 'তার মানেই তাই। মাপটাপ উমা চাইবে না। আপনারা যদি বাড়াবাড়ি করেন, আমি পুলিশ পাহারা বসিয়ে উমাকে কারখানায় পাঠাব।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে বলল, 'না দত্ত মহাশয়, উমাবাবুকে মাপ চাইতে হবে না। এ ক'দিন কারখানায় যান নি, আর যখন যাবেনও না, মাপ চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কি বল মমতা?

মমতা সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিক।'

হীরেন কি বলতে গিয়ে চুপ করে বসে রইল, ঘরে এসে প্রথমে যেমন শিথিল ভঙ্গিতে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসেছিল, তেমনি ভাবে। লোকনাথ উঠে অন্দরে যাওয়ামাত্র সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মমতা বা কৃষ্ণেন্দু কারো সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

'এ আবার কি?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

মমতা হাসি মুখে বলল, 'কিছু না।'

বাড়ীর জনসাতেক মানুষকে এড়িয়ে দ্রুতপদে গিয়ে মমতা হীরেনের নাগাল ধরল তার ঘরে।

খানিক পরে হীরেন এসেছে শুনে কালীতারাও হন্তদন্ত হয়ে সে ঘরে এল।

'হীরেন এলি ?' বলতে বলতে পর্দ্দা সরিয়ে কালীতারা দেখল, হীরেন আর সেই তেজী বদ মেয়েটা পরস্পরকে জাপটে ধরে আছে।

'হীরু! এসব কি? মমতা! ছি বাছা ছি।' বলতে বলতে মাথা ঘুরে কালীতারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চেয়ারে পা তুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু সবে একটু চিন্তা করবার আয়োজন করছে, মমতার মতই সাধারণ মিলের সাড়ী পরা একটি জমকালো গেঁয়ো মেয়েকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে পা নামিয়ে বসল। ট্রেনের লম্বা জার্নি ও অতিরিক্ত সিগারেট টানার ফলে চোখ দুটি তার একটু জ্বালা করছিল, রম্ভাকে দেখে যেন জুড়িয়ে গেল চোখ। হৃদয়ে বিস্মৃত স্বস্তি ও শান্তি আসার মতই বাইরে যেন আবির্ভাব হল রম্ভার। রম্ভাকে তার মনে হল চেনা। এ বাড়ীতেই কি আগে কোন দিন রম্ভাকে দেখেছে? অথবা চোখে ভাল লাগায় মনে হচ্ছে চেনা, প্রকৃতির কোন এক অদেখা পটের শোভা দেখে মুগ্ধ হলে যেমন ভাললাগা মানুষ; ভাললাগা সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, জ্যোৎস্না রাত, ভাললাগা পাহাড় বন নদী সাগর সব কিছু মনে পড়তে থাকে? সার্সি বন্ধ ঘরে তামাক ও সিগারেট পুড়ছে, রম্ভা নাক সিটকে বলল, 'মাগো কি দুর্গন্ধ! আমি রম্ভা, কেষ্ট বাবু। ঝুমুরিয়ার সেই বীরেশ্বর সামন্তের মেয়ে। সেই যে সেবারের বন্যায়—'

'ও, তুমি সেই রম্ভা?'

কৃষ্ণেন্দু উঠে দুটি জানালার সার্সি খুলে দিল। চারবছর আগে সে বন্যায় রিলিফ কাজ করার জন্য ঝুমুরিয়া গিয়েছিল, ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র খুলেছিল। বীরেশ্বর তাদের আদর করে ডেকে নিজের বাড়ীতে রেখেছিল, নিজে সপরিবারে এবং লোকজন জুটিয়ে রিলিফের কাজে তাদের সাহায্য করেছিল অনেক। বীরেশ্বরের বাড়ীতে ছোট

একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। রম্ভা তখন কর্ম্মীদের আর হাসপাতালের অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রয়োজন মেটাতে সারাদিন ছুটোছুটি করত। তার অদ্ভুত উৎসাহ ও আগ্রহের কথা কৃষ্ণেন্দুর মনে আছে। আর মনে আছে তার একটি বিশেষ আবদারের কথা। নীলিমা হাসপাতালে কাজ করার সময় শাড়ীর ওপর একটি অ্যাপ্রণ লাগিয়ে নিত। একদিন রম্ভা এসে চুপি চুপি কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, আমায় এরকম একটা দেবেন, আমি আরো বেশী কাজ ক ? নীলিমার একটি অ্যাপ্রণ পেয়ে খুসীতে ডগমগ হয়ে সে সেটিকে কোমরে বেঁধেছিল, কেচে সাফ করে শুকোতে দেওয়ার সময় ছাড়া বোধ হয় দিনরাত্রি কখনো সেটি সে খুলতো না, ঘুমোবার সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকত। রম্ভা তখন ছোট ছিল, অনেক ছোট।

'তুমি খুব বেড়ে গেছ রম্ভা।'

'বয়স হয় নি?'

কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে পুরানো আলাপ ঝালাই করতে রম্ভা আসে নি, এসেছে রামপালের হয়ে কলহ করতে। মেঘলা ভোরে রুক্ষ এলোমেলো চুল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখ ও রাতজাগা চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে রামপাল এসে হাজির হতে মনটা তার ছ্যাৎ করে উঠেছিল, ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে কিম্বা ঘটবে ভেবে। রামপালের কাছে সব শুনে তারও রাগের সীমা থাকে নি। একি অন্যায় লাঞ্ছনা একটা মানুষের ওপর, আকাশে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলা নিজের কর্ত্তালি বজায় রাখার জন্য? নিজে এসে সব করবে বলে তার করে রামপালকে সকলের কাছে এভাবে অপদস্থ করার অধিকার কে দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে? কি অন্যায় কৃষ্ণেন্দুর, কি আস্পদ্দা!

রামপাল অবশ্য রম্ভার কাছে দুঃখ জানাতে আসে নি। উমাপদকে সে মারবে। এই বাড়ীতে বাড়ী-ভরা আত্মীয়স্বজন লোকজনের মধ্যে

উমাপদকে মারতে মারতে আধমরা করে ছাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে। মিস্ত্রীরা দেখুক তাকে তারা যা ভেবেছে সে তা নয়। কৃষ্ণেন্দু এসে শুনুক দলের সমর্থন বা সাহায্য রামপালের দরকার হয় নি, একাই সে উমাপদকে শাস্তি দিয়ে মিস্ত্রীদের মান রেখেছে, কৃষ্ণেন্দুর না এলেও চলত।

রম্ভার মনে হয়েছিল মিস্ত্রীদের মান রাখতে নয়, গত রাত্রির অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে তারই মান রাখতে এসেছে রামপাল। বুকে আলোড়ন উঠেছিল রম্ভার। চুপি চুপি বলবে নাকি রামপালকে কাল রাত্রির কথা, উমাপদর সঙ্গে শশাঙ্কও যাতে কিছু শাস্তি পায়? রামপালের সবল বাহু দুটির দিকে চেয়ে চোখে তার কিছুক্ষণ পলক পড়ে নি, মনে হয়েছিল সে বুঝি দ্রৌপদী, তার ভীম এসেছে দুটি কীচককে বধ করতে।

কিন্তু না, তা হয় না। রম্ভা মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলেছিল বীরেশ্বরের কথা শুনে। বীরেশ্বর বলেছিল, 'তুমি খ্যাপা না পাগল? উমাবাবুকে মারবে কেন? তোমার কি করেছে উমাবাবু? গোলমাল মিস্ত্রীদের সাথে, দশজনের সাথে। মিটমাট হবে দশজনের সাথে, যা করার তারা করবে দশজনে মিলে। তুমি গায়ে পড়ে এসে হাঙ্গামা কেলেঙ্কারি করবে কি জন্যে? হাঁ, তোমায় যদি অপমান করতেন কি মারতেন তখন তুমি দু'ঘা বসিয়ে দিতে, সে ভাল কথা। কদিন কেটে গেল, তুমি কবার এলে গেলে এবাড়ী, আজ বলা নেই কওয়া নেই উমাবাবুকে হঠাৎ মারতে যাবে কি রকম?'

তাই বটে। রম্ভাও সায় দিয়েছিল এ কথায়। দলের কাছে নিজের মান বাঁচাতে উমাপদকে মারা চলে না রামপালের। তার গত রাতের অপমানের ঝাল ঝাড়ানো যায় না রামপালকে দিয়ে। রম্ভার মনে পড়ে, ভীমকে পর্য্যন্ত কীচক বধ করতে হয়েছিল কৌশলে, গোপনে।

রামপালকে তো আর বলা যায় না তুমি সেই রকম কোন উপায়ে চুপি চুপি উমাবাবু আর শশাঙ্ককে কিছু শাস্তি দিও—মেরে ফেলো না, কিন্তু খুব মেরো, দুজনে যাতে কেঁদে ককিয়ে পায়ে ধরে মাপ চায়, রম্ভার কাছে না, রামপালকে এ সব বলা যায় না ওকে জড়ানো যায় না তার ব্যাপারে।

কৃষ্ণেন্দুকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায়, যে সে কেমন ধারা মানুষ, রামপালের সঙ্গে তার শত্রুতা কেন।

রম্ভার কথা ধাঁধার মত ঠেকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

'আমি রামপালের কি করলাম রম্ভা? দু'একবার দেখেছি মাত্র, ভাল করে ওকে চিনি না আমি, আমার কেন শত্রুতা থাকবে ওর সঙ্গে? আমি ছিলাম পাটনায়—'

'আপনি তো তার করে সবাইকে বারণ করে দিলেন ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, ওকে অপদস্থ করলেন। অন্য কেউ আজে বাজে লোক হলে কথা কইতাম না কেষ্টদা। এমন লোক কিন্তু খুঁজে পাবেন নাকো আর একটা। জানেন, পুলিশ আসতে সবাই পালালে, ও একা দাঁড়িয়ে রইল, ধরা দিল। হাঙ্গামা মেটাবার জন্য কত করেছে জানেন? মিটমাট না করলে উমাবাবুকে মেরে দশ বছর জেল খাটতে পর্য্যন্ত রাজী আছে। আপনি না আপশোষ করতেন খাঁটি লোক, কাজের লোক মেলা বড় কষ্ট? আরও কত কি বলতেন বড় বড় কথা মনে নেই ভাবছেন?—সব মনে আছে। আপনিই কিনা শেষে নিজের কর্ত্তালি বজায় রাখতে হিংসে করে ওর মন ভেঙ্গে দিলেন, দমিয়ে দিলেন মানুষটাকে!'

ব্যাপার খানিকটা বোধগম্য হওয়ায় এবার কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করে, 'রামপাল তোমার কোন ভাই রম্ভা? তোমার ভাইদের নাম ভুলে গেছি।' রম্ভা রাগ করে বলে, ভাই? ভাই হতে যাবে কেন আমার?

আমার কেউ হয় না। এই তো কদিন আগে চেনা হল কলকাতা এসে। বেশ মানুষ আপনি।'

রম্ভা কলহ করে আর তাকে দেখে কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ে যায় ষ্টেশনে মমতার কলহের ভঙ্গি ও কথা। রম্ভা সত্যই কোমরে কাপড় জড়িয়েছে। কলহ করার জন্য এখানে এসে নয়, আগে থেকেই জড়ানো ছিল, মনের মধ্যে ঝগড়া ভাঁজতে ভাঁজতে মসগুল হয়ে আসায় জড়ানো আঁচল খুলতে ভুলে গেছে। ছোট কথা নিয়ে, মিছে নালিশ ধরে, ছেলেমানুষী কলহ করছে রম্ভা কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর মনে হয় মমতার নিজেকে নিয়ে কলহ করার চেয়ে জোরালো আর জমজমাট হয়ে উঠেছে পরের জন্য রম্ভার ঝগড়া। রম্ভার বিরোধ তেজী, আন্তরিকতায় সহজ ও স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাস দ্বিধাসংশয়হীন অ-টলমল, জিদ সহিষ্ণু। এত অল্প সময়ের মধ্যে রম্ভার সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপক একটা আন্দাজ করা কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে অবশ্য মমতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। মমতার বিরোধিতা, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস আর একগুঁয়েমির স্বরূপ তার জানা ছিল বলে।

যা বলার ছিল প্রাণ ভরে বলে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে রম্ভা বলে, 'কথা কন না যে ? কীই বা বলবেন, বলার কিছু থাকলে তো !'

কৃষ্ণেন্দু তখন আত্মসমর্থন করে কৈফিয়ৎ জানায়, বলে, 'আমার দোষ নেই রম্ভা, আমি কিছু করি নি। রামপালের কথা আমি কিছুই লিখিনি টেলিগ্রামে। এসব কিছু জানলে তো লিখবো ? আমি শুধু কবে আসব জানিয়েছিলাম। দুঃখ করো না, আমি রামপালের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইব।'

'ক'ন না কথা। সে তো বসেই আছে ওঘরে। ডাকব ?'

রামপালকে না ডাকিয়ে কৃষ্ণেন্দু নিজেই বীরেশ্বরের ঘরে গেল।

বীরেশ্বরের সঙ্গেও আলাপ করবে! মাঝখানে বহুদিন কেটে গেলেও এই স্বাধীনচেতা এবং চাষীর পক্ষে আশ্চর্য্য রকম সংস্কার-মুক্ত খাপছাড়া লোকটিকে সে ভোলে নি।

পরিচয় হবার পর প্রথমে ভেবেছিল ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করে বীরেশ্বরকে ভার দেবে। বীরেশ্বরের মেজাজ আন্দাজ করার পর কৃষ্ণেন্দুর ভরসা হয় নি। আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী লোক দিয়েও কাজ চলে কিন্তু তীব্র অভিমানের তাপে এত বেশী মাথা গরম হলে বিপদ হয়। বীরেশ্বরকে কৃষ্ণেন্দু কাজে লাগাতে পারেনি, কিন্তু ভুলতেও পারেনি তাকে।

কৃষ্ণেন্দু আলাপ করতে জানে চমৎকার। অচেনা লোকের সঙ্গে অল্প সময়ে সে ভাব জমাতে পারে। নানা আবেষ্টনীর নানা ধাঁচের মানুষের বিচিত্র মন ও আচরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার অভিজ্ঞতায় তার অকারণ সমালোচনার আদিম প্রবৃত্তি এত বেশী চাপা পড়ে গিয়েছে যে তার কথা ও ব্যবহার মানুষের মধ্যে অমিল বা বিরোধিতার অনুভূতি জাগায় না। অসহায় অসুস্থ জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হৃদয়মনের অসংখ্য বিকার আর ছদ্মবেশ প্রথম বয়সে মানুষ জাতটার উপরে কৃষ্ণেন্দুর অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হবার দাওয়াই পেয়ে সেই আবেগজ্বরের উপশম হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মানুষের সম্পর্কে খানিকটা নির্ব্বিকার ও প্রায় নির্ব্বিচার বন্ধুত্ব-বোধ। কোন মানুষকেই সে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাও করে না, তুচ্ছ ও ভাবে না। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মানুষের কাজ ও অকাজ করার বিস্ময়কর প্রচ্ছন্ন প্রেরণা মোটামুটি অনুমান করতে শিখে মানুষ সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ তার কমে গিয়েছে।

ভুল বোঝা আর অর্থহীন অকারণ ছেলেমানুষী অভিমানের জন্য রাম-পালকে সে একটু তিরস্কার করল, কিন্তু এত পরিষ্কার করে তার ভুলটা

বুঝিয়ে দিয়ে এমন বন্ধুর মত এটা সে করল যে রাগ করার বদলে নিজের অপদার্থতায় বিমর্ষ হয়ে গেল রামপাল। তার হয়ে ওকালতি করার পাগলামীর জন্য রম্ভার করতে লাগল লজ্জা, রামপালের সম্পর্কে আজ এই প্রথম ক্ষীণ একটু সংশয় জেগে মনটাও তার খারাপ হয়ে গেল খানিক। বেশী বড় কি ভেবেছে সে রামপালকে, সে যা নয়? কৃষ্ণেন্দু নতুন একটা পরিচয় পাইয়ে দিল রামপালের। এখনো ওকে চিনতে কি বাকী আছে তবে?

রামপালকে উৎসাহ দেবার জন্য কৃষ্ণেন্দু তখন বলল, 'দুঃখ কোরো না ভাই। তোমার যদি নিষ্ঠা থাকে, দরদ থাকে, ওরা নিজে থেকেই তোমায় একদিন মানবে। আজ তোমাকে ভুল বুঝেছে, কাল ভুল ভেঙ্গে যাবে। নিজেই ভেবে ত্থাখো, উমাবাবুকে মারতে দেওনি বলে সবাই রাগ করেছিল, কিন্তু রাগ করলে কি হবে, মনে মনে তো সবাই টের পেয়েছিল কাজটা তুমি ঠিক করেছ, আপনা থেকে সকলে তাই তোমায় মেনে নিয়েছিল। কারো বলে দিতে হয়নি। ব্যাপারটা শুনে আমি বড় খুসী হয়েছি রামপাল। তোমার প্রশংসা করেছি!'

শুনে রামপালের বিমর্ষভাব কেটে গেল আর রম্ভা মনে স্বস্তি পেল এবং দু'জনের চোখে চোখে তাকানো দেখে কৃষ্ণেন্দুর লাগল চমক। ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে, কত অভিজ্ঞতায় গড়া তার আবেগহীন বাস্তববোধ, হঠাৎ তীব্র আলো লাগা চোখের মত মন কিনা তার ঝাঁকি খেয়ে অন্ধ হয়ে গেল এদের ভালবাসার চাহনির ছোঁয়াতে!

কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও নিজের স্নায়ুমণ্ডলীতে এই আকস্মিক উত্তেজনা ঘটার ব্যাপারটা কৃষ্ণেন্দুর কাছে প্রথমে বড় দুর্বোধ্য মনে হল। এটা কোন আঘাতের প্রতিক্রিয়া? দুটি মানুষের প্রেম হয়েছে জানাটা তো এমন কিছু অঘটন নয় যে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে বলেই এমন ভাবে নাড়া লাগবে? এ রহস্য কোনদিনই কৃষ্ণেন্দুর সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়

নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করার মত সময়ও তার ছিল না। আগে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আয়ত্ত না করে ওরকম বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ কাজেও লাগত না। অন্ততঃ নিজেকে সন্তুষ্ট করার মত করে নিজস্ব রহস্য ভেদ করার তাগিদটা কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে চিরদিনই জোরালো। অবসর মত ভেবেচিন্তে পরে কয়েকটি যোগাযোগ খুঁজে বার করে সে বুঝেছিল যে খাপছাড়া অনৈসর্গিক কিছু ঘটেনি। হীরেন ও মমতার প্রেম নিয়ে সে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। অনাত্মীয়, সদ্য পরিচিত রামপালের হয়ে রম্ভার হৃদয়গ্রাহী সতেজ কলহ তার মনে একটা রহস্য সৃষ্টি করেছিল। দু'জনের ভালবাসা হয়েছে জানামাত্র সে রহস্য গিয়েছিল ফেটে। কেবল তাই নয়, তার স্মরণ আছে, দুজনের মুখের ভাব ও দৃষ্টিবিনিময় দেখে সে অনুভব করেছিল যে একটা কল্পনাতীতরূপে নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে এমন প্রচণ্ড উন্মাদনার সঙ্গে ওরা দু'জন পরস্পরকে কামনা করেছে যা তার কাছে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

একজন মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তার বন্ধু আছে কৃষ্ণেন্দুর। নাম মৃণ্ময় সরকার। কথা প্রসঙ্গে একদিন কৌতূহলের বশে কৃষ্ণেন্দু তাকে তার এই অভিজ্ঞতার বিবরণ জানাল।

বন্ধু হেসে বলল, 'তোমার আন্দাজটা মিথ্যে নয়, তবে গৌণ। আসল কারণ ভিন্ন।'

'কি কারণ?'

'তুমি একজন যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং এককালে ঘোরতর রোমান্টিক ছিলে, এই কারণ। কাজের নেশায় আত্মভোলা হয়ে থাক কিনা, তাই আচমকা সহানুভূতির ঝনঝনানিতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। অভ্যাস তো নেই।'

ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে কৃষ্ণেন্দুর একটা সাম্প্রতিক

অস্পষ্ট ধারণা সমর্থন পেয়েছিল। সমস্ত স্বীকৃত সত্যগুলিকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করার, যাচাই করার, কষে নেবার দিন এসেছে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের। মনকে, আত্মাকে নিছক মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে মানতে হলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের হৃদয় আজ নৈরাশ্যের ভারে টন টন করবে। কিন্তু এই নৈরাশ্যও একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল বলে মেনে নিয়ে মানুষকে শিখতে হবে অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে উৎফুল্ল হবার কায়দা। নিজেকে যন্ত্র বলে জানতে—তা সে যত জটিল, যত কোমল, যত বিস্ময়কর যন্ত্রই হোক—ও মানতে না শেখা পর্য্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই।

কত দিনে মানুষের এই সহজ বুদ্ধি আসবে কে জানে। যন্ত্র বলতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন মেটাতে মানুষেরই সৃষ্টি করা কলকব্জার কথা মনে আসে, বাধা শুধু এইটুকু। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্যটাই যেন সব!

বেলা প্রায় বারোটার সময় কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে রামপাল চলে গেল, তাড়াতাড়ি নাওয়া-খাওয়া সেরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাপের সঙ্গে রম্ভা রওনা হল ঝুমুরিয়া, বেলা তিনটের গাড়ী। জীবনে কখনো এতটুকু স্বাদ পায় নি এমন এক দুঃসহ ব্যাকুলতায় রম্ভার দেহমন তখন অস্থির করছে। এ কি অসুখ রম্ভা জানে না। জ্বর আসছে?

'বমি বমি লাগছে বাবা। পান কেনো।'

বীরেশ্বর মেয়েকে পান কিনে দেয়। বলে, 'শুবি? শো একটু। কমে যাবে।'

পান তিতো লাগে। চিবানো পান ফেলে দিয়ে রম্ভা আরও জড়ো-সড়ো হয়ে জানালা ঘেঁসে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখে চাওয়া ছাড়া আর কোন ইঙ্গিতটুকুরও তো বিনিময় হয় নি

তার আর রামপালের মধ্যে, সে কেন বুঝতে পারবে তার শরীরে আর মনে কেন এই দুরন্ত বিপ্লব। রামপালের সঙ্গে আর তার কোন দিন দেখা হবে না ভেবে শুধু মন কেমন করলে সে তার মানে বুঝতে পারত। মন কেমন করার অভিজ্ঞতা তার আছে। এই কটা দিন কি তার মন কেমন করে নি ঝুমুরিয়ার আপনজনদের জন্যে, বিশেষ করে ভাইপো ভাইঝিগুলির জন্যে, আরও বিশেষ করে বড় ভায়ের ছোট ছেলে পচাটার জন্যে? রামপালকে তার বড় ভাল লেগেছে। হ্যাঁ, কামনাও সে করেছে রামপালকে। রামপালের আলিঙ্গন কল্পনা করে রোমাঞ্চ হয়েছে তার। এ সব সহজ বোধগম্য কথা। সুতরাং রামপালের সঙ্গ পাবার জন্য মন খারাপ হওয়া, এ গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ভিন্নমুখী গাড়ীতে চেপে আবার কলকাতা ফিরে যাবার অদম্য সাধ জাগা, এ সব রম্ভা বুঝতে পারত। সে সুস্থ সবল মেয়ে, কখনো বিষাদের চর্চা করে নি, তবু ব্যাথার্ত্তা মেয়েগুলির মত হতাশ কান্না হৃদয়ের কুলে কুলে ছাপিয়ে উঠলেও সে ধারণা করতে পারত ব্যাপারখানা কি,—সে কি আর পীরিতের, মিলন ও বিরহের কথা জানে না, বর্ণনা শোনে নি রাধার বিরহ বেদনার? কিন্তু এতো তা নয়। তার শুধু অসহ্য উদ্বেগ আর অস্থিরতা। একটা মানুষের জন্য কেউ এমন ভয়ানক অশান্ত হতে পারে যে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা পর্য্যন্ত তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, এটা কল্পনা করার ক্ষমতা রম্ভা কোথায় পাবে?

ঝুমুরিয়ায় পৌছে রম্ভা একটু শান্ত হল। কিন্তু দেখা গেল সে বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে আর একদিনে কালি পড়েছে তার চোখের নীচে।

রামপাল ও রম্ভার আর কোন দিন দেখা পর্য্যন্তও না হতে পারত কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ঘটকালিতে তাদের একেবারে বিয়ে হয়ে গেল। তাকে দিয়ে ঘটকালিটা করাল কিন্তু মমতা। রম্ভা ঝুমুরিয়া চলে যাবার

দিন তিনেক পরে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে মমতা যাচ্ছে খালধারের মজুর বস্তিতে মেয়েদের এক সাপ্তাহিক মজলিস গড়বার আয়োজন করতে, রামপাল ও রম্ভার কাহিনী শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। সম্প্রতি সে কারণে অকারণে উল্লাস বোধ করছিল।

'ওদেব বিয়ে হয় না?'

'কি জানি। হয় বোধ হয়।'

'এক কাজ কর। মেয়েটির বাবার কাছে চিঠি লিখে দাও।'

'রামপালকে একবার জিজ্ঞেস করব না?'

'ওকে জিজ্ঞেস করেই লেখো।'

কৃষ্ণেন্দু একটু ভেবে বলল, 'চিঠি লিখে কাজ নেই, বীরেশ্বর শীগগির কলকাতা আসবে আরেকবার, মুখেই বলব তখন।'

মমতা অসহিষ্ণু হয়ে বলছিল, 'না না, কালকেই তুমি চিঠি লিখে দাও কেষ্টদা। আমার মতলব আছে।'

'মতলব?'

'আছে। আমাদের বাড়ীতে একদিনে দু'টি বর বিয়ে করতে যাবে—হীরেন আর রামপাল। ঝুমুরিয়া থেকে ওদের সকলকে আমি আনাব। সেদিন সব একাকার করে দেব আমি। পাশাপাশি বিয়ে হবে, এক আসরে সবাই একত্র বসবে, পাশাপাশি বসে খাবে—ভদ্রলোক, মজুর, চাষী সবাই! ওঃ, আমার ধৈর্য্য ধরছে না কেষ্টদা! কালকেই তুমি চিঠি লেখো।'

মমতার এ পাগলামিতে কৃষ্ণেন্দু সায় দেয় নি, রামপালের সঙ্গে কথা বলে বীরেশ্বরকে চিঠি লিখেছিল। বীরেশ্বর কলকাতা এসে বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে গেল কিন্তু মমতার মতলব মানতে সে কিছুতেই রাজী হল না। বিয়ে যদি হয়, বিয়ে হবে ঝুমুরিয়ায়, বীরেশ্বরের নিজের বাড়ীতে। কলকাতায় এসে পরের বাড়ীতে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

মমতা দমে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করছিল, 'ও কেন আপত্তি করল কেষ্টদা? ওর তো লাভ হত সবদিক দিয়ে, সব খরচ আমি দিতাম।'

কৃষ্ণেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'সবাই তো লাভ চায় না মমতা। ওকে তুমি চেনো না। তোমার প্রস্তাব শুনে আপমান বোধ করে যে রেগে ওঠে নি তাই অনেক ভাগ্যি বলে জেনো।'

হীরেন ও মমতার বিয়ে হল আশ্বিনের গোড়ায়, পূজোর দিন সাতেক আগে। লোকনাথের বাড়ীতে খুব ধূমধামের সঙ্গে পূজো হয়, শিল্পচাতুর্য্যে অপরূপ দামী প্রতিমা আসে। এবার বিয়ের সমারোহ শেষ হতে না হতে পূজোর সমাবোহ আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ-ক্লান্ত উৎসব-শ্রান্ত বাড়ী বোঝাই মানুষগুলির কাছে বিজয়া যেন মুক্তির স্বস্তি নিয়ে এল। লোকনাথের কারখানাগুলির সমস্ত লোকেরা এবং মমতার নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসা মজুর ও ধাঙ্গড়রা সবশুদ্ধ তিন দিন পাত পেতে গেল।

রামপালও রম্ভার বিয়ে হল আশ্বিনের শেষ দিকে, পূজোর পর। কৃষ্ণেন্দু, মমতা, হীরেন, আরিক ও দীনেশ নামে কুড়ি একুশ বছরের একটি উৎসাহী ছেলে এই পাঁচজন ভদ্রলোক বর রামপাল ও তার মজুর মিস্ত্রী সঙ্গীদের সাথে বরযাত্রী এল ঝুমুরিয়ায়।

দুই

স্বামীর ঘর করতে এসেই রম্ভা টের পায়, সে এক নতুন জগতে এসে পড়েছে, ঝুমুরিয়ায় তার এত দিনের পরিচিত জগতের সঙ্গে যার মিল বড়ই কম। স্থানের সঙ্কীর্ণতা আর আলো বাতাসের অভাবটাই প্রথমে যেন তার দম আটকে দিতে চায়। দিনের বেলাতেও ছায়ান্ধকার এতটুকু সেঁতসেঁতে বাড়ীতে একগাদা পাকাপোক্ত হৃদয়হীন অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষের ভিড় তাকে সারাদিন অনুভব করায় যে সে যেন হাট-বাজারের জেলখানাতে বন্দিনী। ঝুমুরিয়ার খোলা মাঠঘাট বন প্রান্তরের জন্য তার মন কাঁদে না। উঁচু মাটির ভিটায় বড় বড ঘর, মস্ত উঠানে সকাল থেকে সন্ধ্যাতক রোদের ছড়াছড়ি, দেহের অনাবৃত অংশের ত্বকে ক্ষীণতম বায়ু সঞ্চালনের অনুভূতি আর বাড়ী ভরা গেঁয়ো আপনজনগুলির সাহচর্য্য, এই সমস্তের অভাবটাই তার প্রায় অসহ্য মনে হয়। গৃহের চারিদিকে গাঁ অথবা সহর, সদরে দাঁড়িয়ে জানালায় তাকিয়ে মাটি তৃণ গাছপালা খড়ো ঘর আর দিগন্ত প্রসারিত আকাশ কেন চোখে পড়ে না, খোয়া তোলা গলি ও নোংরা নর্দ্দমা পেরিয়েই খোলার ঘরে দৃষ্টি কেন আটকে যায় এসব বড় কথা নয় রম্ভার কাছে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে স্বামীর বাড়ীর পার্থক্যটাই তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ঠেলে তার নড়তে চড়তে কষ্ট হয়, গুমোটের মত ভারি বাতাস টেনে টেনে শ্বাস নিতে হয়, ধোঁয়াটে অস্বচ্ছলতা দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রাখে।

রামপাল ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কি হল, কি হল তোমার বৌ?'

'কই না। কিছু তো হয় নি।'

'কাঁদ কেন?'

'কই কাঁদলাম ?'

'মুখ যে ভার ভার ?'

'ধেৎ।'

রামপাল তার হাত ধরে। রোয়াক কি উঠান কি ঘর খেয়াল থাকে না রামপালের। রম্ভা ঘরে পালায়। ছোট সোদা-গন্ধী আধ অন্ধকার ঘর, সেখানে রামপাল তাকে মহাসমারোহে ভালবাসে, তাকে ভালবাসায়। কে জানে তখন সকাল কি দুপুর কি সন্ধ্যা, রম্ভা গা ধুতে যাচ্ছিল কি দুর্গার রান্নাঘরে রাঁধছিল কিম্বা আনমনে ভাবছিল ঝুমুরিয়ার কথা। গোড়ায় ক'দিন রামপাল কাজে যায় নি, তারপরেও মাঝে মাঝে কামাই করছে। রম্ভার আবেগও আগ্রহ কম থাকে না, কিন্তু রামপালের উদ্দাম ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে যেতে পারে না বলে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। বাড়ীটা পছন্দসই নয় আর বাড়ীর মানুষগুলি একটু খাপছাড়া বলে তার আপশোষ হবে কেন ? ঝুমুরিয়ার বাড়ীতে তো তার রামপাল ছিল না, মিলনের এই পরম উৎসব ছিল না, তাদের দু'জনের জীবন তো এভাবে ভরাট হয়ে উঠবার সুযোগ পায় নি অবর্ণনীয় রসে, আনন্দে, উপভোগে ? তবে কেন সে বিশ্ব-সংসার ভুলে যেতে পারে না রামপালের মত ? সে কি স্বার্থপর ? মনটা কি তার ছোট ? একসঙ্গে সব কি সে চায় নিজের জন্য— বিয়ের আগে যা ছিল তাও থাকবে, বিয়ের পরে যা পেয়েছে তাও থাকবে ?

'তুমি বড় কঠিন বৌ।' রামপাল সখেদে নালিশ জানায়।

'কেন গো ?'

'এত করে মন পাই না।'

'যাঃ, মন তো নিয়ে নিয়েছো সেই কবে।'

ত্রুটি হচ্ছে ? অন্যায় করছে ? যতটা সাড়া দেওয়া উচিত ছিল

দিতে পারছে না, যতটা খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত ছিল নিতে পারছে না? অথবা বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর ঘরে এলে প্রথমটা এরকম হয় মেয়েদের?

মানিয়ে নেবার জন্য খাপ খাইয়ে নেবার জন্য রম্ভা উঠে পড়ে লেগে যায়। রামপালকে আরও বেশী করে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে, বাড়ীর মানুষগুলির সঙ্গে মিতালি জমায়।

বাড়ীর ধাঁচটা অদ্ভুত—গলি থেকে লম্বা হয়ে এসে চ্যাটালো গোলাকার হয়ে গেছে। লম্বা অংশে দু'হাত চওড়া উঠান, চব্বিশ ঘণ্টা ভিজে থাকে। দুপাশে আধ হাত উঁচু আর দেড় হাত চওড়া দাওয়া এবং দু'খানি করে ঘর। ভিতরের দিকে চ্যাপ্টাকোণ ত্রিভুজের মত প্রায় গোলাকার কিছু বড় উঠান ঘিরে আরও কতগুলি ঘর আছে। একখানা করে নিয়েই অধিকাংশ ভাড়াটে বসবাস করে, কেবল পরেশ আর গোপালের ঘর দু'খানা করে। গোপালের রোজগার একটু ভাল এবং সংসারটিও বড়। একটি ছোটখাট দর্জির দোকান তার আছে। এ বাড়ীতে পরেশের সঙ্গেই রামপালের ভাব বেশী। পরেশের স্ত্রী দুর্গা এতকাল রামপালকে রেঁধে খাইয়েছে স্বামী আর দেওরদের সঙ্গে, রামপাল খরচ দিয়ে এসেছে মাসে মাসে। রম্ভা আসবার পরে দ্বিতীয় মাসেও এই ব্যবস্থা বজায় আছে, যদিও রম্ভার ভিন্ন সংসার পাতার কথাটা কয়েকবার উঠেছে ভাসাভাসা ভাবে। দেশে রামপালের বাপ মা ভাইবোন কেউ না থাকলেও আত্মীয়স্বজন ছিল, বিয়েতে কিন্তু সে তাদের কাউকে ডাকে নি। দুর্গাই রম্ভাকে বরণ করে ঘরে তুলেছে, আচার নিয়ম পালন করেছে, আদর যত্ন দেখিয়েছে, নতুন বৌয়ের জন্য শাশুড়ী ননদের যা কিছু করার থাকে সব সে করেছে একা। বয়স তার বেশী নয়, দুটি ছেলের মধ্যে বড়টির বয়েস হবে বছর তিনেক, ছোটটি এখনো মাই টানে, কিন্তু

ক'বছর একা সংসার চালিয়ে তার রকম-সকম হয়েছে পাকা গিন্নীর মত। রম্ভাকে ভালবেসে দরদ করতে শিখলেও তার সখি সে হয়ে উঠতে পারে নি, তার ব্যবহারে একটু গুরুজন গুরুজন ভাব রয়ে গেছে।

পরেশের দু'ভায়ের নাম সুরেশ আর নরেশ। সুরেশ একটু গম্ভীর রগচটা ধরণের যুবক, সুবালা নামে তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর বয়সে বড় পাড়ার একটি হাফ-গেরস্ত মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ভাব জমিয়ে দিন কাটাচ্ছে। লোকনাথের কাঠের কারখানাতে সেও মিস্ত্রীর কাজ করে। রোজগারের অর্দ্ধেক এনে দেয় দাদার হাতে, বাকী অর্দ্ধেক সম্ভবতঃ খরচ করে সুবালার পিছনে। ভাল একটি মেয়ে দেখে তার বিয়ে দেবার জন্য পরেশ ও দুর্গার চেষ্টার বিরাম নেই দু'বছর ধরে, কিন্তু সুরেশ নির্ব্বিকার। অথচ আশ্চর্য্য এই, সুবালার প্রেমে হাবুডুবু খাবার কোন লক্ষণও তার দেখা যায় না। রাতগুলি বেশীর ভাগ তার বাড়ীতেই কাটে। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায়, রাতে সে বাড়ী ফেরেনি, কিশোর নরেশ দুয়ার না দিয়েই একা ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে।

নরেশ ছেলেটা বড় চঞ্চল, চালাক আর অবাধ্য। এই বয়সে ছেলেটা যে কি করে এমনভাবে পেকে গিয়েছে রম্ভা ভেবে পায় না। আরও সে ভেবে পায় না কি করে এর সঙ্গে এত সহজে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে শাসন করার বদলে ছোঁড়াটার পাকামিকে প্রশ্রয় দিতে তার ভাল লাগছে।

এখানে আসবার পরদিন বিশেষ দরকারে রামপাল বেলা তিনটের সময় অনিচ্ছার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, খালি ঘরে রম্ভা তাকিয়ে আছে মাটি লেপা দেয়ালে বসানো একরত্তি জানালা দিয়ে গলির ওপারের দুটি বাড়ীর ফাঁকে খানিক তফাতের খালের অংশটুকুর দিকে। বিড়ির গন্ধে

উদভ্রান্ত হয়ে ভাবল, একটু সময়ের জন্যও তবে কি রামপাল তাকে ছেড়ে যেতে পারল না, ফিরে এল বেরিয়ে গিয়ে! তারপর রম্ভা চেয়ে ত্যাখে কি পাশ থেকে রোগা একটি হাত এগিয়ে এসে তার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিচ্ছে ছোট একটি কৌটো!

ফিরে তাকাতে বিড়িতে জোরে টান দিয়ে যেন প্রায় বুক ফুলিয়ে নরেশ বাহাদুরীর হাসি হাসল। নতুন বৌকে সে ছ'পয়সার এতটুকু একটি কৌটো উপহার দিয়েছে—কৌটোর ওপরে আবার একরত্তি আশি আঁটা!

'টেঁপিকে দেখিও না। এ্যাঁ? মেয়েটা ভীষণ হিংসুটে।'

'টেঁপি কে?'

'ওই যে ওবাড়ীর সোনামাসীর মেয়ে টেঁপি। বোলো না ওকে।'

'এটা টেঁপির নাকি? নিয়ে যাও বাবু তোমার টেঁপির জিনিষ। আমি চাই নে।'

নরেশ উদারভাবে বলেছিল, 'তাতে কি, নাও না। কিছু হবে না।'

পরে রম্ভা সোনামাসীর পরিচয় পেয়েছিল, তার আহ্লাদী মেয়েরও। সোনামাসী গলির আরও ভিতরে কয়েকটা বাড়ী পেরিয়ে এক বাড়ীতে থাকে। কাবুলীওলার ব্যবসা চালিয়ে সোনামাসী নিজের সংসার চালায়। পুঁজি তার সামান্য, স্বামী মরবার পর গায়ের সব গয়না আর ঘরের সব বাড়তি বাসনকোসন বেচে দিয়ে টাকা কটা সংগ্রহ করেছিল। সংসার বলতে সে নিজে আর তার ওই মেয়ে টেঁপি, খরচ বেশী নেই। একটি টাকা তার বাইরে গেলে কদিনের মধ্যে পাঁচ সিকে হয়ে ফিরে আসে। দশ বছর ধরে সোনামাসী মেয়েকে দুধ ভাতও খাইয়েছে, পুঁজির টাকাও বাড়িয়েছে। ব্যবসাটা সে আয়ত্ত করেছে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে। প্রথম প্রথম দু'চার টাকা

তার মারা গিয়েছিল, লোক চিনতে ভুল করেছিল, বেশী সুদের লোভ সামলাতে পারে নি। এখন সে আর ঠকে না, তাকে ঠকিয়ে পার পাবার ক্ষমতা আছে এমন লোককে সে টাকা কখনো ধার দেয় না, বাজে লোকের সঙ্গে কারবার করে না। কার কাছ থেকে কি ভাবে টাকা আদায় করতে হবে তাও সে নির্ভুলভাবে জানে। কারো কাছে ধন্না দেয়, কার কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, কাউকে দেয় গলা ফাটিয়ে অকথ্য গালাগালি আর কাউকে দেখায় ভয়। আবার কারো কারো বেলা সময় পার হয়ে গেলেও কখনো তাগিদ দেয় না। সে জানে যে তার তাগিদের চেয়েও এ সব লোকের কাছে চক্ষু-লজ্জার তাগিদ ঢের বেশী জোরালো। হাতে এখন টাকা নেই বলেই তার টাকা ফেরত দিচ্ছে না, এখন গিয়ে টাকা চেয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে দিলে তারই বিপদ।

এমন যে সোনামাসী, গায়ের রঙ যার খাদ মেশানো পেতলের মত, তার বারো বছরের ট্যাবটেবে ছিচকাদুনে মেয়ে টেঁপির সঙ্গে নরেশের বড় ভাব।

দুর্গা বারণ করে, ভয় দেখায়। বলে, তোর কি মরণ নেই রে লক্ষ্মীছাড়া, সোনামাসীর ঘরে আদর খেতে যাস? ঘরের আদরে পেট ভরে না তোর? ও মেয়ে দিয়ে ব্যবসা করবে সোনামাসী, তাও কি টের পাসনে তুই হাড়হাবাতে? ফের যাবি তো তোর দাদাকে বলে হাড় গুঁড়িয়ে দেব বলে রাখছি।'

নরেশ অম্লান বদনে মিথ্যা বলে, 'যাই না তো। তোমার খালি বাজে সন্দ।'

এরা ছাড়া আছে মোটা শিবু, রোগা শরৎ, বুড়ো গগন, ক্ষান্ত পিসী, রাণীর মা, পাগলা ইত্যাদি আরও কয়েকজন ভাড়াটে।

গোপালের সাতটি ছেলে মেয়ে, বড়টির বয়স পনের বছর।

গোপালের বৌ ন'মাস পোয়াতি। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাক লেগে যায়, ভাবা যায় না পেটের ভারে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়া সে কিসের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। চুল ওঠা মাথায় টাকের মত চওড়া সীঁথিতে ছটাক খানেক সিঁদুর, কপালের ফ্যাকাসে ঢিলে কালো চামড়ায় চওড়া সিঁদুরের ফোঁটা, সাদাটে গভীর চোখ, ঠিক যেন যন্ত্রণায় জোরে চাপা কোঁচকানো ঠোঁট আর জীর্ণশীর্ণ পেটমোটা কঙ্কালসার দেহ দেখে পাড়ায় কাণাকাণি চলে যে ছেলে বিয়োবার সুখ ভোগ করতে কোন উপদেবী—হয়তো বা গর্ভটর্ভ নষ্ট করার পাপে উপদেবী হয়েছিল এমন কেউ—মা হবার সুখ ভোগ করতে গোপালের স্ত্রীকে ভর করে আছে। বছর বছর ছেলে মেয়ে হয় অনেকের, জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন মায়েরও কোন অভাব নেই কিন্তু এমন চেহারা নিয়ে এত ছেলে বিইয়ে যে কেউ নিজেও বেঁচে থাকে, বিয়ানো ছেলে মেয়েগুলিও সবকটা বেঁচে থাকে—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ কখনো ত্যাখে নি।

মা ও ছেলেমেয়েগুলি সবাই যেন এই মরে তো এই মরে—অথচ একটাও মরে না! এ রহস্য কি মাগ্‌না সম্ভব হয়?

শুধু কি তাই? গোপালের বৌ যে অমন তেজের সঙ্গে ঝগড়া করে সে তেজ সে পায় কোথায়?

ক্ষান্ত পিসীর ছেলে বিন্দেও মিস্ত্রী। বিশেষ কোন দক্ষতা নেই, সাধারণ মজুর মিস্ত্রীর বেতন পায়। বছর খানেক বিয়ে করেছে। একখানার বেশী ঘর ভাড়া নেবার ক্ষমতা তার নেই, বিয়ের পর মাকে কোথায় যেন কোন আত্মীয়ের কাছে সরাবার ফিকিরে ছিল, পেরে ওঠে নি। ক্ষান্ত পিসীর দু'একটা গয়না আর সত্তর আশী টাকা নগদ আছে। জোর তাই খাটানো চলে নি একেবারেই। প্রায় সত্তর বছরের বুড়ী, আজ মরে কি কাল মরে ঠিক নেই, তার ওপর জোরই বা খাটানো

যায় কি করে ? ছেলের বিয়ের পর বর্ষা নামা পর্য্যন্ত মাসখানেক ক্ষান্ত পিসী এখানে সেখানে রাত কাটিয়েছে, তারপর মাঝখানে একটুকরো চট টাঙিয়ে ক্ষান্ত পিসীর বিছানা করতে হয়েছে বিন্দে ও তার নতুন বৌয়ের বিছানার ঠিক আড়াই হাত তফাতে। কদিন মরার মত নিঃশব্দ হয়ে থেকেছে বিন্দে আর তার বৌ। তারপর শোনা গেছে তাদের চাপা গলায় ফিসফিসানি প্রেমালাপ ও প্রেমের মৃদু ইঙ্গিত। তারও পরে ছেলেবৌয়ের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্ষান্ত পিসীর।

শিউশরণের বাড়ী গয়া জেলায়। প্রায় আট ন' বছর ধরে সে এ বাড়ীতে থেকে একনিষ্ঠভাবে দু'টি সাধনা করে গেছে, গোঁপ পাকানো ও টাকা জমানো। মাঝে মাঝে সে দেশে যেত, সম্প্রতি দেশে গিয়ে একটি চতুর্দ্দশী মোটাসোটা বৌ নিয়ে ফিরে এসেছে। গলায় হাসুলী, পায়ে মল, হাতে চারটি রূপার ও গণ্ডা দুই কাঁচের চুড়ি পরা, হলদে কাপড় জড়ানো ছিটের জামা গায়ে বিশালস্তনী বৌটিকে শিউশরণ যে অত্যন্ত ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৌয়ের প্রতি তার একান্ত আনুগত্যে!

ঘরের কাজ আর বৌয়ের সেবা করায় তার উৎসাহের যেন অন্ত নেই।

পাশের ঘর থেকে রাণী রাত্রে তাদের প্রেমালাপ শোনে এবং সকালে সকলকে শুনিয়ে খিল খিল করে হাসে।

সরযূ প্রায় ধমকের সুরে অবজ্ঞা ভরে বলে, নেহি নেহি। মেরা ভবিষ্যৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।'

শিউশরণ মিনতি করে, তোষামোদ করে, পায়েও নাকি ধরে। তারপর সব চুপচাপ। গাঁজার উৎকট গন্ধ ভেসে আসে খানিক পরে। তারও পরে উদাস কণ্ঠে শিউশরণ ভজন গান ধরে। আহা, তার করুণ ভজন শুনে চোখে নাকি জল আসে রাণীর!

শিউশরণের ভজন থামার পর চোখে প্রায় ঘুম নেমে এসেছে রাণীর, সরযূর ভৎসনা শুনে সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'ইয়ে কা জবরদস্তি? সরম নাহি তুমারা?'

'চোপরও!'

প্রচণ্ড চড়ের শব্দে রাণী নাকি চমকে যায়। ভাবে, সরযূ কি শেষে চড় পর্য্যন্ত মেরে বসল স্বামীর গালে? সরযূর কান্না কাণে আসতে সে বুঝতে পারে, না, শিউশরণই বিদ্রোহ করেছে।

'মাগী যেন কি, না রম্ভাদি?'

রম্ভা আসল খবর জানে। রাণীর মত সস্তা মজা পাওয়ার বদলে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। সরযূ একটু উঁচু বংশের মেয়ে শিউশরণের চেয়ে। টাকার জোরে শিউশরণ তাকে বিয়ে করে এনেছে। প্রায় সত্তর টাকা বেশী খরচ করে। শিউশরণের স্পর্শ এখনো অপমান বোধ হয় সরযূর, বিতৃষ্ণা জাগে। রম্ভা নিশ্বাস ফেলে ভাবে, বয়সটা শিউশরণের কম হলেও হয় তো নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ হত সরযূর পক্ষে।

অপস্থান, নর্দমা ও পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ—কলতলায় জলের জন্য, ছেলেমেয়ের ঝগড়ার জন্য, বেসামাল মেয়েমানুষের দিকে পুরুষের একটু তাকানোর জন্য, নিছক হিংসার জন্য আর শুধু ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য কোন্দল, পরস্পরের বাঁচনমরণে ব্যাঙ্গাত্মক উদাসীনতা আর ছলচাতুরী হীনতা দীনতা নির্ম্মম পাশবিকতায় বিষাক্ত তার এই নূতন আবেষ্টনীতেও মায়া মমতা উদারতা, আত্মনাশী নির্বাক সহিষ্ণুতা আর মহত্তর বৃহত্তর কিছুর কামনা খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে রম্ভা আত্মরক্ষা করে।

রম্ভা যখন প্রথম জেনেছিল তাদের পাশের বাড়ীর পরের বাড়ীতে

সাতটি মেয়ে থাকে—কেউ কেউ নিজের মা কিম্বা ভায়ের সঙ্গেই থাকে যে সাতটি মেয়ের যে কোনো একজনকে যে কোন পুরুষ এসে একটি টাকা দিয়ে সম্ভোগ করে যেতে পারে, রম্ভার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। পাগলের মত সে রামলালকে বলেছিল, আমায় নিয়ে চলো—অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমি মরে যাব এখানে থাকলে।

তাকে বুঝিয়েছিল দুর্গা।

'কোথায় যাবি? ভদ্রপাড়ায়? কলকাতায় ভদ্রপাড়া নেই।'

উমাপদর কথা, কালীতারা জীবনলালের কথা মনে পড়ে যায়, রম্ভার গা জ্বালা করে।

'কোথাও নেই?'

'আছে। বাবুদের পাড়া আছে। বাবু বর একটা জুটিয়ে নিলেই পারতিস—দেখতিস পাডাশুদ্ধ সতীলক্ষ্মীরা একটা স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করছে? খোলার বাড়ীর পাডায় ওরকম বাড়ী দু'চারটে থাকবেই বোন।' দুর্গা ভ্রুকুটি করে, খোঁচা দিয়ে বলে, 'আমি তো একজনকে নিয়ে এ বাড়ীতে কাটালাম পাঁচ ছ'বছর। ওসব হতভাগিদের সবাইকে জানি আমি। ওদের কষ্ট দেখে দয়া হয়—ঘেন্না তো হয়না বাছা তোমার মত!'

রম্ভা সব তেজ হারিয়ে কাতরভাবে বলে, ঘেন্না নয় দুগ্‌গাদি, ঘেন্না নয়। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার, বুক ফেটে যাচ্ছে।'

ভাবপ্রবণতার আক্রমণে রম্ভাও কাবু হয়ে পড়ে! কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ কুঁকড়ে যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্য্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে, মনের মধ্যে প্রতিবাদের নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু তাতে আর

তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জ্জনাও ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সঙ্কীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে উর্দ্ধশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা তার কেটে যায়। একদিন দুপুরবেলা যেচে পাড়ার কয়েকটি দেহবেচা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে। এদের সম্বন্ধে তার একটা উদ্ভট, বীভৎস ধারণা ছিল, তার মনে হত এদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই বুঝি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগবে। বরং দেখে সে অবাক হল, গেরস্ত অনেক মেয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, অন্য মানুষের মতই এদের সুখদুঃখ স্নেহ মায়া আছে, ভালমন্দ উচিত অনুচিত বোধ আছে, এমন কি উদারতা পর্য্যন্ত আছে খানিকটা!

বাড়ীর সকলকে আর পাড়ার অন্য বাড়ীর যে ক'জনকে পারে একদিন ডেকে এনে একত্র করে সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকা স্থাপনের একটা উপলক্ষ খুঁজছিল রম্ভা। ভোজ দেওয়া যায় না, সে অনেক খরচ, বিয়ে-টিয়ের মত মস্ত ব্যাপার ছাড়া চলে না। অকারণে বা খাপছাড়া কারণে সকলকে ডেকে এনে শসা বাতাসাও খাওয়ানো যায় না, সবাই কি ভাববে। ভেবে চিন্তে এক পূর্ণিমায় রম্ভা সবাইকে সিন্নী খাওয়াবার আয়োজন করল। পাকা কলা আর ময়দা দিয়ে রম্ভা সাদাসিদে সিন্নী বানাল। পঁচিশজনের সিন্নীতে দুধ পড়ল সের দেড়েক। তবু, তাই অনেক বলতে হবে। পঁচিশ ত্রিশ জনকে এই সিন্নীই বা খাওয়াতে পারে কজন? ক'জনের ঘরে ছেলেপিলে বিশেষ তিথিতেও এক ঢোঁক দুধ গিলতে পায়?

সিন্নী খাওয়ানো উপলক্ষে রামপাল সকলকে কীর্ত্তন গেয়ে শোনায়।

অন্য গানও গায়,—প্রেমের গান, বিরহের গান, মিলনের গান। শুধু যাত্রা পাঁচালী আর বোষ্টম ভিখারীর গান নয়, রবীন্দ্রনাথের দু'চার খানা গানও রামপাল জানে। সে গান ইথরে স্পন্দিত হয়, প্রাসাদ শিখরের আলো ঝলমল কক্ষের বাতায়ন থেকে ফুটপাতের কুষ্ঠরোগীর কাণে ভেসে আসে, স্বামী-শিবের তপস্যার অঙ্গ হিসাবে ঘরে ঘরে কুমারী মেয়ে ডাল-সিদ্ধ হবার অবকাশে যে গান গেয়ে গলা সাধে, গান জানলে কাঠচেরা করাতিও আপনা থেকে সে গান দু'চার খানা শিখে ফ্যালে। দেশী-বিলাতী মেশানো সুরের বদলে হয়তো রাম-প্রসাদী সুরে গায়—গানের সুরেতে পরাণখানিরে পাতি পথের 'পরে,—কিন্তু গায়। উপরের স্তর থেকে এমনিভাবে চুঁইয়ে চুঁইযে সবকিছু নীচের স্তরে পৌছয়।

রামপালের হারমোনিয়ম নেই, বাঁয়া তবলা আছে। হারমোনিয়াম ভাড়া করে আনা হয় পাড়ার গিবি বাড়ীউলির কাছ থেকে, ঝাঁঝালো আওয়াজের হারমোনিয়ম। রামপাল তবলা বাজাতে জানে না, তবলা বাজায় নগেন অথবা বিষ্টু। বিষ্টুর হাতটাই বেশী মিঠে, তাকেই প্রথমে সকলে অনুরোধ জানায়, সে যদি নেহাৎ বাজাতে রাজী না হয়, বিনিয়ে বিনিয়ে কেবলি বলে যে আঙুলে তার বড্ড ব্যথা, নগেনকে তখন বাজাতে বলা হয়। নগেন যেন বাজাবার জন্য ওৎ পেতে থাকে, প্রত্যাশায় উত্তেজনায় ঘন ঘন ঠোঁট চাটে আর চোখ মিট মিট করে। ডাকামাত্র উঠে এসে জোরে তবলায় চাঁটি দেয়, শুধু গজদন্ত দু'টির বদলে দু'সারি দাঁত হাসিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, যতক্ষণ বাজায় সে দাঁত আর ভাল করে ঢাকা পড়ে না। আগাগোড়া চোখ বন্ধ করে মাথা দোলায়, রামপালের গান অথবা নিজের বাজনার তালে সে মসগুল ঠিক করে বলার উপায় থাকে না।

আজও হয়তো তারই বেতালা বাজনার সঙ্গে রামপালকে গাইতে

হত, কারখানায় বিষ্টুর হাতে চোট লেগেছে। পরেশের ঘর থেকে লণ্ঠন এনে এ ঘরের দাওয়ায় পুরুষ শ্রোতাদের কাছে নামিয়ে রেখে দুর্গা বলল, 'আজকের দিনটি তুমি বাজাও গো বিষ্টুদাদা, শুনছো? ওস্তাদি ক্ষয়ে যায় তো যাবে, বলে দিনু এক কথা।'

মেয়েদের মধ্যে বসে বিষ্টুর বোনের সঙ্গেই রম্ভা কথা বলছিল। এক্ নজর তার দিকে তাকিয়ে বিষ্টু উঠে এসে বাঁয়া তবলার সামনে বসল।

চাঁদ উঠেছে কিন্তু উঠানে দাওয়ায় এখনো জ্যোস্নার ছায়া, শুধু এক ফালি রূপালী আলো নিমাইএর ঘরের পাশ কাটিয়ে কলতলায় এসে পড়েছে। দু'টি লণ্ঠনের আলোয় গান শুরু হল। রম্ভার ঘরের দাওয়ায় আর দাওয়ার নীচে উঠানে পুরুষেরা বসেছে, পরেশের ঘরের সামনে মেয়েরা। দশ বারটা বিড়ি এক সঙ্গে জ্বলছে, তবলা বাঁধতে বিষ্টু এত সময় নিয়েছে যে অনেকে বিড়ি না ধরিয়ে পারে নি। তা সময় নিক বিষ্টু, কারো তাতে আপত্তি নেই, গুণীর মর্য্যাদা তারা জানে। শুধু, কড়া পোড়া ভোঁতা ভাদগুল জীবনে রস জোটে এত কম যে লজেঞ্জস-লোভী শিশুর মত ধৈর্য্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাসী-আবেগের চর্চ্চাটা এদিকে কম নয় কিনা, ধর্ম্মে কর্ম্মে পুরাণে গাথায় ঘরকন্না আত্মীয়তার বন্ধুত্বে কলহে বিবাদে ভাবপ্রবণতার ছড়াছড়ি। এখন লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে বোঝা যায় না, দিনের আলো হলে দেখা যেত গান শুনতে শুনতে মেয়ে পুরুষের মুখে যে ভাব ফুটেছে পুরানো কলসীর শ্যাওলাটে সিক্ততার কথাই তা মনে পড়িয়ে দেয়। ঘামের মত প্রতি লোমকূপ থেকে যেন অবিরত চুঁয়োচ্ছে ভাব।

রামপাল আজ পুরানো সুরে একটি নতুন গান ধরেছে।

রাই পাগলিনী পণ করেছে গো ,
যে কাঁদায় তারে কাঁদাতে হবে।

পায়ে ধরে ঢের মান ভেঙেছে গো

(আজ) কেঁদে কেঁদে মান ভাঙাতে হবে।

নিজে সে কাঁদেনা বাঁশীরে কাঁদায়

প্রেম তার খেলা রাধা মরে যায়—

মোটা শিবু চোখ বুজে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেন কার অনুরোধ উপরোধ নীরবে প্রত্যাখ্যান করছে। খাদ্যের অভাবে এদের কারো দেহ পুষ্ট হয় না, দু'একজন শুধু শিবুর মত মুটিয়ে যায়। তাদের উন্মাদনার অভিব্যক্তি এই রকম ধীর স্থির শিথিল। অন্য সকলের মধ্যে অস্থিরতা জাগে। গগন নড়ে চড়ে বসে, জগু ঘন ঘন পলক ফেলে, শরৎ মুখ ফাঁক করে ঠিক গ্রীষ্মকালের কুকুরের মত হাঁপায়, বিন্দে পা নাচায়, অভ্যাসে উবু হয়ে বসায় ফেলনার হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপে, গোপালের শরীরটা আধ মিনিট অন্তর শক্ত আর ঢিল হয়ে যায়। রম্ভার কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাগিয়ে দুর্গা তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়, মুখে আঙ্গুল গুঁজে পুঁটু আঙ্গুলটা কামড়ে থাকে, সৈরভী অবিরাম পান চিবোয়, মিনিটে মিনিটে ক্ষান্ত পিসী দোক্তা গুঁড়ো মুখে ফেলতে থাকে, রাণী তার সই পুষ্পের গায়ে শুধু ঠেস দিয়ে নয় রীতিমত চাপ দিয়ে বসে থাকে, জগদম্বা বার বার রাণীর মার কানে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যায়, মনটা ক্যামোন করছে গো,—মেয়াটার তরে মনটা ক্যামোন করছে। গান ভুলে এদিকে মন দিলে শোনা যায়, ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দ, নড়াচড়ার শব্দ, সোনারূপা কাঁচের চুড়ি আর সোনা তামা পিতলের বালায় ঠোকা-ঠুকির টিন্ টিন্ শব্দ, সমস্ত মিলে এক অদ্ভুত মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে।

ভাসা ভাসা ছাড়া ছাড়া ভাবে রম্ভা রামপালের গান শুনছিল, আসরে বসে তাকে আসর মাতানো গান গাইতে সে আগে কখনো ছাখে নি। শুধু শুনেছিল, স্বামী তার চমৎকার কীর্ত্তন গাইতে পারে।

রামপাল গান ধরবার কিছুক্ষণ পর থেকে রম্ভা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। গানের সুরে গা তার রি-রি করে, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয় এই বুঝি রামপালের আধ-বোজা চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে। এ ন্যাকামি রম্ভার সয় না। এতবড় জোয়ান মদ্দ পুরুষ কি করে যে নিজে গান গেয়ে নিজে এমন কাতর হয়ে পড়ে মেয়ে-ন্যাংলা রোগা প্যাটকা মন-উড়ু-উড়ু ন্যালাক্ষ্যাপা ছোঁড়ার মত। হঠাৎ সে উঠে ঘরে চলে যায়। এক অকথ্য বিষাদে তার বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়।

নতুন জীবনের নতুন আবেষ্টনীকে জেনে বুঝে সইয়ে নেবার সঙ্গে রামপালকেও সে জানতে বুঝতে থাকে—মানুষটা ক্রমে ক্রমে নানা দিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। এবং এই দিক দিয়ে তার আঘাত আসে সব চেয়ে কঠিন। কাঠগোলার গোলমালের ব্যাপারে রামপালের ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু যখন ভৎ‍র্সনা করেছিল, একটা খটকা বেধেছিল রম্ভার মনে। রামপালের মেয়েমানুষের মত অভিমানী খেয়ালী শিল্পীমনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে এখন সে বুঝতে পারে সেদিন তার ভুল হয় নি। বুঝেও কিছুদিন রম্ভা বুঝতে চায় নি। জোর করে মনে করতে চেয়েছিল পিরীতের প্রথম দিশেহারা খেলার আবেগে মানুষ এরকম ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী আর আরামপ্রিয় হয়, খেয়ালী হয়, এলো-মেলো চিন্তা করে। কিন্তু দিবারাত্রি যার সঙ্গে বসবাস দহরম মহরম তার আসল প্রকৃতি কদিন না চিনে থাকা যায়। ঝুমুরিয়ার সূর্য্যকে পর্য্যন্ত একদিন রামপালের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়েছিল রম্ভার, ভেবেছিল সূর্য্য মুখে যেসব কথা বলত তার রামপাল সেই সব কথা কাজে পরিণত করবে। এখন সে টের পেয়েছে, ওসব চিন্তাই রামপালের নেই। কাঠগোলার ব্যাপারটাতে অবস্থার ফেরে জড়িয়ে গিয়ে দু'দিনের জন্য তার

একটু নেতৃত্ব করার ঝোঁক চেপেছিল মাত্র। দেশ ও দশের জন্য বড় কাজ করে গৌরব অর্জ্জন করার তাগিদ সে অনুভব করে না। তার চেয়ে কাঠের সৌখীন জিনিষ তৈরী করা আর কীর্ত্তন গাওয়ার দিকে তার ঝোঁক বেশী।

হতাশায় কালো হয়ে যায় রম্ভার দিনগুলি, মনে হয় জীবনটা ভেস্তে গেল চিরদিনের জন্য, পায়ের নীচে আর সে মাটি পাবে না, অর্থহীন, সস্তা আর পচা জীবনটা টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন কৃত্রিম অবাঞ্ছিত শূন্যতায়। কি বিশ্রী ভুল, কি ক্রূর তামাসা! ক্ষোভে রম্ভার বুক জ্বলে যায়, রামপালের সান্নিধ্য পীড়ন করে তাকে, তার বুকভরা ভালবাসা যেন বিরাগে পরিণত হয়ে গেছে।

ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে অভিমানে রামপাল ম্লান হয়ে যায়, তার আদর নেয় না রম্ভা, সাড়া দেয় না, এক অভূতপূর্ব্ব ভীতিকর গাম্ভীর্য্যে তার চোখমুখ থমথম করে,—একি সর্ব্বনাশ! কাতর হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বৌ, কি হয়েছে? তার এই ছেলেমিপানার বাড়াবাড়ি আরও খারাপ লাগে রম্ভার, আরও তার মন খারাপ হয়ে যায়। আবেষ্টনীর চাপে একবার তার মনে হয়েছিল জেলখানায় কয়েদ হয়েছে। এ অনুভূতিকে আমল না দিয়ে দমন করে প্রায় কাটিয়ে উঠেছিল। এবার আরও প্রবল হয়ে ওঠে তার ফাঁদে আটকা পড়ার, চিরজন্মের জন্য আটকা পড়ার, প্রাণান্তকর অনুভূতি। বন্দীত্ব বোধের পীড়নটাই তার কাছে চিরদিন সবচেয়ে অসহ্য।

কারো কাছে খুলে বলবার উপায় নেই। কেউ বুঝবে না। তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে সাধ যায়। নিজের হাত পা কামড়ে, দেয়ালে মাথা ঠুকে, মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে, চীৎকার করে তার নালিশ জানাতে ইচ্ছা করে ভাগ্যের এই কুৎসিৎ জুয়াচুরির বিরুদ্ধে।

কিন্তু কিছুই রম্ভা করে না। দাঁতে দাঁত কামড়ে ভাবে, না, না, না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করা হবে না। যদি ভুল হয়, যদি অন্যায় করে বসে? নিজের জীবনটা যদি তার নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, হোক। রামপাল তাকে ধরে বেঁধে বিয়ে করে নি, আমি এই আর আমি ওই বলে ভুলায়ও নি তাকে। তার কি অধিকার আছে রামপালের জীবনটা নষ্ট করার? আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দেবার? বড় কোন উদ্দেশ্যের জন্য যদি হত, রামপালের জীবন বা আত্মীয়বন্ধুর অশান্তির চেয়ে যার দাম বেশী, তা হলেও কথা ছিল। ওরকম কোন সুযোগ বা পথ যদি কখনো পাওয়া যায়, সে ভিন্ন কথা। নিজের তার যোগ্যতা কতটুকু তাই তার জানা নেই, তার কি সাজে বাহাদুরী করা? শুধু তার নিজের ভাল লাগছে না বলে? নিজের পছন্দ অপছন্দের খাতিরে?

না, না, না। সে ধৈর্য্য ধরে থাকবে।

রামপালের সঙ্গে সে তাই সামান্য কথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত করে না, বিতৃষ্ণার ভাব দেখায় না। বাইরে কথাবার্ত্তায় চালচলনে অতিমাত্রায় ধীরস্থির শান্ত হয়ে থাকে। সেটা বড়ই খাপছাড়া ঠেকে রামপালের কাছে। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রম্ভা দূর করতে পারে না, যাতে রামপাল ভয় পায়। রামপালের সোহাগ সে দূরে ঠেলে দেয় না, কিন্তু নিজে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতাও তার হয় না। যাতে তার আদর নিচ্ছে না ভেবে রামপাল কাতর হয়ে পড়ে।

পরের পূর্ণিমায় দুর্গা সিন্নী খাওয়াবার এবং রামপালের গানের আসর বসাবার আয়োজন করল। ঘটনা ঘটল একটা। যে সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু এসে আশার আলো দেখিয়ে রম্ভাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

রামপালের গান যখন বেশ জমেছে, উপস্থিত সকলের মধ্যে দেখা দিয়েছে যথারীতি প্রতিক্রিয়া, ছেলের মুখে মাই গুঁজে দুর্গা আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়েছে সুরের নেশায়, হঠাৎ গানে বাধা পড়ল।

পাগলা ও আরেকজন অচেনা মানুষ নরেশকে ধরাধরি করে এনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল। থামে ঠেস দিয়ে বসে বুকের কাছে মাথা নামিয়ে নরেশ ধুঁকতে লাগল। তার মুখে রক্ত, গেঞ্জি ও কাপড়ে রক্তের দাগ।

এক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর সকলে প্রায় একসঙ্গে কলরব করে ওঠে। এ অবস্থায় স্বাওরকে দেখেও দুর্গা এতক্ষণের গা ঝিম ঝিম করা গানের নেশা কাটিয়ে কিছু বুঝতে পারে নি, সকলের ফেটেপড়া কোলাহল যেন ঝাঁকি দিয়ে তাকে সচেতন করে দেয়। ছেলের মুখ থেকে স্তনের বোঁটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সেইখানে দড়াম করে আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে সকলের আওয়াজ ছাপিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওগো, মাগো! ইকি!'

এর গা মাড়িয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরক্ষণে সে গিয়ে হাজির হয় নরেশের কাছে।

পাগলা বলে, 'কেষ্টবাবু মেরে লাশ করেছেন।'

দুর্গার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে রম্ভা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কেষ্টবাবু?'

পাগলা সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ, কেষ্টবাবু। বাপরে বাপ, কি আথালি পিথালি মারটা লাগালে! ভয় হল কি মেরেই বুঝি ফেলেন!'

শুনে কলরব থামিয়ে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। পাগলার কথায় কারো বিশ্বাস হতে চায় না। কৃষ্ণেন্দুকে এরা মেয়েপুরুষ সকলেই জানে, অনেকদিন থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানে। বড় সে ভালবাসে তাদের, তাদের ভালর জন্য চেষ্টার তার কামাই নেই, একবার সে

জেলে গেছে তাদের জন্য। আজ নিজে সে নরেশকে মেরে আধমরা করে দিয়েছে!

'কেন মারলেন?' পরেশ শুধোল।

পাগলা এদিক ওদিক তাকায়, হঠাৎ একবার মুচকে হেসেই গম্ভীর হয়ে যায়, মাথা নেড়ে বলে, 'দোষঘাট নইলে কি এমনি মেরেছে, তেমন লোক কেষ্টবাবু নয়। যাক্ গা মারুক, ওকথা বাদ দাও।' পাগলার সঙ্গী মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে বলে, 'সে বড় কেলেঙ্কারির কথা। এ ছোঁড়া বড় বজ্জাত। আজ দুপুরে সোনামাসীর ঘরে ঢুকে—'

আজ দুপুরে সোনামাসী তাগাদায় বার হয়েছিল, টেঁপি ঘরে ছিল একা। নরেশ নাকি তখন ঘরে ঢুকে কেলেঙ্কারি করেছে। কৃষ্ণেন্দু তাকে এই অপরাধে মেরেছে।

'কখন মারলেন?' 'কোথায়?' 'কে কে ছিল?' 'কেষ্টবাবু কই?' চারিদিক থেকে প্রশ্ন আসে একঝাঁক। পাগলার সঙ্গী বলে, 'সোনামাসী দুজনকে নিয়ে নালিশ করতে গিয়েছিল কেষ্টবাবুর বাড়ী। কেষ্টবাবু এই খানিক আগে বাড়ী ফিরলেন। টেঁপিকে সব শুধোলেন, তারপর পিটিয়ে দিলেন নরেশকে।' সে থামতেই আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন ওঠে।

জেরায় বিব্রত পাগলার সঙ্গী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'আমি আর কিছু জানিনে বাবু, পাগলাকে শুধোও।'

পাগলাও আর কিছু জানে না। সকলে হতাশভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এরকম কেলেঙ্কারী সংসারে অনেক ঘটে, শোনামাত্র টের পাওয়া যায় কি ঘটেছে। এ ব্যাপারের মাথামুণ্ড কিছুই যে বোঝা গেল না। কৃষ্ণেন্দু মেরে আধমরা করে দেয় এমন একটা কাণ্ড করল নরেশ দুপুরবেলা, আবার সন্ধ্যার

সময় সোনামাসী মেয়েকে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নালিশ করতে গেলে সে সঙ্গেও গেল। তাছাড়া, সোনামাসী ঘরে না থাক, বাড়ীতে আরও অনেক ভাড়াটে বাস করে, দুপুরবেলা একটা হৈ চৈ হয়ে থাকলে এতক্ষণ পাড়ার কারো তো সেটা অজানা থাকার কথা নয়। জগু আর সৈরভী ওবাড়ীর বাসিন্দা। জগু নয় কাজে গিয়েছিল, তার বৌ আর বোন এবং সৈরভী তো ঘরে থাকেনি সারাটা দুপুর যে বাড়ীতে এমন একটা কাণ্ড ঘটল তবু ওরা কিছু টের পেল না, গান শুনতে এসেই সবিস্তারে গল্প করল না ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফোঁড়ন দিয়ে? সকলে এদের প্রশ্ন করে, এরা হতভম্বের মত বলে যে কিছুই তারা জানে না। শুধু সৈরভীর কাছে শোনা যায়, নরেশকে সে দুপুরবেলা বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল। তা, ও ছোঁড়া তো আজকাল যখন তখন ও বাড়ীতে যায়, সোনামাসী বেশ খাতির করে ওকে।

'ও মাগীর পেটে পেটে প্যাঁচ, ভগবান জানে কি মতলব করেছে। সাতবচ্ছর এক বাড়ীতে রইছি, চার গণ্ডা পয়সা চাইলে একটি পয়সা সুদ নেয়, ও মাগী পারে না কি!'

দুর্গা ইতিমধ্যে জল এনে নরেশকে কুলকুচো করিয়েছে, মুখ ধুইয়ে ঘাড়ে মাথায় জল থাপড়ে দিয়ে পাখা হাতে বাতাস করছে। কানে তার যাচ্ছে সব কথাই কিন্তু স্বাওরের শুশ্রূষা ছাড়া সব বিষয়ে সে যেন উদাসীন, কারো দিকে তাকাবারও সময় নেই। সুরেশ এতক্ষণ গুম্ খেয়ে ছিল, মুখ না ফিরিয়ে থেকে থেকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ভাই-এর দিকে। কৃষ্ণেন্দু এমন মার মেরেছে যে দু'টো চড়চাপড় দেবারও তার উপায় নেই, এই আপশোষ গুমরে উঠছিল তার মনে। হঠাৎ তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে সে বার করে নিয়ে আসে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, নরেশের সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে, 'এই শুয়োর হারামজাদা! বল কি

করেছিস? সব্বায়ের সামনে বল—কেষ্টবাবু রেয়াৎ করেছে, আমি তোকে খুন করব।'

দুর্গা ফোঁস করে ওঠে, 'না জেনে না শুনে তোমার অত চোটপাট কিসের গো? নিজে কত সাধু! খুন করবে! ভাইকে যে খুন করেছে তাকে খুন করবে যাওনা, বুঝি কেমন মরদ?'

একজন লাঠি ছিনিয়ে নেয়, দু'তিন জন সুরেশকে টেনে নিয়ে যায় দূরে। দুর্গা তখনও চেঁচাচ্ছে: ইবার আসুক তোমার কেষ্টবাবু, একবারটি পা দিক উঠোনে, গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দোব। জজ ম্যাজিষ্টর! মেয়্যা করবে ছেনালি, সবটুকু দোষ চাপবে ছ্যোলর ঘাড়ে। দারোগাবাবু! জজ ম্যাজিষ্টর!...

গজ্ গজ্ করতে করতে ছাওরকে ধরে তুলে দুর্গা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। রম্ভা সকলকে শুনিয়ে বলে, 'তা আমিও বলি, অত কথায় কাজ কি তোমাদের! যা শুনবার সব শুনবে আজ নয় তো কাল, চাপা তো রইবে না কিছু, চুপ মেরে যাওনা সবাই এখন?'

চুপ অবশ্য কেউ করে না, সেটা অসম্ভব। রামপাল আবার গান আরম্ভ করে, কিন্তু গান আর জমে না। রামপাল নিজে কিছুক্ষণের মধ্যে মসগুল হয়ে যায় এবং তারি মত ভাববিলাসী কয়েকজন মেয়েপুরুষ মন দিয়ে তার গান শোনে, অন্য সকলে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যায়। থেকে থেকে এখানে ওখানে চাপা হাসি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কৌতূহল চাপতে না পেরে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্গার ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেয়, কেউ একেবারে ভেতরে গিয়ে বিছানায় বসে, আত্মীয়তা জমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্গা তাদের আমল দেয় না। চুপি চুপি অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, কি হয়েছিল জেনে তোমার দরকার? বলে, বাইরে গিয়ে গান শোন না, ছেলেটা জিরোক?'

দুর্গা নিজেই কি জানে কি হয়েছে যে দশজনকে বলবে? জানবার জন্য তার নিজের মনটাই করছে ছটফট। নিরিবিলি যে দুটো কথা কইবে ছাওরের সঙ্গে তারও কি উপায় আছে ছাই! মেজাজ তার ক্রমেই চড়ছিল। পাঁচসাত জনকে বিদেয় করার পর কান্তপিসী ঘরে আসতেই তাকে ঠেলে বার করে সে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে খিল চড়িয়ে দিল। শুধু রম্ভা রইল ঘরে। দুর্গার ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। গেঞ্জ ছেড়ে কাপড় বদলে নরেশ চৌকির শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল, এখন আর সে ধুঁকছে না, কিন্তু মাথাটা ঝুঁকিয়েই রেখেছে। হয়তো মায়ের জন্য নয়, লজ্জাতেই মাথা তুলতে পারছে না ছেলেটা। দুর্গা চৌকিতে উঠে সাগ্রহে তার কাছে এগিয়ে গেল। একবার সে তাকায় রম্ভার দিকে, চোখে চোখে দু'জনের কথা হয় আর রম্ভার মুখে ফুটে ওঠে মৃদু কৌতুকের হাসি।

তখন নীচু গলায় দুর্গা বলে নরেশকে, 'হলতো? কাণ্ড করলে তো দিনদুপুরে? কত করে বললাম, অত ব্যাকুল হোয়ো না গো ছোটকত্তা, টেঁপির সাথে বিয়ে তোমার ঘটিয়ে দেব। সবুর বুঝি সইল না?'—হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠেই দুর্গা মুখে আঁচল গুঁজে দেয়। তার আর জিজ্ঞাসা করা হয় না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, নিজের জিজ্ঞাসার ভূমিকাতেই কাবু হয়ে পড়ে নিজে।

রম্ভা বলে, 'হেসো না দিদি, এ হাসির কথা নয়। এ নিয়ে কাণ্ড হবে ঢের, সোনামাসী ছাড়বে নি, উঁহুঁ। শোন বলি নরেশ, খুলে বলো দিকি সবকথা, ঢেকোনি কিছু—ডর লাগছে আমার। সোনামাসী বুঝি হঠাৎ ঘরে ফিরে এল? কি বললে এসে?'

নরেশ মুখ তুলে তাকায়, কিছু বলে না। এখনো তার বিহ্বল ভাব কেটে যায়নি। চোখ দুটি তার অল্প লাল হয়ে উঠেছে। দুর্গা আর

রম্ভার কৌতূহল সে মেটায় না, একটি কথাও তার কাছ থেকে আদায়' করা যায় না। পালা করে দু'জনে জেরা করে, তোষামোদ করে, ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করে অনেকক্ষণ, নরেশ কিন্তু মুখ খোলে না কিছুতেই, কোণঠাসা প্রহৃত অবোধ শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিতে শুধু তাকাতে থাকে একবার দুর্গা একবার রম্ভার মুখের দিকে।

ঘরের চালা থেকে দেয়াল বেয়ে জ্যোৎস্না উঠানে নামতে নামতেই আজ গানের আসরে ভাঙ্গন ধরল। একজন দু'জন করে উঠে যেতে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসর একরকম হয়ে গেল খালি। মেয়েদের মধ্যে শুধু রইল রাণী, পুষ্প আর জগদম্বা এবং পুরুষদের মধ্যে রইল শরৎ, বিন্দে, ফেলনা আর গোপাল। রামপাল গেয়েই চলেছে। গোড়ায় বেশী লোক উপস্থিত না থাকলে রামপাল নিরুৎসাহ বোধ করে, কিছুক্ষণ গান গাইবার পর আসর আস্ত কি ভাঙ্গা এটা তার খেয়ালও থাকে না। অঙ্গন যদি এখন জনহীন অরণ্য হয়ে যায় তবু সে আপন মনে গেয়ে চলবে।

কিন্তু গানে আবার বাধা পড়ল। হঠাৎ গান বাজনা সব বন্ধ হয়ে যেতে সকলে তাকিয়ে ত্মাখে, কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে।

এ বাড়ীতে এবং এ পাড়ার অনেক বাড়ীতে মাঝে মাঝে বিনা খবরে হাজির হওয়া তার নতুন নয়। অন্যদিন কেউ ব্যস্ত বা বিস্মিত হত না। আজ তাকে দেখেই আকস্মিক উত্তেজনা অনুভব করে সকলে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল আর সেই সঙ্গে বোধ করতে লাগল অস্বস্তি। দোষ করুক আর যাই করুক, এ বাড়ীর একটি ছেলেকে সে অমানুষিক প্রহার করেছে, এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি।

রম্ভা মোড়া এনে দিল। বসে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'নরেশ মরেনি তো রম্ভা?'

রম্ভা বলল, 'না।'

কৃষ্ণেন্দু উঠানে পা দিলেই দুর্গা তাকে গাল দেবে বলেছিল। মনে হয়েছিল, ছ'মাস এক বছর পরেও যদি কৃষ্ণেন্দু আসে, মনে সে রাগ পুষে রাখবে, গাল না দিয়ে ছাড়বে না। দু'ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু হাজির হল, দুর্গার কিন্তু সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অন্যদিন খাতির করতে এগিয়ে আসে, একটু ব্যস্ত হয়, আজ দাওয়ায় কাঠ হয়ে বসে রইল—এইমাত্র।

নরেশ আর টেঁপির ব্যাপারটা জানা গেল কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

সুরেশকে সম্বোধন করে সে বলল, 'ভাইটিকে তো তোমার মারলাম আচ্ছা করে সুরেশ, ভাবলাম, মেরেছি বেশ করেছি, তোমায় একবার বলে যাওয়া উচিত।'

ব্যাপারটা বিশ্রী, তবে এতক্ষণ সকলে যা অনুমান করছিল সেরকম কিছু নয়। সোনামাসীর জমানো টাকা আর সোনামাসীর মেয়েকে নিয়ে নরেশ পালিয়ে যাবার আয়োজন করেছিল। শুধু টেঁপিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব থাকলে হয়তো বাধা পড়ত না, টেঁপি চুপি চুপি বেরিয়ে আসত আর দু'জনে চলে যেত যেদিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু টাকা তো চাই। সন্ধ্যা থেকে সোনামাসী ঘর আগলে বসে থাকে, আদায়ে বার হয় শুধু দিনের বেলা। বাড়ীতেও লোক থাকে অনেক। দুপুর বেলা শুধু যে যার ঘরে ঘুমোয়। তাই আজ দুপুরে সোনামাসী তাগিদে বেরিয়ে যাওয়ার পর নরেশ গিয়ে সোনামাসীর টিনের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে, চৌকির নীচে গর্ত্ত খুঁড়েছে, টেঁপির কাছে জেনে নিয়ে আরও যেখানে যেখানে টাকা লুকানো ছিল, সব খুঁজে বার করেছে। জগুর বৌ কি করতে তার ঘরের বাইরে এসেছিল, সে ঘরে ফিরে গেলেই দু'জনে বেরিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ সোনামাসী এসে হাজির। বিকেল পর্য্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে সোনামাসী নরেশকে আটকে রেখেছে, একটু একটু করে জেনে নিয়েছে

সব কথা, তারপর ঘরে তালা দিয়ে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে গিয়েছে নালিশ করতে। পথে নরেশ একবার পালাবার উপক্রম করেছিল, সোনামাসী তাকে শাসিয়েছে, পালাস্ যদি তো পুলিশ ডাকব। কৃষ্ণেন্দুর বাড়ী গিয়ে দু'জনকে আগলে ঠায় বসে থেকেছে তার বাড়ী ফিরবার অপেক্ষায়।

'ছোঁড়াকে মারতাম না পরেশ। চোর তো নয়, জবরদস্তিও করেনি মেয়েটার ওপর। ভাবলাম দুজনের মধ্যে যখন এই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, দু'জনের বিয়ে দিলে মন্দ হবে না। সোনামাসীও রাজী হল। আমি সেই কথা বুঝিয়ে বলতে গেলাম ওকে যে এসব কুবুদ্ধি করে হাঙ্গামা বাধাস নে, এই মাসে তোদের বিয়ে দোব। তা উনি কি জবাব দিলেন শুনবে? যে মেয়ে বেরিয়ে যায় তাকে উনি বিয়ে করবেন না, ও নষ্ট মেয়ে।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। খানিক পরে উঠানের এক প্রান্ত থেকে প্রশ্ন আসে, 'এটা কি আপনার উচিত হলগো কেষ্টবাবু?'

কানাই-এর বৌ লক্ষ্মী কখন ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার ধাপে বসেছে কেউ লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্মী কখনো গানের আসরে আসে-না, গল্প করতেও নয়। হয় ঘরে কাজ করে, নয় তফাতে ওই ধাপে চুপ করে বসে থাকে।

'কেন রোগা বৌ?'

'সব যে জানাজানি করে দিলেন, কলঙ্ক রটল না মেয়েটার?'

কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। এক মুহূর্তের জন্য তাকে বড়ই বিপন্ন মনে হল। তারপর গলা সাফ করে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'কলঙ্ক রটাই ভাল রোগা বৌ।'

'ওমা, ইকি কথা বলেন কেষ্টবাবু!'

'মেয়েটা কম পাজী নয় রোগা বৌ। পীরিত করেছে, পালিয়ে

যেত, সে ভিন্ন কথা। মার টাকাগুলি বাগিয়ে পালাচ্ছিল কি বলে, এত আদর যত্নে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে মা? নরেশকে আমি মারলাম, মেয়েটারও তো সাজা হওয়া উচিত।'

'সাজা হল সোনামাসীর।'

'তাও হওয়া উচিত। মেয়েকে অমন আল্লাদী করল কেন? তাছাড়া কি জান রোগা বৌ, সোনামাসীর সয়তানী বুদ্ধি কম নয়। বিয়ে হলে পণের টাকা পাবে বেশী, মেয়েটা থাকবে কাছাকাছি, তাই না মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল।'

লক্ষ্মী আর কিছু বলল না। তার মুখে শুধু ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি, অল্প আলোয় যা কারো চোখে পড়ল না।

যাওয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু রম্ভাকে জিজ্ঞেস করে, 'শরীর ভাল নেই?'

রম্ভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ও! মন ভাল নেই তবে। কষ্ট হচ্ছে বাপের বাড়ীর জন্যে?'

রম্ভার চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা। লক্ষ্য করে কৃষ্ণেন্দু নড়েচড়ে বসে। ভাল করে তাকায় রম্ভার দিকে। খানিক ভেবে বলে, 'চলো তোমার ঘরে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'আমরা ভাইবোন দুটো ঘরোয়া কথা বলব। কেউ যেন এসো না।'

খোলা দরজার কাছেই কৃষ্ণেন্দু বসে। সবাই যাতে তাকে দেখতে পায়। এটা সাধারণ দরকারী সতর্কতা। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক এখানকার জগতে বড় ঠুনকো। যতই তাকে শ্রদ্ধা করুক সবাই, অন্তরালে যুবতী মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি করলে অন্ততঃ দু'চারটা মনে খটকা লাগবেই। কিছু বলবে না কেউ, বাতিলও করবে না তাকে। ধর্ম্মের বিকারে সংস্কার জন্মেছে একটা। গুরু মোহন্ত সাধু মহাপুরুষ খেলাচ্ছলে মেয়ে বৌকে সম্ভোগ করলে সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেয়া

যায়। গোপাল ভাঁড়ের সে গল্প তো আকাশ থেকে মাগনা নামে নিয়ে গুরু এসে গেরস্ত বাড়ীর বৌয়ের কানে মন্ত্র দেয়—তুমি রাধা আমি শ্যাম। বিশেষ ভক্তিভাজনদের সম্পর্কে যৌন ঈর্ষা নির্জ্জীব। তবু, মিছামিছি দু'চারটা মনেও খটকা বাধিয়ে লাভ কি?

'কি হয়েছে রম্ভা?' জানবার জোরালো সস্নেহ দাবীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খুলে বল। স্পষ্ট করে বল। তুমি দশটা মেয়ের মত নও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দশবার দশরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে হলে মনে দুঃখ পাব। ভাবব, তোমায় যা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। বলো কি হয়েছে।'

'কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমার?'

'সে কি?'

'আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমারি ভুল হয়েছিল।'

'দোষ দাও বা না দাও তোমার খুসী। ভুলটা কিসের?'

এই সেদিন কোমরে আঁচল জড়িয়ে পিছনে ঘাড় বাঁকিয়ে রম্ভা গায়ে পড়ে কলহ করেছিল তার সঙ্গে, আজ সে মাথা নীচু করে আঁচলের প্রান্ত জড়ায় আঙুলে। কত শঙ্কার কাঁটা যে ফোটে কৃষ্ণেন্দুর বুকে।

রম্ভা ধীরে ধীরে বলে, 'খালি গাইয়ে বাজিয়ে আল্‌সে লোক তা জানতাম না। দেশের কাজে অ্যাতটুকু ঝোঁক নেই। আপনি যেমন খাঁটি লোক খোঁজেন, ও তেমনি বলে ঝগড়া করেছিলাম না আপনার সঙ্গে? ও ঠিক তার উল্টো। দশজনকে দিয়ে কিছু করাবে দূরে থাক, নিজে কখনো কিছু করবে না। আপনি সভা করলেন সেদিন খালপারে, কত বললাম নিয়ে যেতে। বললে পিত্যয় যাবেন? হেসে উড়িয়ে দিলে, ও সভাটভা নাকি সব বাজে হাঙ্গামার ব্যাপার। সিদ্ধি খেয়ে হৈ চৈ করলে দুগ্‌গাদির সোয়ামীর সাথে।'

আরও নানা কথা বলে রম্ভা, বক্তব্য তার ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়,

কৃষ্ণেন্দু যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। কৃষ্ণেন্দু বিস্ময়ের সঙ্গে শোনে। শুধু আদর্শ নয়, এতখানি জোরালো স্বভাবগত আদর্শনিষ্ঠা সে যেন রম্ভার মধ্যে প্রত্যাশা করে নি, তাকে আর দশটি মেয়ের মত মনে না করা সত্ত্বেও।

কে যেন কাঁদছে পাশের বাড়ীতে, রোগে ভুগে কে বুঝি মরেছে তার জন্য। খাঁকারি দিয়ে গলা শানিয়ে কে গালাগালি দিচ্ছে। খানিক তফাতে বিশৃঙ্খল কোলাহল। আশে পাশে উচ্চকণ্ঠ, শিশুর কান্না। বেসুরা বাঁশের বাঁশী আর হারমোনিয়মের আওয়াজ ছাপানো ঘুঙুরের আওয়াজ। বুড়ো সাতকড়ি কাসছে ওপাশের বাড়ীতে।

'তুমি ভুল করছ রম্ভা। ছি। স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর।' ইচ্ছে করে কৃষ্ণেন্দু গলার আওয়াজ অতিরিক্ত কড়া করে। রম্ভা মুখ তুলে চোখ মেলে সোজা তাকায়।

'রামপাল খাঁটি চিজ। সব মাল মশলা আছে ওর মধ্যে। শুধু ঠিকমত গড়েপিটে ওঠে নি। সবাই তো সুযোগ পায় না। ওকে তুমি হাল্কা ভাবছ, মোটেই তা নয়। মনের মোড়টা ওর ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। ওকে যদি তৈরী করে নেওয়া যায় রম্ভা—' কৃষ্ণেন্দুকে উত্তেজিত, উদ্দীপ্ত মনে হয়, '—জাগিয়ে দেওয়া যায় ওকে, ওর তুলনা থাকবে না। তাই তো ভাবছিলাম আমি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হল, তুমি ওর চেতনা এনে দেবে। একটা দুটো তিনটে বছর বাদে ওর মধ্যে আমি একজন আদর্শ কর্ম্মী পাব। তুমি এর মধ্যে হাল ছেড়ে হতাশ হয়ে বসে আছ?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যায়, রামপাল লাউ-চিংড়ি দিয়ে ভাত খায়, নিজে খেয়ে দুর্গাকে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে রাখতে সাহায্য করে রম্ভা ঘরে যায়, পান সেজে নিজে খেয়ে রামপালের মুখে একটা গুঁজে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'কি সুন্দর তুমি গাইতে পার!'

তাই বটে, তাই বটে। রম্ভার দেহ মন সায় দেয়, তাই বটে, তাই বটে। এ খাঁটি মানুষ। সে যে অনেক বড় বড় কাজের কথা ভাবে, এই মানুষটাকে কাজের মানুষে পরিণত করানোর চেয়ে বড় কাজ তার কি থাকতে পারে ?

মাঝখানে কিছুদিনের ব্যবধানের পর রামপালের আলিঙ্গনে আবার তার রোমাঞ্চ হয়। রম্ভা তাকে অনেক দিন পরে আগের মত জোরে বুকে চেপে ধরেছে অনুভব করে রামপালের সুস্থ সবল দেহ উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'ও রম্ভা, ও বৌ। ঝুমুরিয়া নিয়ে যাব তোকে। দু'চার দিনের মধ্যে নিয়ে যাব।'

'কেন গো মশায়, কেন ?'

'ঘুরে আসবি। মন খুসী করে আসবি। তোকে আমি খুসী করতে চাই বৌ।'

রম্ভা বলে, 'শোন। ঝুমুরিয়া যাব'খন ওমাসে। কাল যাও দিকিন একবার কেষ্টবাবুর কাছে। বলবে রম্ভা ডেকেছে আরেক দিন।'

এদিকে হীরেন বলে, 'না মমতা, তা হয় না। তোমার বন্ধুদের এনে আড্ডা দাও, পার্টি দাও, এখানে যাও, ওখানে যাও, তাতে কিছু আসে যায়না। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা ভদ্র অভদ্র কুলি মজুর তোমার কাছে যাতায়াত করবে, এ বাড়িতে তা কি চলে ?

'ওরাই তো আমার বন্ধু।'

'ওদের নিয়ে অন্য কোথাও মিটিং কর, ওদের বস্তিতে যাও, কোথাও একটা অপিস মত করে সেখানে দু'এক ঘণ্টা ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর, এসবে আমি তো আপত্তি করছি না। কিন্তু যতই হোক তুমি এ বাড়ীর বৌ। এ বাড়ীতে কি তোমার হৈ চৈ করা চলে ?'

ঐশ্বর্য্যের নিশীথ গুঞ্জন, নীরেনের বাঁশী, সোমনাথের সাধন সঙ্গীত, রঙীন ঘর, দামী আসবাব, বিস্ফুরিত আলো। মমতার পরনে শুধু সাদা মিলের শাড়ী, কানে শুধু ছোট দুটি দুল। মমতার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে ঠোঁট কামড়ে থাকে। দু'জনের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে ঘরের মধ্যে।

'তবে চলো আমরা অন্য বাড়ীতে যাই।' মমতা বলে।

'অন্য বাড়ীতে?'

'এ বাড়ীটা পচা, সেকেলে। চলো ভিন্ন একটা বাড়ীতে আমরা নিজের মনে স্বাধীনভাবে থাকবো।' হীরেনের গলা জড়িয়ে মমতা আলগোছে তার কপালে চুমু খায়, 'আমাকে গড়ে তুলতে হবে তো তোমায়? অনেক বড়লোকী চাল ভোলাতে হবে তোমায়। তোমায় আমি বিপ্লবী করে ছাড়ব।' হীরেনের গালে গাল ঠেকিয়ে রেখে সে যোগ দেয়, 'ছাখো, বলেছিলাম পাঁচ বছর বন্ধ রাখবো—তোমার কথায় রাজী হলাম তো একটা ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত, যখনি হোক? তুমিও আমার কথা রাখো। ভিন্ন একটা বাড়ী নাও। এখানে আমার দম আটকে আসছে। কত কি করব ভেবে রেখেছি, এখানে থাকলে কিছুই হবে না এমন করে সবাই এখানে তাকায় আমার দিকে।'

মমতার নিবিড় স্পর্শে কোটি বসন্তের উন্মাদনা ঘনিয়ে আসে, সব তুচ্ছ হয়ে যায় জগতে। কত দীর্ঘ সাধনার পর, কত বিষণ্ণ দিন ও বিনিদ্র রজনী যাপনের পর মমতাকে সে লাভ করেছে! তা ছাড়া, বড় অশান্তিও সৃষ্টি হয়েছে বাড়ীতে নতুন বৌয়ের চালচলন নিয়ে।

অন্তঃপুরের অলস-বিলাসী মেয়েলি জীবনের মৃদু শান্ত ছন্দ সে মেনে নেবে কেউ তা আশা করে নি, কলেজে পড়া একেলে চপল মেয়ে হিসেবেই তাকে মেনে নিতে সকলে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু একি মেয়েরে বাবা! বাড়ীর কারো সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইবার তার সময় হয়

না, অথচ বাইরের আজে বাজে লোকের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার অন্ত নেই, যত ভবঘুরে বয়াটে ছোঁড়া আর কুলি মজুরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা! যখন ইচ্ছা বেরিয়ে যাচ্ছে, একা কিম্বা যার তার সঙ্গে, যখন ইচ্ছা ফিরে আসছে, রাত যে কত হয়েছে গ্রাহ্যও নেই। আর যদিই বা দুটো কথা বলে কারো সঙ্গে, কি সে কথা বলার ঢং! যেন কোথাকার মহারাণী এসেছেন চাষাভূষোর ঘরে দয়া করে বেড়াতে!

লোকনাথের মুখ অন্ধকার, আত্মীয় কুটুম্বের মুখ বাঁকা, ছোটদের মুখ বিষণ্ণ, দাসদাসীর মুখ সয়তানি কৌতুকে উজ্জ্বল। চারিদিকে অবিরাম গুজগুজানি ফিসফিসানি ও ক্রুদ্ধ তীব্র মন্তব্য—হীরেন জানে সমস্তই মমতার সমালোচনা।

সে তাই একটা বাড়ীভাড়া নেয় পার্ক ষ্ট্রীটে। লোকনাথ তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন।

কোনো মধ্যবিত্ত পাড়ায় অল্প টাকায় সাধারণ একটি ছোটখাট বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ভাড়া নেবার ইচ্ছা ছিল মমতার। কিন্তু এ আব্দার শুনে এমন করে তাকিয়েছিল হীরেন, যেন বলতে চাইছে, তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ভিন্ন হলাম, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও? ছোট বাড়ীতে গরীবের মতো থাকবার সাধটা মমতা তাই চেপে যায়।

সব বিষয়ে মমতার বাড়াবাড়ির জন্য একটু যা জর্জ্জরিত থাকে হীরেন, নতুবা সে পরম সুখেই দিন কাটায় নতুন বাড়ীতে।

মমতার কাছ থেকে অযাচিতভাবে একটু স্নেহভরা সেবা যত্ন পাবার জন্য তার মনের গহনে সে লালায়িত হয়ে থাকে,—যে সেবা যত্নের স্বাদ পেয়েছিল মায়ের কাছে, তার বাড়ির মেয়েরা যা আজো স্বামী পুত্রকে দিচ্ছে, দিগম্বরী যার নমুনা দেখিয়েছে চমকপ্রদ। কান গরম হয়ে ওঠে হীরেনের। স্ত্রীকে দাসীভাবে পেতে সাধ যায়, একি অসভ্য

অসংস্কৃত মন তার, ওরকম দশ বিশটা মেয়েকে সে তো তবে বিয়ে করতে পারত, মমতাকে বিয়ে করার তবে তার কি দরকার ছিল? এত ভালবাসে মমতা তাকে, তাতেও তার মন ওঠে না? মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আসার অহঙ্কারকে তুষ্ট করতে হীরেন সব বিষয়ে মমতাকে স্বাধীনতা দেয়, তার কোনো কাজের সমালোচনা করে না। স্ত্রী তার সাথী, তার বন্ধু।

মমতার সঙ্গে একা থাকার সময় ছাড়া নিজেকে তার সাথীহীন বন্ধুহীন একাকী মনে হয়, পরিত্যক্ত মনে হয়। মমতা ও তার মেয়ে-পুরুষ বন্ধুদের মধ্যেই যেন তার এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি চরমে উঠে যায়। নিজেকে মনে হয় অন্য এক জগতের মানুষ। অথচ দূরে সরে থাকবার উপায় তার নেই। মমতা চায় সে তার পরিচিত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করুক, নবযুগের এত যে নতুন চিন্তাধারা সে সঞ্চয় করেছে বই থেকে, বাস্তব উপলব্ধিতে সার্থক হোক সে-সব।

মমতা বলে, 'তোমার মুখ ভাব কেন?'

হীরেন বলে, 'কই না? শরীরটা ভাল নেই।'

মমতার মুখের ভাব পরিবর্তন এক মুহূর্তে হীরেনকে কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ, উল্লসিত করে দেয়। এবং হৃদয় মন হঠাৎ জুড়িয়ে যাওয়ায় সে ভাল করে টের পায় হৃদয় মন তার কেমন জ্বালায় জ্বলছিল!

'শরীব খারাপ? কি হয়েছে? আমায় বলো নি কেন আগে?' মমতা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে। বলে, 'তোমার আজ বেরিয়ে কাজ নেই, আমি কোথাও যাব না।' সব এনগেজমেণ্ট বাতিল করে, যে আসুক তাকেই সে বাড়ী নেই বলে দেবার জন্য দরোয়ানকে হুকুম দিয়ে, মমতা নিজে সঙ্গে থেকে হীরেনকে বিশ্রাম করায়।

মমতার রূপ ও আকর্ষণ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে মনে হয় হীরেনের। প্রেমের নদীতে জোয়ার এসেছে ভাঁটার পর কলোচ্ছ্বাসে। সম্ভ্রা

ছিটের ব্লাউজ ঢাকা ও দুটি স্তনের দাম কি কোটি টাকা? এ মক্ষি কোমর কোথায় পেল সে? মোটা মিলের রঙিন শাড়িতে সে কি ইচ্ছে করে ঢেকে রাখে নিজের কোমর থেকে পা তক্, কামনায় যাতে পুড়ে না যায় তার প্রিয়তম?

দীর্ঘনিশ্বাসে যেন হৃদপিণ্ডটা বেরিয়ে আসে হীরেনের। শরীর ভাল নেই, তার শরীর ভাল নেই! ভাল না থাকা শরীরটা এখন যদি চায় মমতার শরীরটাকে, কি ভাল্গার না জানি তাকে ভাববে মমতা!

এর চেয়ে মরণ ভাল নয় কি? অথবা লাথি মেরে চুরমার করে ফেলা এই নিষ্ঠুর রূপসীকে?

সাদা আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালিয়ে মোটা মিলের রঙীন শাড়ি আর ছিটের ব্লাউজ খুলে সিল্কের সূক্ষ্ম রাত্রিবাস গায়ে চাপিয়ে বিছানায় এসে অভিমানের ভানে মমতা বলে, 'নিজেকে কেন এত চেপে রাখ বলত? চোখ দেখে টের পাই না আমি? বড্ড ছেলেমানুষ তুমি। হ্যাভলক এলিসের ক'খানা বই তোমার জন্য কিনে আনব।'

'শরীরটা ভাল নেই।'

'ও!'

শরৎ শেষের স্নিগ্ধতা তপ্ত সহরের নিশ্বাস শুষছে। কুয়াসায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াটে, তার বেশির ভাগ খাঁটি ধোঁয়া, কয়লা খনির কয়লার ধোঁয়া, সেখানে মেয়ে-মজুর পুরুষের সঙ্গে কয়লা কাটতে কাটতে কয়লা-কালো ছেলে বিইয়ে ফেলে। আরিফ এলো একদিন সন্ধ্যার সময় মমতার বাড়ীতে, সঙ্গে তার পুলিশের লোক।

সিঁড়ির নীচের হলে দাঁড়ালো তারা মুখোমুখি।

মমতা বলল, 'আরিফ! কি হয়েছে আরিফ?

আরিফ বলল, 'যাচ্ছি মমতা।'

'যাচ্ছ? যাচ্ছ মানে?'

'জেলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'দেশের লোককে জাগতে বলে পরপর কটা লেকচার দিয়েছি বলে বোধ হয়। ঠিক জানিনে। বিচার-টিচার হবে না। উনি খুব ভদ্রলোক—ওই যে উনি, যিনি আমায় নিতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব বলামাত্র রাজী হলেন। ছাখো, হাতকড়া পর্য্যন্ত পরান নি। অতদূরে দাঁড়িয়ে আমার ওপর শুধু চোখের নজর রেখেছেন। আমি ভেতরে ঢুকে খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেলে বেচারী কি বিপদেই পড়বেন। কিন্তু উনি নাকি আমাদের বিশ্বাস করেন। নিজেই বললেন, আমরা যদি কথা দি, মরে গেলেও নাকি সে কথা রাখি। রীতিমতো যেন শ্রদ্ধা করেন আমাদের!—কেমন আছো?

'আরিফ!'

দুহাতে আরিফকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেয়ে মমতা বলে, 'আরিফ! আমায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। আমায় চুমু খাও।'

মমতা জানত, হীরেন বাড়ী আছে। হীরেন যে তার পিছু পিছু নেমে আসবে, তাও সে জানত। কিন্তু আদর্শবাদী মেয়ে বলে জানতো না, কিসে কি হয়।

সিঁড়ির মাথায় হীরেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নামবার জন্ত উঁচু করা পাটিকে উঁচু করে রেখেই। তাকিয়ে ছাখে মমতার আলিঙ্গন ও চুম্বন, আরিফের নাম ধরে তার আবেগভরা ব্যাকুল ডাক শোনে। হঠাৎ কি করে বসবে এই ভয়ে দিশেহারা হয়ে তারপর সে ঘরে চলে যায়। ইজি-চেয়ারে তাকে চিৎ হয়ে পড়তে হয়। বুঝতে পারে, তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। বিরাট একটা এলোপাথারি আন্দোলন তাকে গ্রাস করেছে সম্পূর্ণরূপে, তার রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় প্রমত্ত অস্থিরতা অথচ কি যেন

একটা স্তব্ধ হয়ে গেছে ভেতরে, মরে গেছে। উঠে গিয়ে একেবারে গোটা চারেক এ্যাসপিরিন গিলে হীরেন আবার ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেয়। বন্যতা, গুণ্ডামি চলবে না। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। অ্যাসপিরিন খেয়ে হোক, শিরা কেটে রক্ত বার করে হোক, ভদ্র তাকে থাকতেই হবে।

চোখের জলে ঝাপ্‌সা চোখ নিয়ে মমতা ঘরে আসে, ধপ করে বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

'আরিফ এসেছিল।'

'জানি।'

'একবার গেলে না নীচে? ওকে অ্যারেষ্ট করেছে।'

'অ্যারেষ্ট করেছে? ও!' সন্ধ্যার সময় প্রকাশ্য হল ঘরে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে মমতার ওরকম আচরণের মানেটা হীরেন বুঝতে পারছিল না। এতবড় বাড়ী, এতগুলি নির্জ্জন ঘর, আরিফকে কোন ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেই হত। এবার সে বুঝতে পারে, আত্মহারা হয়ে মমতা সতর্কতা ভুলে গিয়েছিল। এখানকার প্রায় অসহনীয় মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এক সিনিক ফাজিল বন্ধুর বিশেষ প্রিয় একটি তামাসার কথা হীরেনের মনে পড়ে যায়; সিফিলিস আর প্রেম গোপন থাকে না। একদিন হাসি পেত কথাটা শুনে। আজ শব্দগুলি যেন ভারি ধারালো শাবল হয়ে মনের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়ায়, খুঁড়ে ফেলতে থাকে তার মন।

'এমন খারাপ হয়ে গেছে মনটা। কান্না পাচ্ছে সত্যি।'

হীরেন কথা বলে না। এবার সচেতন হয়ে ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার?'

'মাথা ধরেছে।'

'অ্যাসপিরিন খাবে?'

'খেয়েছি।'

মমতা ব্যথিত ক্লিষ্ট চোখে খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে। মৃদুস্বরে বলে, 'আরিফকে তুমি পছন্দ কর না।'

'সেটা কি আমার অপরাধ? তোমার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে ভাব, ভালবাসা। আমার সঙ্গে দুদিনের পরিচয়।'

'আমার সঙ্গেও তো তাই, আমায় পছন্দ হল কি করে তোমার?'

'তোমার কথা ভিন্ন।'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মমতা উঠে এসে আলগোছে ইজি-চেয়ারের হাতায় বসে হীরেনের একটি হাত দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, 'তা নয়। আরিফকে পছন্দ কর না কেন বলব? ওর সম্বন্ধে তোমার ভীষণ জেলাসি ছিল।'

কথায় ব্যবহারে কি করে এত সহজ, এত অন্তরঙ্গভাব বজায় রেখে চলেছে মমতা? আরিফের বুক থেকে খসে তার কাছে এসে আপন হওয়া কি এতই পুরাণো আর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে মমতার? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? এতকাল প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে যাবার পথে আরিফ তো তার সঙ্গে দেখা করে যেতে আসেনি। আপনি আরিফের জন্য বেদনায় কাবু হয়ে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য স্বামীকে পরিহার করে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল মমতার পক্ষে, আরিফের জন্য বুকভরা দুঃখ নিয়ে তার কাছে এসে প্রতিদিনের মত তার আপন সে হচ্ছে কি করে? হীরেন অনুভব করে, মমতা তার সহানুভূতি চায়। আরিফের জন্য মনে সে ব্যথা পেয়েছে, তাই স্বামীর কাছে সমবেদনা আশা করছে, সান্ত্বনা খুঁজছে! মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে হীরেনের। একেবারে চারটে অ্যাসপিরিণ খাওয়ার জন্য কিনা কে জানে!

হাত ছাড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একটু ঘুমে আসি।'

জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে আবার বলে, 'ঘুরে আসি একটু।'

'আমিও যাব চলো। বড় বিশ্রী লাগছে।'

'না, না। একটা দরকার আছে আমার।'

প্রায় আর্ত্তনাদের মত শোনায় হীরেনের কথা। প্রায় সে ছিটকে পালিয়ে যায় ঘর থেকে।

শুধু ঘর থেকে নয়, মমতার নাগালের সীমা থেকেও যেন চিরদিনের জন্য। মমতাকে ঘিরে উপগ্রহের মত পাক খাওয়াই ছিল যেন তার জীবনের গতি, মাধ্যাকর্ষণের মত অদৃশ্য বাঁধনটা ছিঁড়ে যাওয়ায় ছিটকে সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। কোথায় সে থাকে কি সে করে মমতা জানতে পারে না। কথা সে কয় ভাসা ভাসা, অল্প দু'চারটে কথা। কাজ করার ছুতোয় কাজের ঘরে ঢোকে বাড়ী ফিরে, রাত বারটা একটায় খোঁজ নিতে গিয়ে মমতা ত্যাখে সেই ঘরেই বাড়তি বিছানাটিতে সে ঘুমিয়ে আছে। মাথা ঘুরে যায় মমতার। তার সঙ্গ পাবার জন্য কাজ যার চুলোয় গিয়েছিল, গভীর রাত্রে ঘুম পেলে যে তার কাছে ছেলেমানুষের মত নালিশ জানাত মানুষের ঘুম পাওয়ার বিরুদ্ধে, তাকে ছাড়াই তার দিবারাত্র কাটছে, ঘুম আসছে মমতাহীন শূন্য বিছানায়!

মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার? আমায় বলো। বলতে হবে আমাকে।'

'কি হবে? কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি? একি অন্যায় কথা। তুমি ভাব আমার ধৈর্য্যের সীমা নেই?' মমতার স্বর কড়া, ঝাঁঝালো।

'আমি তো কিছু করি নি তোমার? আমি নিজের মনে আছি।'

'হঠাৎ কেন তুমি নিজের মনে থাকবে? কারণ আছে নিশ্চয়। আমার জানবার অধিকার আছে কারণটা কি!'

ধৈর্য্যের সীমা আছে! কারণ জানবার অধিকার আছে! দিগম্বরীর কথা ভাবে হীরেন, শশাঙ্কের মত স্বামীকেও যে দেবতার মত পূজা করে। তার বাড়ীর বৌদের কথা ভাবে হীরেন, যাদের স্বামী-অন্ত প্রাণ। অঙ্গ স্পর্শ করতে দেওয়া দূরে থাক, প্রেমালু চোখে পরপুরুষ তাকালে পর্য্যন্ত যারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মমতার ম্লান বিবর্ণ মুখ আর সকাতর চোখে কঠিন আত্মনিষ্ঠার, অনমনীয় আত্মমর্য্যাদার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখে জ্বালাভরা উদ্ধত বেদনার সঙ্গে হীরেনের মনে হয়, সে যদি ওদের মত হত!

শেষে একদিন রাত এগারটার সময় হীরেন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কাজের ঘরে গিয়ে শূন্য বিছানায় শোয়ার বদলে শোয়ার ঘরে যায়। মমতা বলে, 'তুমি ড্রিঙ্ক করেছ!'

'করেছি।'

'কেন?'

'তোমার জন্য।'

'তার মানে?'

'মানেই তো বলতে এলাম। স্ত্রী যদি হতে না পারবে, আমার স্ত্রী হয়েছিলে কেন? আমি কি তোমার ক্রীতদাস?'

'হেঁয়ালি কোরো না। আজ ঘুমোও, যা বলবার কাল বোলো। এসো। শোবে এসো। ও আলোটা জ্বেলেছ কেন? নিভিয়ে দিয়ে এসো। আমি তোমায় ঘুমপাড়িয়ে দিচ্ছি।'

মমতার খোলা কাঁধ, আধ ঢাকা বুক, কোমরের বাঁকা ভাঁজ দেখে হীরেন চোখ বোজে। ভাবে, এত মদ খেয়েও একটু বেপরোয়া হবার সাহস তার হল না মমতার কাছে! নেশা তিতো হয়ে যায়, জীবন বিষাক্ত।

'এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না মমু। কাল আমরা ওবাড়ীতে চলে যাব। বাবাকে দুঃখ দিয়ে, সবার মনে কষ্ট দিয়ে—'

মমতা চুপ করে থাকে।

'এসব তোমায় ছাড়তে হবে মমু।'

'কোন সব?'

'এই যার তার সঙ্গে মেশা, যেখানে সেখানে যাওয়া। মমু, আমার চেয়ে এসব কি তোমার কাছে বড়, আমি তোমায় এত ভালবাসি?'

মমতা চুপ করে থাকে বিছানায়, মাতাল হীরেন চুপ করে থাকে চেয়ারে। হীরেন ভাবে, মমতা তাকে শুতে ডাকবে। মমতা ভাবে, হীরেন এসে তাকে বলবে, নেশার খেয়ালে কি বলেছি, আমায় মাপ কর।

পরদিন নেশা কেটে গেলে হীরেন কথা ফিরিয়ে নেবে, এ আশাও মমতার পূর্ণ হয় না। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ খেয়াল করা কথা তো সে বলে নি যে নেশার সঙ্গে কথাগুলিও উড়ে যাবে অর্থহীন বিকার গুঁড়োনো ধূলোর মত। ক'দিন ধরে মনের মধ্যে যে চিন্তা পাক খাচ্ছিল কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না হীরেন, মদের নেশা শুধু সেটা প্রকাশ করার প্রেরণা জুগিয়েছে তাকে।

মমতা তবু অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'সত্যি সত্যি তুমি আমায় ফেলে ওবাড়ী চলে যাবে?'

'তোমায় ফেলে কেন? তুমি যাবে না?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায়? তুমি যে বিধিনিষেধ জারি করেছ সে সব মানতে হলে আমায় পর্দ্দানশীন হয়ে থাকতে হবে ওখানে। সেটা কি তুমি সম্ভব মনে কর আমার পক্ষে? আমি অবাক হয়ে গেছি হীরেন, বুঝতে পারছিনা তুমি কি করে এমন হয়ে গেলে। মনে হয় তামাসা করছ। কিন্তু তোমার মুখ দেখলে টের পাই ভেতরে সত্যি যন্ত্রণা ভোগ করছ তুমি। তারপর কাল ড্রিঙ্ক করে এলে। কেন?

এমন তো নয় যে আমায় তুমি জানতে না চিনতে না। আমি তো বদলাই নি, যেমন ছিলাম তেমন আছি। আমি কি ভাবি, কি করি, কি চাই সব জেনে শুনেই আমায় বিয়ে করেছিলে। আজ তোমার মতিগতি বদলে গেল কেন হঠাৎ?' মমতার ঠোঁটের দুটি প্রান্ত কাঁপতে থাকে। সে-ই না ভেবেছিল হীরেনের মতিগতি বদলে দেবে—অন্যদিকে? তার যেটুকু রক্ষণশীলতা আছে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলবে, বৈপ্লবিক অভিসন্ধি সঞ্চার করবে তার চিন্তার উৎসে, কত কাজ করিয়ে নেবে তাকে দিয়ে —তার সঙ্গে মিলে, দু'জনে একসঙ্গে। আরম্ভ হতে না হতে কি সব শেষ হয়ে যেতে বসেছে?

নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকায় হীরেনের রাগ হয়। মমতাকে সে পাগলের মত ভালবেসেছিল, কথায় ব্যবহারে ইঙ্গিতে সঙ্কেতে একনিষ্ঠ আনুগত্য ঘোষণা করেছিল অসংখ্যবার, সম্মতি না পেলেও পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে-ই বার বার মমতাকে ভিক্ষা চেয়েছিল,—এই যুক্তি তুলে মমতা আজ তাকে কাবু করতে চায়। প্রমাণ করতে চায় সে অন্যায় করেছে, সে-ই অপরাধী।

'আমি ভেবেছিলাম', হীরেন বলে, 'বিয়ের পর এসব ঝোঁক তোমার কমে যাবে।'

'তাই নাকি?' ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুরে মমতা বলে, 'তুমি ভেবেছিলে আর পাঁচটি ফ্যাশনে মেয়ের মত ছেলেমানুষী করছি, বিয়ে হলে সেরে যাবে? সব ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘর-কন্না করব?' মমতা সজোরে মাথা নাড়ে, বলে, 'না, তুমি তা ভাবোনি হীরেন। ওরকম ভাববার কোন সুযোগ তোমাকে আমি দিইনি। তুমি বরং জানতে বিয়ে করলে আমার কাজের ক্ষতি হতে পারে ভেবেই আমি অনেকদিন তোমার প্রস্তাবে রাজী হই নি। আমার প্রকৃতিও তুমি জানতে। বাধা দেওয়ার বদলে আমার কাজে তুমি সাহায্য করবে মনে

করেই শেষে আমি রাজি হই, তাও তুমি জানতে।' বলতে বলতে মমতার মুখের কাঠিন্য মিলিয়ে গিয়ে গভীর বিষাদের ছাপ ঘনিয়ে আসে, চোখ বুজে একবার ঢোঁক গিলে সোজা হীরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এক হতে পারে, আমায় তুমি ভালবাসোনি। এমন জোরালো আকর্ষণ বোধ করেছিলে যে তোমার ভুল হয়েছিল। এখন সেটা কেটে গেছে। ওরকম হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, খুলে বল না? সব পরিষ্কার হয়ে যাক। জোড়াতালি দিয়ে লাভ কি?

হীরেন গোঁয়ারের মত বলে, 'তোমায় আমি আগের চেয়েও এখন বেশী ভালবাসি। তাই না আজ আমার এই দশা। তোমার খেয়ালে বাঁদর নাচছি।'

মমতার মুখ লাল হয়ে যায়।

হীরেন আবার বলে, 'আমি ভালবাসি কিন্তু তুমি ভালবাসো না। আমি বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাসো না। তুমি ভালবাসো আরিফকে।'

'তুমি কি পাগল?' মমতা বলে হতভম্বের মত।

পাগল হতেই বসেছি মমু।'

মমতা আত্মসম্বরণ করে। বিচিত্র চিন্তা ও অনুভূতির প্রবল আলোড়ন চলতে থাকলেও এতক্ষণে হীরেনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণটার হদিস পেয়ে তার যেন ধাঁধাঁ কেটে যায়। সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে সে বলে, 'এই ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে কদিন তুমি এ রকম পাগলামি করছ? মুখ ফুটে বলতে পার নি আমায়? তুমি এমন সেন্টিমেণ্টাল তাতো জানতাম না হীরেন! শোন বলি। আরিফ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সকলের চেয়ে ঘনিষ্ট, আপন বন্ধু, তার বেশী কিছু নয়। তুমি কি মনে কর ওকে ভালবাসলে ওর বদলে তোমায় বিয়ে করতাম?'

হীরেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে, 'ভুল তো হয় মানুষের। সব সময় নিজের মন—'

মমতা জোর দিয়ে বলে, 'না, আমার ভুল হয় নি। আমি নিজের মন জানি।' একটু দ্বিধা ভরে মমতা তাকায় হীরেনের দিকে, একটু ইতস্ততঃ করে। হীরেনের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি সংস্কারমুক্ত ও বাস্তবধর্ম্মী সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ জন্মে গেছে গত কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতায়। হঠাৎ মন স্থির করে সে বলে, 'খোলাখুলি সব বলছি শোন। আগে, অনেকদিন আগের কথা বলছি, দু'একবার আমারও খটকা লেগেছিল, আরিফকে ভালবাসি কি না। কিন্তু সে সন্দেহ অল্পদিনেই মিটে গেছে। দু'চারবার এমনও হয়েছে যে ওর জন্য আমি জোরালো সেক্‌স্ আর্জ অনুভব করেছি। যোগাযোগ হলে হয়তো কিছু ঘটেও যেতে পারত আমাদের মধ্যে। আর এও বলছি, কিছু ঘটলে আমি আপশোষ করতাম না, মনে করতাম না পাপ করেছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মমতা মৃদু হেসে বলে, 'বুঝলে তো এবার? আরিফ শুধু ঘনিষ্ট আপন জন, বন্ধু। ভালো আমি তোমাকেই বাসি।'

'আমাকেই ভালবাসো? তবে তার প্রমাণ দাও?'

'প্রমাণ দেব?'

হীরেন হঠাৎ উঠে এসে পাগলের মত মমতাকে প্রায় চেয়ার থেকে ছিনিয়ে বুকে তুলে নেয়, এলোপাথারি বিশ পঁচিশটা চুমু খায় তার মুখে মাথায় ঘাড়ে।—'ও বাড়ীতে যাও বা না যাও, এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে। দেশের কাজ সমাজের সেবা তোমায় ছাড়তে বলি না, এভাবে না করে অন্যভাবে কর? রেবা, মালতী, মিসেস সেন, এরাও তো কাজ করছে? ওদের মত একটু শুধু সংযত কর নিজেকে। ঘরের দিকে একটু মন দাও, আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে

একটু ভাব কর, সামাজিক জীবনটা একটু আমায় ভোগ করতে দাও তোমার সঙ্গে। তুমি তো জানো মমু, কখনো কোন বিষয়ে তোমার ওপর আমি জোর খাটাব না? এ জীবন আমার সইছে না। আমার মুখ চেয়ে এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে।'

মমতা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'এইটুকু!' কঠিন বিদ্রূপের তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি ঝলকে ওঠে তার মুখে। 'আমার সব কিছু ছেঁটে ফেলতে হবে—সে হল তুচ্ছ সামান্য এইটুকু! দশজন হালকা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, পার্টি দিয়ে, গান বাজনা গল্পগুজব পরচর্চা করে আর তোমাদের ফ্যামিলি পলিটিক্স নিয়ে মেতে থেকে জীবন কাটালে তুমি আমার ভালবাসার প্রমাণ পাবে? তুমি তো ভারি সস্তা ভালবাসা চাও! এ-রকম ভালবাসা দেবার মত মেয়ের তো অভাব ছিল না হীরেন? ও-রকম একজনকে বেছে নিলে না কেন? উথলে ওঠা ভালবাসায় তোমায় সে ভাসিয়ে দিত।'

মমতা কেঁদে ফেলে। হীরেন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তিন

ঝুমুরিয়ার ক্রোশ দুই তফাতে একখানি বিচ্ছিন্ন শালবন। এটি ছাড়া এ অঞ্চলে আশেপাশে শালবন একরকম নেই। পথের ধারে মাঠে প্রান্তরে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো গাছ চোখে পড়ে, বড়জোর কোথাও উঁচু ডাঙ্গায় ছোট একটি চাপড়া, বন না বলে যাকে শালের বাগান বলা চলে। চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই ছোট শালবনটি যেন পৃথিবীর গায়ে নয়নাভিরাম প্রাগৈতিহাসিক জন্মচিহ্নের মত।

বন কাটার কাজ চলছে কিছুদিন ধরে। উত্তরের খানিকটা অংশ ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডালপালা ছাঁটা ডগা কাটা সিধা লম্বা দৈত্য-দানবের লাঠির মত শত শত শালের স্তূপ জমেছে একস্থানে, শত শত গাছ সবুজ শাখাপত্র নিয়ে হুমড়ি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে। সারাদিন গাছ কাটা, ডালপালা ছাঁটা, জ্বালানি কাঠের টুকরোগুলি কাটা, আগে কাটা আধশুকনো কাণ্ডগুলি দুটি লরী আর অনেকগুলি গরুর গাড়ীতে বোঝাই দেওয়ার কাজ চলেছে অবিরাম, ঊর্দ্ধশ্বাসে। আধ মাইল তফাতে পাকা রাস্তা, এদিকে রেল ষ্টেশন থেকে ওদিকে চলে গেছে সাগরতীরের বালিয়াড়ি বহুল সহরে। মাঠ ও ফসলভরা ক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে ওই রাস্তা পর্য্যন্ত লরী ও গাড়ী চলাচলের একটা পথ গড়ে উঠেছে চাকার দু'টি সমান্তরাল গভীর রেখায়। দরকার মত ক্ষেতের আল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকার দাগের সঙ্কীর্ণতা আর আঁকা বাঁকা গতি দেখে অনুমান করা যায় ক্ষেতের ফসল যতদূর সম্ভব কম নষ্ট করার দিকে নিয়ামকদের নজর আছে খানিকটা!

গাছ কেটে চালান দেওয়ার কাজ সাধারণতঃ ধীরে সুস্থে শিথিল গতিতেই চলে। কিন্তু গোড়ায় মজুরের অভাবে এবং কণ্ট্রাক্টর হেরম্ব চক্রবর্তী অন্যত্র বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এতদিন কাজ ভাল এগোয় নি। খতে লেখা হিসাব মত সময় গুরুতর রকম সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সময় কিছু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, তাই এত তাড়াহুড়ো। গাছগুলি কাটার পর ভাল করে শুকোলে রস মরে হাল্কা হয়, গাড়ীতে বেশী বোঝা চাপানো চলে। কিন্তু সে সময়ও নেই—মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা হয়েছে গাছ কাটা আর চালান দেওয়ার মধ্যে। চেষ্টা চলছে আরও গোটা দুই লরী ও কতগুলি গরুর গাড়ী সংগ্রহের।

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূরে তাকালে দেখা যায়

অস্পষ্ট কুয়াশা রূপ নিচ্ছে। আজকের মত কাজ শেষ। স্থানীয় মজুররা ঝুমুরিয়া, নিতাইপুর, মহিষালি প্রভৃতি কাছাকাছি গাঁয়ে তাদের কুঁড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে। কয়েকজন বিহারী মজুরও গাঁয়ের দিকে চলেছে। এরা গাঁয়ের লোক নয়, ঘর-টান এদের নেই, কিন্তু বনের ধারে এখানে বিনা ভাড়ায় অস্থায়ী কুটির তৈরী করে দিতে চাইলেও তারা এখানে রাত কাটাতে রাজী নয়, লোকালয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে তারা বাস করতে ভালবাসে, এক বাড়ীতে নয়তো এক ঘরে যতজন মিলে একসঙ্গে থাকা সম্ভব। মেয়েপুরুষ সাঁওতাল মজুররাই শুধু এখানে অস্থায়ী ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ডালপালা লতাপাতা দিয়ে নিজেরাই তারা তিন চার হাত উঁচু ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছে, ঠিক যেন বয়স্ক শিশুদের খেলার ঘর। ফাঁকায় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, বাঁশের চোঙায় তেল রাখে, পুরু কাগজের মত ঘন মোটা কাপড় কোমরে জড়ায় আর পিঠে ছেলে বাঁধার বা গায়ে দেবার চাদর করে, কাঠের চিরুণীতে চুল আঁচড়ায়, খোপায় ফুল গোঁজে আর বাবরিতে লাল কাপড়ের ফালি জড়ায়, শালপাতার মোটা বিড়ি বানিয়ে টানে, মেয়েপুরুষে ভাত বা মহুয়ার মদ খায় আর আগুন জ্বেলে মাদল বাজিয়ে নাচে গায়—সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না। দলের প্রধান দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, সম্মানীয়া—সভ্য জগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্যা মাত্র।

চেরা তক্তার মেঝে ও দেয়ালের উপর খড়ের পাতলা ছাউনী দেওয়া চারকোণা ঘরটির সামনে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে হেরম্ব চক্রবর্ত্তী সরু একটা চুরুট টানতে টানতে চোখ কুঁচকে বনের দিকে চেয়েছিল। তার নিজের

চোখের নেশার কুয়াশায় দৃষ্টি একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। দিনে সে কখনো মদ ছোঁয় না, আজ মনটা বড় বেশী বিগড়ে থাকায় অনেক দিনের অভ্যাসটাও বিগড়ে গেছে।

পিঠে বাঁধা শিশুকে সামনে ঘুরিয়ে এনে তার মুখে মাই গুঁজে দিয়ে সাঁওতাল রমণী সামনে দিয়ে চলে যায়, হেরম্বের নেশায় টনটনে কল্পনা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে তার সাত ছেলের মা আগুণের মত উজ্জ্বলবর্ণা সুন্দরী স্ত্রীর আবছা মূর্ত্তি। তার দশ বছরের বিয়ে করা বৌ, এত দিনের এত শান্ত, এত ভাল, এত কোমল বৌ, হঠাৎ তার সঙ্গে এমন বেয়াদবি সুরু করেছে যে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে হেরম্বের। সতীরাণী যে কি করে এমন অবাধ্য, এত শক্ত হল হেরম্ব কল্পনাও করতে পারে না। পাঁচ ছ'মাস দেখা সাক্ষাৎ ছিলনা, তারপর দেখা হবার প্রথম দিন থেকে গত পনের যোল দিন ধরে একটানা একগুঁয়ে অবাধ্যতা! আষাঢ়ের প্রথমে ভারি মাসে সতীরাণী প্রসব হতে এসেছিল পচেটদলে তার বাপের বাড়ীতে, তখন থেকে হেরম্ব বনখালির কণ্ট্রাক্ট আর ট্রেডিং সিণ্ডিকেটের সঙ্গে মামলা নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়েছিল, একদিনের জন্য পচেটদলে আসতে পারে নি, কিন্তু নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে সতীরাণী আর শ্বশুরের নামে। সতীরাণীকে বাপের বাড়ী পাঠালেই তার বাবা মেয়ে আর নাতি নাতনীর জন্য যত খরচ হওয়া উচিত তার অনেক বেশী টাকা বরাবর নানা ছলে তার কাছ থেকে আদায় করেন। টাকা সে পাঠিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ, মনে মনে শুধু একটু হাসে পঞ্চাশ পঁচাত্তরটা টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য শ্বশুরের সুদীর্ঘ ফাঁকা কৈফিয়ৎ পড়ে। এবারও সে চাওয়ামাত্র টাকা পাঠিয়েছে। দ্বিধা করে নি, প্রশ্ন করে নি, দেরী করে নি। এ কথাটা বোধ হয় সতীরাণীর মনে নেই। বোধ হয় সে ভুলে গেছে যে হেরম্ব টাকা না দিলে বাপের বাড়ীর অসীম আদর তার কবে বিবিয়ে যেত—এখন থেকে টাকা পাঠান যদি সে বন্ধ করে দেয়, কয়েক মাসের

মধ্যেই সে টের পাবে বাপ ভাই আর স্বামী এদের মধ্যে কে তার বেশী আপন!

ছেলে হবার ভয়?

সাত ছেলের মার ছেলে হবার ভয়?

সাতবার যে গর্ভধারণ করেছে বিনা দ্বিধায়, আট ন' মাস পূর্ণ হলে হেরম্ব বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক যার নিজের ও গর্ভের সন্তানের অনিষ্ট হওয়া নিবারণের জন্য বৈঠকখানায় শুয়েছে, বাইরে রাত কাটিয়েছে, বলা মাত্র যাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে, কোন প্রয়োজন না থাকলেও কলকাতা থেকে ট্রেইনড্ নার্স আনিয়ে যার কাছে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রসবের অনেক আগে থেকে—সে কিনা আজ তার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় শুতে অস্বীকার করছে আবার সন্তান ধারণ করবার ভয়ে!

সতীরাণী যে বছর-বিয়োনী নারী, এ দোষ যেন হেরম্বের!

স্বাস্থ্য যদি তার খারাপ হত, প্রসব হতে যদি সে কষ্ট পেয়ে থাকতো, তা হলেও হেরম্ব তার আতঙ্কের মানে বুঝতে পারত। কোন কারণ থাক বা না থাক নিছক অর্থহীন আতঙ্ক হলেও হেরম্ব তা মেনে নিত। সতীরাণী এসে যদি আবদার করত তার কাছে, কেঁদে যদি তার পায়ে ধরত, কিম্বা তার মানটা শুধু বজায় রেখে যদি বলত যে কিছুকাল তারা তফাৎ থাকবে, হেরম্ব হাসিমুখে সায় দিত। প্রসব হতে ছ'মাস করে সতীরাণী যে তফাতে থাকে, কাজের চাপে হেরম্ব যে মাঝে মাঝে মাসে দু'চারদিনের বেশী এবং কখনো দু'তিন মাস বাড়ী আসতে পারে না, সতীরাণীকে ছাড়া কি চলে না হেরম্বের? মেয়েমানুষের কি অভাব আছে জগতে?

এই জ্বালাটাই হেরম্ব ভুলতে পারে না যে বিয়ের দশ বছর পরে সতীরাণী তাকে এতখানি ছোটলোক ভেবেছে যে স্ত্রী ও সন্তানের জননীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে আলাদা এটুকু সে জানে না! আজ আছে

কাল নেই মেয়েমানুষের মতই সে যেন ব্যবহার করে এসেছে সতীরাণীর সঙ্গে দশ বছর ধরে! এত কষ্ট করে এত টাকা সে যে রোজগার করছে তা যে শুধু সতীরাণীর জন্য, এতটুকুও কি সে বোঝে না? আর ইচ্ছা করলে সে যে প্রচণ্ড শাস্তি দিতে পারে তাকে, চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে পারে, একটা মাসোহারা দিয়ে আরেকটা বিয়ে করতে পারে সাত দিনের মধ্যে, এ জ্ঞানও কি সতীরাণীর নেই?

নেই বলেই তো মনে হয়।

'ত্যাগ করো। করো ত্যাগ। আমি বাঁচি।' এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী, বলেছিল, 'করো বিয়ে। বিয়ে করো। আমি বাঁচি।'

হেরম্ব ঝগড়া করে নি, ভয়ও দেখায় নি। সতীরাণীকে শুধু এই সত্যটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল যে যার সঙ্গে তার চিরকাল কাটাতে হবে, যার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী সেই উপদেশের!

কি স্পর্দ্ধা একটা গরীবের মেয়ের যাকে সে দাসদাসী আত্মীয় কুটুম্ব ভরা অট্টালিকার কর্ত্রী করেছে, যার কোন সথ কোন আব্দার সে অপূর্ণ রাখে নি!

পরাজয়ের জিদ্ বজায় না থাকায়, অসহ্য আক্রোশে হেরম্বের মন পুড়ে যেতে থাকে। একবার, শুধু একটিবার যদি সতীরাণী নত হত, হুকুম মানত! পাঁচ বছরের জন্য সে রেহাই দিত তাকে—দশ বছরের জন্য রেহাই দিত। গৃহিনীর সমস্ত অধিকার দিয়ে এতদিন যেমন রেখেছিল তেমনি মাথায় করে রাখত কিন্তু নিজে কোনদিন স্বামীর অধিকার দাবী করত না।

খানিক তফাতে নতুন বসানো টিউবওয়েল থেকে একটি সাঁওতাল মেয়ে হাঁড়িতে জল ভরে, হেরম্ব চেয়ে থাকে তার দিকে। অন্নদিনের

মধ্যে মেয়েটির সন্তান হবে, প্রথম সন্তান। মেয়েটির বয়স উনিশ কুড়ির কম নয়। সাঁওতালদের সঙ্গে হেরম্বের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। কম বয়সে কোন সাঁওতাল মেয়েকে সে মা হতে ত্থাখেনি। সারা জীবনে ছ'সাতটির বেশী ছেলে-মেয়ে হয়েছে এমন সাঁওতাল রমণীও দেখেছে কদাচিৎ। পূর্ণগর্ভা মেয়েটির জলতোলা দেখতে দেখতে এ-সত্যটা হেরম্বের মনে পড়ে যায় যে সাঁওতাল মেয়েদের দুটি সন্তানের মধ্যে কম করেও সাধারণতঃ দু-তিন বছরের ব্যবধান থাকে।

মেয়েটিকে সে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। খাঁটি সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর পুরুষ কে?'

'নানকু।'

নানকু দলের প্রধান কানাইয়ার ছেলে! বয়স তার চব্বিশের কাছে। তখন হেরম্বের মনে পড়ে যায় নানকু ও এই মেয়েটির বিবাহোৎসবের কথা। মধুজোলের বনে শাল কাটাতে সে তখন সাঁওতালী গাঁ গড়পায় আস্তানা করেছিল। মধুজোলের বনের ছোট একটা অংশ পেয়েছিল কিন্তু সেই অংশটুকুও ঝুমুরিয়ার এই বনের প্রায় সাতগুণ বড় ছিল এবং ঠিক এবারের মতই সময়ের টানাটানিতে বিব্রত হয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়েছিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। গড়পার স্থায়ী বাসিন্দা হেমন্ত সাঁওতালের এই মেয়েটির সঙ্গে তখন যাযাবর দলের নানকুর ভালবাসা হয়। কেবল মেয়ের বাপ নয়, গড়পা গাঁয়ের সাঁওতাল সমাজ এ বিয়েতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু এমনি এক মৃদু শীতল সন্ধ্যায় নানকুর সঙ্গে মেয়েটি চলে আসে বনের প্রান্তে এ দলের শিবিরে। তীর, বর্শা বা টাঙ্গির আঘাতে ঘায়েল হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নানকু গড়পার শেষ মাটির ঘরখানার পঁচিশ হাত তফাতে জামগাছের নীচে শিয়ালকাঁটার ঝোপে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিয়েটা হয়েছিল যথারীতি এবং যথেষ্ট উৎসবের সঙ্গে কিন্তু দু'পক্ষের

ঝগড়াটা সামলাতে হয়েছিল হেরম্বকে। মিটমাট সে করতে পেরেছিল কিন্তু সেটা তার টাকার জোর, গণ্যমান্যতার জোর বা দারোগা পুলিশের খাতিরের জোরে সম্ভব হয়নি। সাঁওতাল সমাজের একজন বলে গণ্য হবার অধিকার আগে থেকে পাওয়া না থাকলে মধ্যস্থ হয়ে মিটমাটের চেষ্টা করার সুযোগও সে পেত না। বছর দুই আগে সাঁওতালদের এক বড় পরবের দিনে সাঁওতালদের এক বিরাট মেলায় তাকে সাঁওতাল হবার অধিকার দেওয়া হয়—প্রায় পনের বছর ওদের সঙ্গে মেলামেশার পর।

উগ্র প্রতিক্রিয়ার বদলে হেরম্বের মন আত্ম নিগ্রহের জ্বালাময় বিষাদে ভরে যায়। প্রথম জীবনে প্রথম গুরুতর নৈতিক বা ব্যবহারিক অন্যায় করার পর যেমন হত তেমনি অস্থিরতা তাকে আকুল করে তোলে। চুরুট ছুঁড়ে ফেলে সে ডাকে, 'ভরত!'

কাঠের ঘর থেকে ছিটের গলাবন্ধ কোট গায়ে শীর্ণকায় মাঝবয়সী ভরত বেরিয়ে আসে। বসন্তের ছাপের মত মুখভরা অসংখ্য ব্রণের দাগ, চোখা নাকের নীচে বাবুয়ানি ছাঁটা গোঁফ, লোমবহুল মোটা ভুরু শোভিত কোটরগত একজোড়া গোল কটা চোখ। পায়ে বাদামী ক্যাম্বিশের জুতো, চলাফেরায় শব্দ হয় না। হেরম্বের সে পুরানো বিশ্বাসী অনুচর ও সেবায়েৎ।

'আরও খানিকটা চোলাই মদ চেয়ে আন দিকি।'

'হুইস্কি খান না?'

'না না, চোলাই নিয়ে আয়।'

'ব্রাণ্ডির বোতলটা খোলাই হয় নি, সখ করে আনলেন। খুলব? চোলাই টোলাই আপনার সয় না বাবু। পাঁটখানেক তো হয়েছে, আর কেন?

'যা যা, বকিসনে বেশী!'

হেরম্ব মিঠে ভাবেই ধমক দেয়। ভরতের ওপর সে কখনো রাগ করেনা। প্রভুভক্ত প্রসাদলোভী উচ্ছিষ্টভোজী এই লোকটির প্রতি তার একটা বিশেষ স্নেহার্দ্র প্রশ্রয়ের ভাব আছে। ভরত যে তাকে সত্য—সত্যই দেবতা মনে করে এবং মদ থেকে তার সব রকম উচ্ছিষ্ট দেবতার প্রসাদ বলে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করে, অল্পদিনে আগে তার এক চমকপ্রদ প্রমাণ পেয়ে হেরম্ব অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

গত ফাল্গুনের কথা। বনখালিতে সে নিজে উপস্থিত থেকে বন কাটাচ্ছে। যত টাকাই আজ তার হয়ে থাক, যত লোকজন রাখাই সম্ভব হোক, হেরম্ব কখনো পরকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে থাকে না, যেখানে তার কাজ সেখানে সে সব সময় হাজির। এই একটি নিষ্ঠা তাকে সাফল্য দিয়েছে, সাফল্য লাভের পরেও এ নিষ্ঠা সে হারায় নি। নইলে পুলিশের এক জমাদারের ছেলে হয়ে জন্মে, প্রথম বয়সে দু'শো একশো টাকার ছোট ছোট কণ্ট্রাক্ট নিয়ে আরম্ভ করে আজ মাঝ বয়সে লাখটাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কারবার করার সৌভাগ্য সে কোথায় পেত ?

ভরত নিজেই যোগাড় যন্ত্র করে কান্তপুর গাঁয়ের এক গরীব গেরস্ত ঘরের রাধা নামে একটি মেয়েকে জুটিয়ে এনে দিয়েছেন। রাধার বাপ ছিল না, সৎ মা আর সৎ ভাইদের কাছে সে মানুষ। একদিন এই রোগা ছিপছিপে মেয়েটির চুলের মৃদু রুক্ষতা আর মুখের বিষাদকরুণ শ্রী দেখে হেরম্বের মনে হয়েছিল কলকাতার বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েদের একজন বুঝি প্রসাধনের বালাই চুকিয়ে শুধু রঙচটা ছেঁড়া একখানা তাঁতের শাড়ীতে গা ঢেকে গাঁয়ে এসে একটি জীর্ণ শীর্ণ গরুর গলায় বাঁধা দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জিভার একটু খারাপ ছিল হেরম্বের, বনের মধ্যে তাঁবুতে বাস করছিল একা, তায় আবার বসন্তকাল। চাপা পড়া মর্চে ধরা প্রাথমিক কাব্য কল্পনার

আবর্জনার স্তূপ নাড়া খেয়ে একটু উতলা ও উৎসুক করে তুলেছিল হেরম্বকে। রাধাকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল কলকাতায়, বাড়ীভাড়া করে দিলে বালীগঞ্জে, বাড়ী আর রাধাকে সাজিয়েছিল হাল ফ্যাসানে। কত কল্পনাই সে করেছিল ওই মিঠে একটা অপ্রাপ্য কোন কিছুর জন্য হঠাৎ জাগা পিপাসায়। ভেবেছিল, দু'দিনে ফুরিয়ে যেতে দেবে না রাধার সঙ্গে সম্পর্ক, ওকে সে পড়াবে, গান শেখাবে, নাচ শেখাবে, আদব-কায়দা শেখাবে, ঘষেমেজে দাঁড় করাবে আশে পাশের বাড়ীগুলির তরুণীগুলির চেয়েও অপূর্ব বস্তুতে। আর ওকে গড়ে তোলার সঙ্গে গড়ে তুলবে ওর হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের মিহি মধুর কারবার।

কিন্তু রাধা শুধু কাঁদে। তাঁবুতে এসে ঢোকা থেকে, রেলগাড়ীতে চড়া থেকে, বালীগঞ্জে বাড়ীতে ঢোকা থেকে, পুতুলের মত সাজা থেকে হাপুস নয়নে শুধু কাঁদে। হেরম্বের আদর আহ্লাদে ভোলে না, উজ্জ্বল রঙীন ভবিষ্যতের বর্ণনায় কাণ দেয় না,—হেরম্বের লোমশ বুকে, স্প্রিং-এর খাটের কোমল শয্যায়, সোফায় চেয়ারে, কার্পেট ও ঝকঝকে তকতকে মেঝেতে সে শুধু ককিয়ে ককিয়ে কাঁদে! আর শুধু কি তার কান্না, কাছে এনে সাজিয়ে গুজিয়ে নেবার পর কোথায় যে উপে গিয়েছিল তার মুখের সেই হাইক্লাশ কালচারী পেলবতার ছাপ! প্রথম দিন সাবান ঘষবার সময় যে ময়লা উঠেছিল তার মুখ থেকে তার সঙ্গেই বোধ হয় সেই ম্লানিমাটুকুও উঠে গিয়েছিল।

সাতদিনে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হেরম্বের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। শুধু একটি আকর্ষণ তাকে আরও কয়েকটা দিন রাধার জন্য কলকাতায় আটকে রেখেছিল, তার আলিঙ্গনে রাধার বিস্ফারিত চোখে অতি অদ্ভুত এক ভয়ার্ত্ত বিহ্বলতা। জীবনে একবার একজনের চোখে শুধু হেরম্ব এই দৃষ্টি দেখেছিল—মৃত্যু ঘনিয়ে আসবার সময় তার এক সচেতন আত্মীয়ের চোখে। প্রথমদিন এই দৃষ্টি দেখে এক অনির্দিষ্ট ভয়ঙ্কর আতঙ্কে হেরম্বের

হৃদ্‌স্পন্দন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, এত জোরে সে চেপে ধরেছিল রাধাকে যে মুখ তার কালি হয়ে গিয়েছিল, চেতনা হারিয়ে চোখ বুজে এসে তার সেই সাংঘাতিক দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছিল।

রাধার চোখে মৃত্যুকে আরেকবার দর্শন করার কৌতূহল কি জোরালো বিকারেই যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হেরম্বের। নবদীক্ষিত তান্ত্রিক শব-সাধকের মত সে ক্রন্দনরতা রাধাকে দেখে ভেবে পেত না তার এই ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই অতল গভীর ভয়ানক রহস্য দেখা শেষ হলেই যার স্বরূপ সে নিজেও আর মনে করতে পারে না। শেষে একদিন কাছে টানা মাত্র অস্ফুট শব্দ করে রাধা চোখ বুজে অচেতন হয়ে গিয়েছিল, বুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্পন্দন অনুভব করতে না পেরে হেরম্বের মনে হয়েছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। পরদিন হেরম্ব জোর পালিয়ে গিয়েছিল তার বনখালির তাঁবুতে।

আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বেচা হয়ে গিয়েছিল, বাকী সব তার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভরতের ওপর ভার ছিল ভেলায় করে রাধাকে জীবন সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার অর্থাৎ শহরের বিশেষ কোন একখানা ঘর ঠিক করে কিছু জিনিষপত্র আর টাকা দিয়ে তাকে ফেলে পালাবার ব্যবস্থা করা। কয়েকদিন পরে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে ভরত একেবারে বনখালির তাঁবুতে উপস্থিত হওয়ায় হেরম্বের তাই বড় রাগ হয়েছিল।

'ওকে আবার নিয়ে এলি যে শুয়ার?

'একটা কথা আছে বাবু।'

'ওরে ব্যাটা! ওরে শালা! ওরে হারামজাদা!'

'বাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন, ওকে আমি বিয়ে করব।'

বিয়ে করবে! ভরতের হাতেই রাধাকে হেরম্ব ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, সখ হয়ে থাকলে যতদিন ইচ্ছা রাধাকে ভোগদখল করার কোন বাধাই

ভরতের ছিল না, কিন্তু তাতে ভরতের মন ওঠে নি। হেরম্বের এই উচ্ছিষ্ট মেয়েটিকে ভরত যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করবে। বৌ করে নিয়ে যাবে দেশের বাড়ীতে তার মা বোনের কাছে, সংসার পাতবে ওকে নিয়ে। কত পাগল যে থাকে সংসারে!

রাধার সৎ মা ও ভাইদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে ভরত রাধাকে বাড়ীতে রেখে এসেছিল। কয়েকদিন পরে দেশের গাঁ থেকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এসে যথারীতি রাধাকে বিয়ে করেছিল; ভোজ খাইয়েছিল গাঁ শুদ্ধ লোককে। বিয়ের জন্য হেরম্ব তাকে টাকা দিয়েছিল পাঁচশো।

রাধার নাকি আবার ছেলেপিলে হবে। ক'মাস আগে মার চিঠিতে খবর পেয়ে ভরত এমন ব্যস্ত হয়ে ক'দিনের ছুটি নিয়ে বৌকে দেখতে দেশে ছুটেছিল যে মনে মনে হাসি পেয়েছিল হেরম্বের।

চোলাই মদ চালায় হেরম্ব ভরতকে চমকে দিয়ে, ভয় পাইয়ে। চড়া কড়া নেশার চেয়েও অদ্বিতীয় কিছু একটা চাইছে হেরম্ব, অজ্ঞান হতে চায়? ভরত জানে, না দিয়ে উপায় নেই। যখন সে আপত্তি করেছিল, তখন বন্ধ করলে করতে পারত, তারপর আরও কিছু চোলাই যখন দিয়েছে এখন আর ঠেকানো যাবে না বাবুকে। ভয়ে বুক কাঁপে ভরতের। দেবতার মধ্যে শিবের মত, মানুষের মধ্যে এই হেরম্ব। আজ সে ক্ষেপেছে। প্রলয় ঘটে যাবে আজ পৃথিবীতে—ঝুমুরিয়ার উত্তরে এই অর্দ্ধেক পালক-তোলা পাখার মত শালবনের ধারে।

বলে, 'বাবু, শোবেন?'

'আন্ তোর বৌকে, শোব। ছেলে হবে! শূয়ারকা বাচ্চার ছেলে হবে। ওটা কার ছেলে জানিস?'

'আমার সে তো ভাগ্য বাবু!'

হেরম্বের প্রচণ্ড হাসি ছড়িয়ে যায় চারিদিকে—অসভ্য, কুৎসিত,

অশ্লীল হাসি। টিউবওয়েলের কাছে সাঁওতাল মেয়েটার মনে পড়ে যায় সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা দুটো মহিষের ফোঁস্ ফোসানি লড়াই। তার রাগ হয়। হেরম্বও সাঁওতাল। সাঁওতাল হয়ে সে এমন অসভ্যতা করে, বর্ব্বর পশুর মত হাসে!

'জল নেয় কে?' ভরতকে শুধোয় হেরম্ব।

ভরত ভাবে, সর্ব্বনাশ! বলে, 'কে জানে কে। যাক্না বাবু, থাক্ না বাবু।'

'তুই আমার চাকর না মুনিব রে শালা?'

'চাকর, হুজুর। চাকর।'

'বল্ তবে, জল নেয় কে।'

'কুনাইয়ার মেয়ে ওপা।' ভরত ঢোঁক গেলে, 'মান্কের সাথে ওর বিয়ে হবে ও মাসে।'

'ওপা? শোন্ এদিক শুনে যা।' হেরম্ব ডাকে, হঠাৎ জাগা ভদ্র চালাকিতে গলা সংযত করে।

ওপা এসে দাঁড়ায়। হেরম্ব সাঁওতাল, তাদেরি দলের সাঁওতাল, ওপার ভয় নেই। সাঁওতাল মেয়ের চেয়ে সুন্দর দেহের গড়ন পৃথিবীর কোন দেশের কোন মেয়ের নেই। সতীরাণী অবশ্য ফরসা, দুধে আলতা রঙ। ওপার মত সাঁওতালী ছাঁদের একটু যেন ইঙ্গিত ছিল সতীরাণীর দেহে—বিয়ের সময়। মদের নেশায় চাঁদের আলোয় মৃত্যুর চেয়ে অবশ্যম্ভাবী একটা সীমান্ত যেন ওপা হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। হেরম্বের বিয়ের শানাই বাজছে সাঁওতালী বাঁশের বাঁশীতে।

'ভিতরে চল্। আয়।'

'না।'

পালাতে চাইলে ওপা পালাতে পারত। কিন্তু সে পালাবে

কেন? মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার উপক্রম করেছে, হাত ধরে টেনে তাকে হেরম্ব নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতরে। ওপার চকচকে দাঁত লাল হয়ে গেল হেরেম্বের গলার বাঁ দিকের রক্তে। এক কামড়ে নেশা কেটে গেল হেরম্বের। হেরম্ব ছেড়ে দিতে ওপা তারই রক্ত মেশানো লাল থুথু ফেলল তার মুখে।

ঘাড় হেঁট করে হেরম্ব বলল, 'যা তুই ওপা! যা, প্রধানকে বলিস বেশী মদ খেয়েছি।'

হেরম্ব জানে, এসব বাজে ওজর। মদ খেয়ে মরে গেলেও কোন সাঁওতাল কোনদিন কোন অনিচ্ছুক মেয়ের হাত ধরে টানে না—মনেও থাকে না, মানেও বোঝে না, এরকম হাত ধরে টানবার। ওপা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার টাঙ্গি হাতে আসবে তার বাপ, ভাই অথবা ভবিষ্যৎ স্বামী। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে।

'ভরত, বন্দুক দে।'

বাবু, এক কাজ করেন, পায়ে পড়ি আপনার। লরীটা নিয়ে পালিয়ে যান।'

'পালাব? কেন পালাব? ওরে শূয়ার, কটা সাঁওতালের ভয়ে আমাকে তুই পালাতে বলিস্!' ঘোৎ ঘোৎ করে হেরম্ব, ভরতকে বুঝি মেরেই বসে। গলায় দাঁতের স্পষ্ট দাগ আর গর্ত—রক্ত চুঁইয়ে ঘাড়ে নেমেছে। হঠাৎ মেজাজ বদলে যাওয়ায় ভরতকে ছোট চাপড় মেরে বলে, 'তুই বুঝি ভাবলি ভয়ে ওপাকে ছেড়ে দিলাম? শোন ব্যাটা বলি শেখ্। বাঙ্গালী মেয়ে কি করে? চেপে ধরলেই ভয়ে নয় রে ব্যাটা, প্রেমে!—যত ভয় থাক, বিতৃষ্ণা থাক, ঘেন্না থাক, চেপে ধরলেই সব ভুলে যায়, এলিয়ে পড়ে। বুঝলি? তাইতে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল, দেখি সাঁওতাল মেয়ে কি করে। দেখলি'

তো কি করে? খেয়ালটা না জাগলেই ভাল ছিল রে ভারত! দে বন্দুক।' রাত গভীর হয়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, বন্দুকটা বালিশের পাশে রেখে হেরম্ব শোয়। আসুক ওপার বাপ ভাই হবু স্বামী, কাটুক তাকে। মরণের চেয়ে ঘুম এখন বড়, অনিবার্য্য। হয়তো আজ রাতে ওরা কেউ আসবে না। কাল বিচার হবে তার।

খুব ভোরে ওঠাই হেরম্বের অভ্যাস। নেশা করে রাত জাগলেও ছাড়া ছাড়া এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নে সতীরাণীর নাগাল পেয়ে পেয়ে না পাবার পর ঘুম ভেঙে তাঁবুর বাইরে এসে দাড়ানো মাত্র সব যেন এক মুহূর্ত্তে ফাঁকা হয়ে গেল হেরম্বের কাছে। সন্ধ্যায় উগ্র নেশার প্রতিক্রিয়া যেন সুরু হল অভাবনীয় শূন্যতায়।

রাতারাতি সাঁওতালরা চলে গেছে। তাদের কুকুর নেই, মুর্গী নেই, গাছের ডালে বাঁধা হাঁড়ি নেই, সকলের ডাকাডাকি নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে ডগায় ন্যাকড়া জড়ানো মাটিতে পোঁতা কচি বাঁশটি। লতাপাতা ডালপালার কুঁড়েগুলি তারা ভেঙেচুরে মাটিতে লুটিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছে!

হেরম্বকে ওরা ত্যাগ করেছে, বর্জ্জন করেছে। নিজের জটিল কৃত্রিম ভারাক্রান্ত জীবন যাপনের সাথে সাথে সরল সহজ ও সংযত একটা জীবন সে যাপন করে চলেছিল অনেকগুলি বছর ধরে ওদের সঙ্গে, সে এক রীতিমত সুদীর্ঘ সাধনায়। ওদের দলের একজন হবার অধিকার পেয়েছিল তারই পুরস্কার স্বরূপ। ওরা তাকে আজ বাতিল করে দিয়েছে। সে আর সাঁওতাল নয়।

তাকে কিছু না বলে, বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়ে, সবাই চলে গেল? সতীরাণীর অবাধ্যতার চেয়ে একদল অসভ্য নরনারীর এই নির্ব্বিরোধ নিঃশব্দ অবজ্ঞা যেন আরও বেশী অসহ্য মনে হয় হেরম্বের। সতীরাণীকে নোয়ানো যায়। হ্যাঁ, হেরম্ব জানে, হুকুমে না আসুক,

হাত ধরে টানলে না আসুক, দাবী করার বদলে একটু সকাতর ব্যথাজীর্ণ অসুস্থতার ভান করলেই সতীরাণী ছিটকে এসে তার বক্ষলগ্না হবে। কিন্তু এই সব অসভ্য বুনো মানুষগুলির কাছে ওসব উঁচুদরের ভাবপ্রবণতার কোন দাম নেই, সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে সে যদি গিয়ে পড়ে ওদের মধ্যে, তার জন্য যা দরকার সব ওরা করবে এখনো, পৌঁছে দেবে কোনো সভ্য ভদ্রলোকের বাড়ী কিম্বা সদরের হাসপাতালে কিন্তু ওদেরই একজন হবার অধিকার আর সে পাবে না। পায়ে ধরে কাঁদলেও নয়।

মুহ্যমানের মত হেরম্ব বনের দিকে তাকায়। কি আরক্ত সূর্য্য উঠেছে বনের কর্ত্তিত অংশের ফাঁকে, না কাটলে এখনো ওই শাল-গাছের আড়ালে থাকত মৃদু কুয়াসায় ক্রুদ্ধ টকটকে লাল এই সূর্য্য।

জীবনে আজ প্রথম হেরম্ব অনুভব করে সে বড় একা, বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল, বড় দুঃখী। বাকী শালবনের দিকে চেয়ে জীবনে আজ তার প্রথম কর্ম্মোন্মাদনার বদলে জাগে গভীর অবসাদ, আলস্যের অনুরাগ। এ বন কাটতে হবে তাকে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাটতেই হবে! কেন? কার কাছে সে কি অপরাধ করেছে যে কন্ট্রাক্টের পর কন্ট্রাক্টের মর্য্যাদা রাখতে তাকেই খাটতে হবে ঊর্দ্ধশ্বাসে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত? কে সে? কে আছে তার? কার জন্য, কিসের জন্য এই কঠোর সংগ্রাম?

জীবনে এই প্রথম বলেই হয়তো বেলা বাড়ার সঙ্গে এই সহৃদয় বৈরাগ্যের ভার হেরম্বের কমে আসে, শুধু থেকে যায় একটা অনভ্যস্ত অস্থিরতা, অজানা বিষাদের ছাপ।

বন কাটতে হবে বৈকি। বাপ্‌রে, এত টাকা খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এখন সময়মত কাজটা না করলে কি লোকসানটাই দিতে হবে তাকে! দু'সপ্তাহ সময় বাড়াবার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে হেরম্ব

লোকের সন্ধানে ঝুমুরিয়ায় যায়। ঝুমুরিয়া ও তার আশেপাশে গাঁ থেকে লোক সংগ্রহ করে সাঁওতালদের অভাব পূরণ করতে হবে। মুস্কিল এই যে এখন ধান কাটার সময়। গেঁয়ো নিষ্কর্ম্মা মজুররা পর্য্যন্ত ধান কাটার কাজে লেগে গেছে। ধান পাকলে তা ঘরে তুলতে দেরী করলে চলে না। গরীব তো চাষীরা। বড় গরীব।

ধান কাটতে হবে বৈকি। তা, হেরম্বের বনটাও তো কাটতে হবে তাড়াতাড়ি। বনটা কাটা হোক, তারপর সবাই মিলে সারাবছর ধরে ধান কাটুক, কোন আপত্তি নেই হেরম্বের।

আপত্তি বীরেশ্বরের। এবং যেহেতু ঝুমুরিয়ায় বীরেশ্বরের প্রতিপত্তি কম নয়, আপত্তি অনেকের, দু'চারজন ছাড়া। বীরেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, 'তা হয় না। ধান নষ্ট হয়ে যাবে। বন তো রইল, ধান কেটে সবাই যাবে'খন বন কাটতে।'

'নবাব খাঞ্জা খাঁর মত কথা কইছ দেখি তুমি ?'

'গাল দেবেন না জামাই বাবু। ওটা সয় না।'

হেরম্ব চোখ পাকিয়ে তাকায়। বীরেশ্বর চোখ পাকায় না, সোজা তাকিয়ে থাকে তার চোখের দিকে। চোখের তার পলক পড়ে কিন্তু পাল্লায় হার মেনে চোখ নামে না। হেরম্বের মনে হয়, বীরেশ্বরের পিছনে দাঁড়ানো জন ষাটেক লোকের প্রায় ষাট জোড়া চোখ যেন বীরেশ্বরের চোখের মারফতে তার দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। জমিদারের জামাই সে, একজন প্রজা তাকে তুমি সম্বোধন করছে! কারো তাতে বিস্ময় নেই, আতঙ্ক নেই! চটে উঠে বজ্জাত কথাটা বলা বোধহয় উচিত হয় নি লোকটাকে। অবশ্য, পা থেকে জুতো খুলে লোকটার গালে বসিয়ে দেওয়াই তার কর্ত্তব্য, তবে কিনা গরজটা এখন তার। আপাততঃ এ পাগলাকে না চটানোই বোধ হয় উচিত।

হেরম্ব রাগ সামলে বলে, 'ধান কাটো না তোমরা, কে বারণ করছে ?

'আমার শুধু জন কুড়ি পঁচিশ লোক দরকার। বাকী সবাই ধান কাটো।' বীরেশ্বরকে ডিঙ্গিয়ে অন্য সকলকে শুনিয়ে সে বলে, 'চড়া মজুরী দেব—দেড়া বাড়তি টাইম। রোজ বাড়তি টাইম পাবে।'

ক্ষেত মজুর যারা উপস্থিত ছিল তারা উসখুস করে। ক্ষেত তাদের নেই, ধান কাটা আর শালবন কাটা তাদের কাছে সমান। উদ্ধত দৃষ্টিতে তারা কেউ হেরম্বের দিকে তাকায় নি, ওটা হেরম্বের কল্পনা মাত্র।' হেরম্বের সঙ্গে বীরেশ্বরের কথা কাটাকাটির স্পর্দ্ধায় তারা ভয়ে বিস্ময়ে থ' বনে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। হেরম্বের মনে হয়েছিল ওরা বুঝি বীরেশ্বরের চাউনিকেই নকল করছে।

জালালুদ্দিন দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বরের পাশে। বীরেশ্বরের চেয়ে তার বয়স বেশী, চুল দাড়ি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। তরুণ কিশোরের মত ছিপছিপে ঋজু দেহ, গেঞ্জিহীন দেহে ফুলকাটা পাতলা কাপড়ের ময়লা পাঞ্জাবী, লাল ও সবুজের চেককাটা লুঙ্গি, লোমের মত মোলায়েম সাদা বাবরি চুল, টানা দুটি চোখে মোলায়েম স্বগত কৌতুক। এই স্থূল জগৎ আর গুরুভার জীবন যেন অতিশয় মজার ব্যাপার, এত কালের বেঁচে থাকা অতীতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সুখদুঃখ আশা নিরাশা আনন্দ বেদনায় স্তূপাকার অভিজ্ঞতা যেন একটি মাত্র সরল অনুভূতিতে পরিণত হয়ে বুড়োবয়সের প্রতিটি মুহূর্ত্তের বর্ত্তমানকে তাজা তামাসা করে রেখেছে। জালালুদ্দিনের আটটি ছেলেমেয়ে, বাইশটি নাতি নাতনি আর তিনটি পুতি পুতনী—মরাহাজা বাদ দিয়ে। কাছে সবাই থাকে না, জীবিকার জন্য ছড়িয়ে গেছে কাছে ও দূরে। যারা আছে তাদের নিয়েই তার মস্ত সংসার, বীরেশ্বরের সংসারের মত।

সাংসারিক মিলের জন্যই হয়তো দু'জনের মিতালি, নয়তো দু'জনের প্রকৃতিতে মিল বড় কম। বীরেশ্বর রগচটা বদমেজাজী, জালালুদ্দিন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এমনিতে মনে করাই কঠিন

যে জালালুদ্দিনের মধ্যে তেজ বলে কিছু আছে। গাঁয়ের জীবনে, চাষীর জীবনে, ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই থাকে এর সঙ্গে অথবা ওর সঙ্গে। বিবাদ করতে বড়ই নারাজী জালালুদ্দিন।

বিবাদ বাধার কারণগুলিকেই সে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে, বিবাদের সূত্রপাতে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও অপর পক্ষকে জিতিয়ে দিয়ে নিজে হাসিমুখে হার মেনে আপোষ রফা করে, বড় স্বার্থের সংঘাতেও তার স্বার্থই বরাবর বাতিল হয়ে যায়। সন্দেহ জাগে যে মানুষটা বুঝি অপদার্থ, ভীরু। বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয় যে এই নরম দুর্ব্বল সাদাসিদে মানুষটা এতকাল ধরে এত প্যাঁচ আর এত চালাকিভরা হৃদয়হীন কঠোর জীবন সংগ্রামে অনেকের চেয়ে বেশ খানিকটা ভালভাবেই টিঁকল কি করে! কিন্তু দু'চার বার গুরুতর ব্যাপারে এই মাটির মানুষটিকেই যারা আগুণে পোড়া লোহার চেয়ে শক্ত হতে দেখেছে, কৌতুকভরা দৃষ্টির বদলে দু'চোখে আবিষ্কার করেছে জেহাদ ঘোষণা, তাদের সন্দেহ সমস্যা সব মিটে গেছে। নায়েব দীনু সরকারকে এই জালালুদ্দিন একবার হাটের চালার খুঁটিতে বেঁধে হাটশুদ্ধ লোকের কাছে তার বদ মতলবের খুঁটিনাটি সব কথা স্বীকার করিয়ে প্রায় জেল যেতে বসেছিল। ভয় আর লোভ দেখিয়ে ঝুমুরিয়ার তিনটি মুসলমান যুবককে দিয়ে এমন একটা কাজ করাতে যাচ্ছিল দীনু সরকার, যার ফলে গাঁয়ের হিন্দু মুসলমানে একটা বড়রকম মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার ঘটে যেত। জালালুদ্দিনকে সেই নায়েবের শত্রুতায় অনেক অন্যায় অত্যাচার সইতে হয়েছে। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে নায়েব মারা না গেলে কোথাকার জল কোথায় গড়াত বলা যায় না। এ ধরণের কীর্ত্তি আরও আছে জালালুদ্দিনের। লোকে এখনো গল্প করে।

কথা সে কম বলে। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর।—'চারগুণ

মজুরি দিলেও এ গাঁয়ের কেউ যাবে না। যে যাবে তার মুশকিল আছে।’

সবাই শুনল। ক্ষেত মজুরদের উস্‌খুসানি থেমে গেল। কয়েকজনের চোখে শুধু ফুটে উঠল কুটিল, দ্বিধাগ্রস্থ প্রতিবাদ।

ধনা মাইতি নীচু গলায় বলল, ‘জবরদস্তি বটে বাবা।’

কাদের সায় দিল।

হেরম্ব কি ভাবল সেই জানে, বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি না করে জোর গলায় হাঁক দিয়ে বলল, ‘তোমাদের কোন ভয় নেই। কোন মুস্কিল হবে না। যে জুলুম করবে তাকে আমি দেখে নেব। ডবল পয়সা পাবে সবাই, চলে এসো।’

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল জোতদার নিতাই চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর দিকে। নিতাইয়ের বাড়ী থেকে সে গেল আবদুল-এর বাড়ী।

নিতাই চক্রবর্ত্তী নথিপত্র দেখছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিসাব করছিল কার কাছ থেকে কতটা বেশী আদায় করা সম্ভব হতে পারে। শুভদিন, লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে গুছিয়ে ছিনিয়ে সংগ্রহ করবার দিন আসন্ন, চাপা উত্তেজনায় নিতাই চক্রবর্ত্তীকে রীতিমতো উন্মনা দেখাচ্ছে। তার গোলায় পড়েছে গোবর মাটির নতুন প্রলেপ। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কপালে চন্দনের ফোঁটা।

‘বীরেশ্বর?’ জিভে ক্রোধ ও বিরক্তির টকাস্‌ আওয়াজ করে নিতাই বলে, ‘ও ব্যাটা চিরকাল জ্বালালে। অনাথ মণ্ডল ওদের প্রধান, সে পর্য্যন্ত ব্যাটাকে ডরায়। তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু, লোক পাবেন।’ চিন্তিতভাবে নিতাই মাথা দোলায়, ‘ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে, এই যা অসুবিধে। নয় তো লোকের অভাব কি! তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু! লোক পাবেন।’

আবদুল হাই-এর বয়স চল্লিশের ওপর, গোলগাল চর্ব্বি-স্নিগ্ধ লাবণ্যময় চেহারা, হাসিখুসী অমায়িক ব্যবহার। অত্যন্ত চালাক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। গ্রাম্য রাজনীতিতে, মামলা মোকদ্দমায় এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই।

হাসিমুখে কথা বলতে বলতেই একবার হাই তুলে এক মুহূর্ত্তের জন্য সে আড়চোখে খাপছাড়া দৃষ্টিতে তাকাল হেরম্বের দিকে, মনে মনে বলল, হুঁ, ফ্যাকড়া বাধাতে এসেছ আমাদের মধ্যে। তোমাকে লোক যোগান দিতে জালাল মিঞার সাথে লড়াই বাধাব আমি!

মুখে বলল, 'হাঁ, হাঁ, চেষ্টা করব বৈকি বাবু। তবে কি জানেন, বীরেশ্বরকে সবাই ডরায়। জালাল মিঞার সাথে বড় ভাব। ফের দেখুন, ধান কাটাও সুরু হয়ে গেছে—এই যা মুস্কিল আর কি।'

ঝুমুরিয়া আর তার আশপাশের পাঁচনিথে, সাতাইখুনী, গদাধরপুর এসব গ্রাম থেকে যে কজন লোক পেল হেরম্ব তাদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। এ যে শুধু বীরেশ্বরের প্রভাবে হল তা অবশ্য নয়, চার পাঁচটি গ্রাম দূরে থাক, শুধু ঝুমুরিয়ার সিকি ভাগ লোককেও বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে হুকুম মানাবার ক্ষমতাও তার ছিল কিনা সন্দেহ। সময়টাই গেল হেরম্বের বিপক্ষে। ফসল কাটায় শুধু চাষীর নয় জমিদার, জোতদার, ভাগীদার, মহাজন সকলের স্বার্থই জড়িয়ে আছে। অন্য সময় হলে একা নিতাই চক্রবর্ত্তী একদিনে বিশ ত্রিশজন লোক জুটিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারত বন কাটতে, এখন সে তিনজন প্রায় অকেজো বুড়োকে পাঠিয়ে হেরম্বের মান ও নিজের কথা বজায় রাখল। বনটা বড় হলে বেশীদিন মোটা মজুরিতে কাজ করার সম্ভাবনা থাকলেও হয়তো অনেকে লোভে পড়ে কারো হুমকি না মেনে মাঠের কাজ ফেলে চলে যেত। কয়েকটা দিনের ডবল মজুরির লোভে যাদের সঙ্গে চিরদিনের স্থায়ী সম্বন্ধ তাদের চটানো অনেকেরই ভাল মনে হল

না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল ধান কাটার মরসুমে মাঠের কাজ করতে, এখানে যাদের কেউ নেই, তারাই শুধু বন কাটতে গেল। এখানে যাদের ঘর কিন্তু ফসলের সময় ছাড়া সারাটা বছর যারা বিদেশে জীবিকা অর্জ্জন করে তারাও প্রায় কেউ হেরম্বের ডাকে সাড়া দিল না। হেরম্ব কিন্তু দায়ী করল বীরেশ্বরকে। যারা সাহায্য করতে পারত তারাও যে মুখে তাকে কথা দিয়েও কাজের বেলায় অনুগত লোকজনকে বারণ করে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই যে বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো বিদ্বেষ পোষণ করে, এসব হেরম্বের মনে এল না। বীরেশ্বর ছাড়া আর কেউ সোজাসুজি স্পষ্টভাবে তার বিরোধিতা করেনি বলেই একা বীরেশ্বরই দায়ী হয়ে রইল তার মনে।

শ্বশুরের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার ইচ্ছা হেরম্বের ছিল না। সেখানে সতীরাণী আছে। কিন্তু অন্যভাবে চেষ্টা করারও সময় ছিল না। শ্বশুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হওয়ায় বীরেশ্বরের উপর রাগটা তার আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল।

হুকুম ধমক আর লাঠির গুঁতোয় দুদিনের মধ্যে শ'খানেক মানুষকে হেরম্বের বন কাটতে যেতে হল। ঝুমুরিয়ার মানুষেরাই লাঠির গুঁতো খেল বেশী—ঝুমুরিয়া থেকেই বেশী লোককে যেতে হল মাঠ ছেড়ে বনে।

পাঁচনিখের দারোগা শৈলেন দাস বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনকে এ দুদিন থানার গারদে আটকে রেখে সদরে চালান দিল, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টা এবং মারপিটের অভিযোগে। পুলিশকে মারপিট নয়—ধনা, কাদের ও আরও কয়েকজনকে।

ধনা ও কাদেরকে বীরেশ্বর সত্যই মেরেছিল। জালালুদ্দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল শুধু প্রতিবাদ করতে—জ্বর গায়ে।

শৈলেন দাসের বয়স মোটে আটাশ বছর। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে

গড়ন, সুশ্রী চেহারা। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে, সতর্ক, বুদ্ধিমান, উৎসাহী। একটা কথা শৈলেন জানে ও বিশ্বাস করে যে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি করতে নেই, যতটুকু প্রাপ্য হেরম্বের তার বেশী খুসী তাকে করার গরজ শৈলেনের ছিল না।

শৈলেনের ভেবেচিন্তে হিসেব করে লেখা রিপোর্টে তাই ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর রূপ নিল না। বীরেশ্বরের সাজা হল একমাস জেল এবং একশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস হাজতবাস। জালালুদ্দিনের শুধু তিন সপ্তাহ হাজতবাস। তার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ ছিল না। বীরেশ্বরের কাছ থেকে জরিমানা আদায় হলে অর্দ্ধেক টাকা ধনা ও কেদার পাবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

ধনা ও কেদার পাবে তার জরিমানার টাকার ভাগ! শুনেই মাথা বিগড়ে গেল বীরেশ্বরের। জরিমানা দিতে সে অস্বীকার করল। ছেলেদের বলে দিল, তারা যদি জরিমানার টাকা দাখিল করে, হাজত থেকে বেরিয়ে সে তাদের মুখদর্শন করবে না।

রম্ভা ঝুমুরিয়া এল দিন গুণে, হাজত-ফেরত বাপকে আদর করে ঘরে তুলবে। খবর সে পেয়েছিল যথাসময়েই, তাকে নিয়ে অবিলম্বে ঝুমুরিয়া রওনা হবার জন্য রামপালের আগ্রহও কম ছিল না। রম্ভা দিন পিছিয়ে দিয়েছিল। বাপ নেই, সে কিসের বাপের বাড়ী। বাপের কথা ভেবে মিছিমিছি কান্না পাবে শুধু।

কলকাতায় বাপের কথা ভাবে নি রম্ভা, তার কান্না পায় নি? সত্য কথা বলতে কি, খবর শুনে বেশ ভালরকম কান্নাই তার পেয়েছিল। চালাক একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, কান্নাটা তাই সে গিয়েছিল চেপে। মুখখানা একটু ম্লান পর্য্যন্ত করল না। ভাবল, রামপাল দেখুক এবং শিখুক

যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জেলে যাওয়ার গৌরব কত, কেমন ওটা সৌভাগ্যের বিষয়।

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

রম্ভা সগর্ব্বে বলেছিল, 'কিসের কষ্ট?'

বলে' রামপাল একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে দেখে শুধরে নিয়ে বলেছিল, 'ওমা, কষ্ট হচ্ছে না? তোমার বাবা জেলে গেলে কষ্ট হয় না তোমার? কিন্তু কি বুকের পাটা ভাবো দিকি বাবার! গাঁয়ের কেউ কথাটি কইলে না, শুধু আমার বাবা জমিদারের লোক পুলিশের লোক সবার সামনে তাল ঠুকে দাঁড়াল। বাবা সকলের পুজো পাওয়ার যুগ্যি নয়?' এতক্ষণে চোখ ছল ছল করে এসেছিল রম্ভার, পট পট করে কবার পলক ফেলে ধরা গলায় বলেছিল, 'কষ্ট হলে করছি কি বলো? সুয্যিদা বলত, এদেশে মানুষের মত মানুষ যে হবে জেলে তাকে যেতে হবেই, এম্‌নি দেশ এটা। সত্যি না কথাটা? গান্ধীজি থেকে সুরু করে নাম কর দিকি একটা বড় মানুষের, আদ্দেক জীবন যে জেলে কাটায় নি?'

রম্ভা আজকাল অনবরত এইরকম সোজা স্পষ্ট প্রোপাগাণ্ডা চালাতে আরম্ভ করেছিল, কোন একটা উপলক্ষ পেলেই হল। কেবল রামপাল নয়, বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে। জানাশোনা কথারই পুনরাবৃত্তি রম্ভার আন্তরিকতায় আবার নতুন করে সকলের মন স্পর্শ করে, একটা অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য অস্বস্তিবোধ জাগায় সকলের মধ্যে, আধভোলা তাকে তোলা নালিশগুলি আবার কিছুক্ষণের জন্য গুমরে ওঠে বুকের মধ্যে, কেউ মুচকে হেসে বলে, 'ও বাবা, স্বদেশী মেয়ে তুমি?' আগে হয় তো রম্ভা রেগে যেত হাসি দেখে এবং মন্তব্য শুনে, আজকাল সেও হেসে জবাব দেয়, 'নয় তো কি বিদেশী মেয়ে? মেম?'

ঝুমুরিয়া পৌঁছেই রম্ভা শুধোয়, 'বাবা ছাড়া পাবে কবে?

শ্যামলাল বলে, 'আরও একমাস।'

ব্যাপার শুনে আগুন হয়ে ওঠে রম্ভা। বীরেশ্বর বারণ করেছে বলে জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হয় নি! এমনি সব বাপ-ভক্ত উপযুক্ত ছেলে বীরেশ্বরের! বাপ একটু রাগ করবে, এসে দুটো মন্দ কথা বলবে বলে ভয় হয়েছে সবার! এই একটা ছুতো পেয়ে বাপকে ছেলেরা জেলে পচাচ্ছে একশোটা টাকার জন্যে—ভোগ করছে সেই বাপের টাকাপয়সা জমি-জমা!

'বাবা যদি আত্মঘাতী হতে যেত, ঠেকাতে না তো বাবাকে? রাগের ভয়ে আত্মঘাতী হতে দিতে বাবাকে?'

মুখ কালো করে সবাই শোনে। এ বিষয়ে যে অনেক আলোচনা হয়েছে বাড়ীতে, বীরেশ্বরের বারণ অমান্য করেও যে জরিমানা দেবার কথাটা তারা ভেবেছে অনেকবার কিন্তু মনস্থির করতে পারে নি শেষ পর্য্যন্ত, এসব রম্ভাকে কেউ বলে না। দ্বিধাসংশয়হীন তীব্র ভাষায় এমন জোরের সঙ্গেই রম্ভা বলে দিয়েছে তাদের কি করা উচিত ছিল যে মনস্থির করতে না পারাটাই মস্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বটে। তাই বটে! রাগ না হয় করতই বীরেশ্বর, এসে দুটো গাল মন্দই দিত, তাই বলে বুড়ো বাপকে জেল থেকে খালাস করে না আনার কোন মানে হয়? মেরে তো আর সে ফেলত না বাড়ীর সবাইকে।

সকলে চুপ করে থাকে। ছোট ভাই মোহনলাল, এ বাড়ীতে যে সকলের চেয়ে রোগা আর বেঁটে, সেই একা প্রতিবাদ করে রম্ভার ঝাঁঝালো সমালোচনার, বলে, 'অত চোটপাট করিস নে ছোড়দি, বাবা তোর একার বাবা নাকি? আমরা ছাড়িয়ে আনতাম বাবাকে, বাবার মনে কষ্ট হবে বলে আনি নি।'

'কিসের কষ্ট ?' রম্ভা শুধোয় অবাক হয়ে।

'ধনা আর কাদের যে জরিমানার টাকা পাবে ?'

'ধনা পাক মনা পাক কাদের পাক ফাদের পাক, মোদের তাতে কি ?'

এ প্রশ্নের লাগসই নতুন জবাব মোহন খুঁজে পায় না। সে শুধু বলে, 'বাবার মনে কষ্ট হবে।'

পরদিন শ্যামলাল জরিমানার টাকা জমা দিতে সদরে গেল। টাকা জমা হয়ে গেল সেইদিন, ছাড়পত্র পেয়ে বীরেশ্বরের বাড়ী ফিরতে লেগে গেল পাঁচ দিন। কার অত গরজ পড়েছে পুরাণো নথিপত্র ঘাঁটবার ? হবে, সব হবে, ধীরে সুস্থে। এতই যদি ব্যস্ত তারা, এতকাল জমা দেয় নি কেন টাকা ? পুরো একটা মাস কি ঘুমোচ্ছিল তারা ?

শেষে দেবনারায়ণ উকীল বললেন, 'দাও দিকি দশটা টাকা।'

তৈলাভাবেই শেষ চাকা ঘুরছিল না। তেল পাওয়া মাত্র চাকা ঘুরে গেল। বীরেশ্বর ছাড়া পেল সেইদিন।

দেখা গেল বীরেশ্বর রাগ করে নি। সে শুধু একবার আফশোষ করে বলল, কি দরকার ছিল অতগুলো টাকা নষ্ট করার ? কটা দিন বেশ কেটে যেত।'

'বড্ড রোগা হয়ে গেছ বাবা।' রম্ভা বলে।

বীরেশ্বর হাসে।--'তবে কি মোটা হব ?'

রম্ভা এক বাটি দুধ এগিয়ে দেয়। 'দুধটা খাও দিকি আগে।'

দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করে, 'কত ধান বরবাদ গেল ?'

'এই গেছে কিছু।' শ্যামলাল জবাব দেয়।

'মোদের কথা শুধোই নি। গাঁ শুদ্ধ ধরে ?'

'তা মোটমাট মন্দ যায় নি। সবচেয়ে বেশী গেছে ভূতো, ননী কালীপদ আর রহমতের। আদ্দেকও ঘরে তুলতে পারে নি। কম বেশী সবারি গেছে।'

'এত গেল?' বীরেশ্বর এক চুমুকে জাম বাটি ভরা দুধ শেষ করে ফেলে।—'মোদের কত গেল?'

'এই গেল কিছু।'

'কত?' বীরেশ্বর গর্জ্জন করে ওঠে, 'ছাপাসনে কিছু। সোজা কথা বলতে শিখিস নি?'

শ্যামলালের বদলে জীবনলাল জবাব দেয়, 'ডাঙ্গা জমির প্রায় সব নষ্ট।' হেরম্ববাবু সারাদিন লরী চালাল কিনা ক্ষেতের ওপর।

'দখিন জমির আল ডিঙ্গোতে লরীর একটা চাকা ভেঙ্গেছে বাবা।' মোহনলাল যোগ দেয়। সাত বিঘে জমির পাকা ফসল চাকায় পেষার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটা চাকা যে অন্ততঃ লরীটার জখম হয়েছে তাতে মোহনকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হয়।

বীরেশ্বরের বাড়ীর সামনে লাউ কুমড়োর মাচা। ডাইনের মাচায় ঝুলছে অনেকগুলি বড় আর কচি লাউ। এই সবুজ সফল মাচা থেকে চোখ তুলে উত্তরে তাকিয়ে কেমন একটা শূন্যতার অনুভূতি জাগে বীরেশ্বরের। অনেক দিনের চেনা মানুষ যেন গোঁপ দাড়ি কামিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরে শাল বনের চিহ্ন নেই, পৃথিবীর উত্তুরে মুখটা যেন চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

মনটা নুয়ে বাঁকা হয়ে যায় বীরেশ্বরের। জীবনে আর কখনো সে এমন জগদ্দল পাষাণের মত ভারি জমাট বাঁধা বিষাদ অনুভব করে নি। আজ তার প্রথম মনে হয় মানুষটা সে সুস্থ স্বাভাবিক নয়, সে সত্যই খ্যাপা, পাগলাটে, খাপছাড়া। লোকে যে বলে তাই ঠিক, মাথায় তার পোকা আছে। এতদিন কার সঙ্গে সে লড়াই করে এল, কিসের

সঙ্গে? ভগবান জানেন, লড়াই সে করেছে অবিরাম। বাইরে বড় সংঘর্ষের সুযোগ তার বেশী জোটেনি, দৈনন্দিন জীবনের অনেক অনিয়ম, অনাচার, অবিচার অন্যায়ও সে সয়ে গেছে নিরুপায় ধৈর্য্যের সঙ্গে, কিন্তু মন তার মহত্তম অসঙ্গতিকেও মেনে নেয় নি, উদ্যত, উদ্ধত প্রতিবাদ গুমরে গুমরে গর্জ্জন করেছে। সব তার মাথার বিকারের লক্ষণ—চড়া বায়ুর প্রমাণ। কি এসে গেছে তার প্রতিবাদে? যা ঘটবার সবই ঘটেছে, কেউ ঠেকাতে পারে নি। এই হয় তো নিয়ম জগতের। ঝড় এসে ঘর ভাঙ্গে বলে ঝড়ের নামে নালিশ করে কে যে এটা উচিত নয়, এ অন্যায়, এ অত্যাচার? পাগল করে। মাথা যার খারাপ বীরেশ্বরের মত।

সূর্য্য এসে সামনে দাঁড়ায়।

'খবর পেয়ে দেখতে এলাম।'

মাঘের মিঠা রোদে কেমন প্রাণশূন্য মনে হয় সূর্য্যের রক্তহীন শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, তার স্তিমিত নিবু নিবু চোখ।

'খপর অনেকেই পেয়েছে।'

সূর্য্য হাসে। সত্যই হাসে। কি করে যে হাসে ভগবান জানেন।

'আসবে। সবাই আসবে। বাজারে আদ্দেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের আদ্দেক ছেলে বেরিয়ে এসেছে। দল বেঁধে প্রসেসন করে সবাই আসবে। আসবে কি, আসছে।'

বিষণ্ণ রোদ দীপ্ত হয়ে ওঠে বীরেশ্বরের চোখে। অসীম শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যায় অদৃশ্য মানুষের অশ্রুত কলরবে। নিতাই, সুদেব, বলাই, রামপদের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকগুলি চোখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এতক্ষণে খেয়াল হয়। খেয়াল হয় রম্ভা সঙ্গে আছে গোড়া থেকে।

'প্রসেসন?' বীরেশ্বর বলে।

'আপনি বলেছেন সবাইকে প্রসেসন করতে! এ কাজ আপনার।' কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে রম্ভা বলে।

'একজন দুজন করে এলোমেলো ভাবে আসত, আমি ভাবলাম, সবাই দল বেঁধে আসুক। আমার কোন বাহাদুরী নেই রম্ভা।'

'আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। দুধ খাবেন একটু?'

'একদিন একটু দুধ খাইয়ে মোটা করে দেবে?'

'একদিন কেন, রোজ খাবেন। দুধ খান না বুঝি? তাই এমন চেহারা হয়েছে। কেন খান না দুধ?'

'কে খাওয়াবে দুধ?'

আধঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা আসে, রাঘব মহান্তির বাড়ী ও দোকানের সামনে রাস্তার বাঁক ঘুরে। দূর থেকেই শোভাযাত্রার লোকসংখ্যা আন্দাজ করে বীরেশ্বর অভিভূত হয়ে পড়ে, রম্ভার বুক দশহাত হয়ে ওঠে। অপ্রশস্ত মেটে রাস্তা, পাঁচ ছ'জনের বেশী পাশা-পাশি হাঁটতে পারে না, শোভাযাত্রা তাই অত্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছে। বীরেশ্বরের বাড়ীর পাশে আমবাগান পেরিয়েই তার খুড়তুতো ভাই কাশীশ্বরের বাড়ী, শেষ প্রান্ত রাস্তার বাঁক ঘুরে আসতে আসতে শোভাযাত্রার মাথা প্রায় কাশীশ্বরের বাড়ীর সামনে এসে পড়ে। শোভাযাত্রার নিঃশব্দ অগ্রগতি রম্ভার কাছে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। ছেলেবুড়ো মিলে এতগুলি গেঁয়ো মানুষ দল বেঁধে আসছে বীরেশ্বরকে সম্বর্দ্ধনা করতে, তাদের সারি দেওয়াতে শৃঙ্খলা নেই, পদক্ষেপও এলো-মেলো অথচ হৈ চৈ চেঁচামেচি দূরে থাক, এতগুলি লোকের শুধু কথা বলাবলিতে যে কলরব গড়ে উঠত, তা পর্য্যন্ত শোনা যায় না। বীরেশ্বরের মুক্তি যেন পরম শোকাবহ ঘটনা, আনন্দের বদলে সকলে শোক প্রকাশ করতে আসছে।

শোভাযাত্রার সামনে জালালুদ্দিনের ভাই মহীউদ্দিনকে এবং তার

পিছনে গ্রামের অনেক পরিচিত মুসলমানকে দেখে বীরেশ্বর সকলের স্তব্ধতার মানে বুঝতে পারে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য গাঁয়ের অর্দ্ধেকের বেশী হিন্দু মুসলমান একত্র হয়েছে কেন তাও সে টের পায়। জালালুদ্দিন তার জন্য এই সম্মান ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে রেখে গেছে।

জ্বর গায়ে জালালুদ্দিন জেলে গিয়েছিল। দিন পনের পরে সে নিম্যুনিয়ায় মারা যায়।

চার

কৃষ্ণেন্দু থাকে নরোত্তম দাস লেনে ছোট একটি বাড়িতে, তার দাদা পূর্ণেন্দুর সঙ্গে। বয়সে পূর্ণেন্দু তার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, পড়াশোনা করেছেন অনেক, এককালে কিছুদিন দেশের কাজে উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এখন ধীর স্থির সংসারী নিরীহ ভালমানুষ। ছোট ভাইটিকে তিনি অনেকটা বড়দাদার মত শ্রদ্ধা করেন। চাকরী করে সংসার চালিয়ে একঘেয়ে জীবন-যাপন করার জন্য তার মনে বিশেষ কোন ক্ষোভ নেই, কারণ তিনি সত্যই বিশ্বাস করেন এবং অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকারও করেন যে বড় কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি উপযুক্ত নন। বলেন 'আমরা তো অপদার্থ, আমাদের জীবনের দাম কি ? কলেজে পড়ার সময় যোয়ান বয়সে একবার জেল খাটলাম ছ'মাস, বাস্, খতম হয়ে গেল দেশের কাজ। কেষ্ট তেমন নয়। ও একটানা চালিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে যখন করল, ভেবেছিলাম এবার বুঝি ঢিল পড়বে। ও কি সেই ছেলে ? বিয়ের একমাসের মধ্যে বৌমাকে পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দিলে! ওর সঙ্গে আমাদের তুলনা ?'

পূর্ণেন্দুর স্ত্রী কণক বিয়ের সময় কলেজে পড়ার আলস্যে বেশ মোটা সোটা ছিল, পাঁচটি ছেলেমেয়ে বিইয়ে আর সংসারের কাজে অবিশ্রাম খেটে খেটে মেদ ক্ষয়ে গিয়ে এখন বেশ ছিপছিপে চেহারা হয়েছে।

সে হেসে বলে, 'ওটা ঠাকুরপোর গায়ের ঝাল ঝাড়া, আমায় টানতে পারেনি কিনা।'

আজ সে হেসে একথা বলে, কিন্তু একদিন গায়ের জ্বালাতে সংসারে তীব্র অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণেন্দু আর সন্ধ্যাকে তাড়িয়েই দিয়েছিল বাড়ী থেকে। তাড়িয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যাকে নীচু করার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর। একদিন বানিয়ে সে একটা গল্প বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে। হীরেন তখন সর্ব্বদা এ বাড়ীতে আসত যেত। স্বচক্ষে সে দেখেছে হীরেন আর সন্ধ্যা—

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'তাই নাকি? তবে তো মুস্কিল!'

মুস্কিল? শুধু মুস্কিল? কণকের এটা সহ্য হয় নি।

'আমার বাড়ীতে এসব চলবে না ঠাকুরপো। তুমি অন্য কোথাও যাও।'

তারপর কৃষ্ণেন্দু যখন জেলে, একটি মেয়েকে জন্ম দিয়ে সন্ধ্যা মরে যায়। সন্ধ্যা কাছে থেকে যে বিকার সৃষ্টি করেছিল কণকের মনে, তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল সন্ধ্যা দূরে যাবার পর থেকেই। সন্ধ্যা মরে গেছে শুনে কণকের প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। একদিন জেলে দেখা করতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সে স্বীকার করে আসে তার বজ্জাতির কথা। কৃষ্ণেন্দুর মেয়েকেও এক-রকম ছিনিয়ে নিয়ে আসে তার দিদিমার কাছ থেকে। কণকের মাই টেনেই সে বড় হয়েছে। এখন তার বছর চারেক বয়স, সবাই পুতুল বলে ডাকে। কৃষ্ণেন্দুর চেহারা যেমন হোক, সন্ধ্যার রূপ দেখে চোখে পলক পড়ত না মানুষের, মনে হত সে বুঝি মাখন দিয়ে গড়া পুতুল। মেয়েটাও অনেকটা মায়ের মত হয়েছে।

সেদিন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে আছে বিকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। রাত সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ী ফিরে কৃষ্ণেন্দু জামা খুলতে যাবে, উত্তেজনার একটা ঝাপ্‌টার মত হাজির হল মমতা।

পাশের ঘরে কণকের কাছে বসেই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তবু সে হাঁপাচ্ছে। এটুকু আসার পরিশ্রমে অবশ্য নয়, উত্তেজনায়। 'দাঁড়াও, বলছি। দম নিয়ে নি।'

কৃষ্ণেন্দু আর জামা খুললো না।

কৃষ্ণেন্দু অত্যন্ত লম্বা, যেরকম লম্বা হলে লোকে তালগাছ বলে থাকে। রোগা বলে তাকে আরও বেশী লম্বা দেখায়। রোগাও সে এক অদ্ভুত ধরণের, মোটা মোটা হাড় ছাড়া গায়ে তার কোথাও মাংস নেই। দেহের স্বাভাবিক গড়নটাই তার এইরকম, রোগে ভুগে মাংসের অপচয় ঘটে রোগা হয়নি বলে এবং শরীরের সঙ্গে মানানসই ধাঁচের লম্বাটে মুখে শীর্ণতা চোখে পড়ে না বলে, জামা গায়ে থাকলে তাকে বিশেষ খারাপ দেখায় না, খালি গায়ে তাকে দেখায় হাড়গিলের মত। মানুষের সামনে এজন্য সহজে সে জামা খুলতে চায় না—এত যে সে তেজী, আত্মবিশ্বাসী, ন্যাকামি-অভিমান-বিরোধী মানুষ; এই একটি তুচ্ছ বিষয়ে দুর্ব্বলতা সে জয় করতে পারেনি। গায়ে তার খানিকটা হাফ-পাঞ্জাবী ও খানিকটা ফতুয়ার মত হাতকাটা জামা—সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র এই রকম জামাই সে পরে। এও একটা দুর্ব্বলতা বৈকি। সাধারণ সার্ট পাঞ্জাবীর চেয়ে এই জামাতে যে তাকে ভাল মানায়, বেশ দেখায় তাকে এই জামা পরলে, লোকের ধারণা হয় সে বিলাসিতা-বিমুখ ফ্যাশন-বিদ্রোহী সহজ মানুষ, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, আনমনে সে নিজেই তা জানে। চওড়া কপালের দুটি প্রান্তের বাঁক তার সুডৌল, বড় বড় চুলে টেরি না কেটে সে

তাই সোজাসুজি পিছনে ঠেলে চুল আঁচড়ায়। লম্বাটে চিবুক, খাড়া নাক দিব্যি মানানসই, কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি অত্যন্ত খাপছাড়া দেখায়।

এদিকে দম নিতে নিতে কি হয় মমতার, হুস করে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আর নিজের অনভ্যস্ত কান্নায় নিজেই কেমন ভড়কে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে সেটা থামাতে চেষ্টা করে। হাতের চাপেই কান্নাটা যেন থামে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়।

বলে, 'এটা কি হল ?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'একটু কাঁদলে, আর কিছু নয়। চাপা না দিয়ে প্রাণভরে কেঁদে নিলে পারতে মমু।'

মমতা আর একবার চোখ মুছে বলে, 'না আর দরকার নেই। আমারও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল, কি যেন হওয়া উচিত, হচ্ছেনা, জোলাপ নেবার পর যেমন হয়।' বলে' গম্ভীর হয় মমতা। গুরুতর কথা গম্ভীর না হয়ে বলা যায় না, বলা উচিতও নয়।—'শোন। ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। হীরেন আমায় ত্যাগ করেছে। মানে, ও আমায় ত্যাগ করেছে, আমিও ওকে ত্যাগ করেছি। আমাদের বনল না।'

কৃষ্ণেন্দু বলতে যায়, 'প্রথম কলহ হলে—'

মমতা প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ কর। দাম্পত্য কলহ কাকে বলে আমি জানি। এ তা নয়। তোমার কথাই ঠিক হল কেষ্টদা। ওকে গড়ে নিতে পারলাম না, আরও বিগড়ে গেল। মানুষ ভেবেছিলাম ওকে, বেরিয়ে পড়লো অমানুষ।'

'ওতো অমানুষ নয় ?'

'নয় ? শোন তবে।'

অনেক সময় লাগে বলতে। অতি বোধগম্য কথাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে কি কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারবে। কণক ধৈর্য্য

হারিয়ে বার বার এসে উঁকি দিয়ে যায়, বলে যে কৃষ্ণেন্দু খেয়ে নিলেই পারত, এ রকম অনিয়মে কদিন তার শরীর টিকবে। শেষে সে রীতিমত রাগ করেই বলে যায়, 'বেশ, গল্প করো তোমরা সারারাত। আমি গিয়ে শুলাম।'

খিদেয় ঝিমিয়ে আসে কৃষ্ণেন্দুর শ্রান্ত শরীর। সহানুভূতির বদলে বোধ করে বিরক্তি, জাগে একটা ভাষাহীন কঠিন প্রতিবাদ। মমতার সঙ্কটের বিবরণ সে শোনে সমালোচকের মত, দরদী বন্ধুর মত নয়। তার মনে হয়, মমতা যেন তাকেও জড়িয়ে ফেলতে চাইছে তার দাম্পত্য জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে, দায়িত্ব আরোপ করতে চাইছে তার ঘাড়ে। মমতা তাকে সব বলছে সেইভাবে, নালিশ না করেও মানুষ যেভাবে দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশের ভঙ্গিতেই ভগবানকে জানায়, আমার তো কোন দোষ নেই, তবে কেন এমন হল ভগবান ?

'কেন তুমি অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেষ্টদা ? কেন তুমি অত করে বলতে গিয়েছিলে ওর হয়ে ? আর কিছুদিন গেলে হয় তো ওকে ঠিকমত চিনতে পারতাম।'

শুনে বড় রাগ হয় কৃষ্ণেন্দুর। মমতার নরম গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবার জন্য হাতটা তার নিসপিস করে ওঠে। ফুটন্ত ক্রোধের বুদবুদের মত কতগুলি গাল মনের মধ্যে ফুটে উঠে ফেটে যায়—বড়-লোকের স্বার্থপর খেয়ালী হতভাগা নচ্ছার মেয়ে—ন্যাকা মেয়ে !

'তোমায় দোষ দিচ্ছিনা কেষ্টদা। আমিই ভুল করেছিলাম। আমি শুধু বলছি কি—'

রম্ভাও বলেছিল। এরকম হিসাব করে নয়, গোড়াতে প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে—কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমার ? নালিশ রম্ভাও করে নি, তাকে আত্মীয় ভেবে ওভাবে কথাটা বলেছিল, তার বিয়ের ব্যাপারে কোন সংস্রব ছিল না এমন আপন জনের কাছেও

সে ওভাবেই দুঃখ নিবেদনের ভূমিকা করত। মমতাও হয়তো নালিশ করছে না, দোষ দিচ্ছে না। নিজের দায়িত্বে এতবড় ভুল করার চিন্তাটা শুধু তার সইছে না। ভুল করার সমর্থনে যত পারে যুক্তি আবিষ্কার করে সে শুধু দায়িত্ববোধটা একটু হালকা করতে চায়। নিজের ওপর এবার বিরক্তি জাগে কৃষ্ণেন্দুর। দায়িত্ব আছে বৈকি তার, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে সে কি কাজ করতে দেয়নি এদের হৃদয় মনের ওপর, যারা আকৃষ্ট হয়েছে তার দিকে, আপন বলে জেনেছে তাকে, শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তার বুদ্ধি বিবেচনাকে, আপদে বিপদে সঙ্কটে সমস্যায় ছুটে আসছে তারই কাছে সমবেদনার দাবী নিয়ে, পরামর্শ চেয়ে?

'বড় খিদে পেয়েছে মমু।'

'খিদে পেয়েছে!'

'সারাদিন ঘুরেছি। চান করে খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আলোচনা করব।'

'আলোচনা করার কিছু নেই। কি করব তা আমি ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু তুমি খেয়ে নাও। আমি সত্যি বড় স্বার্থপর—খালি নিজের কথা ভাবি।' মমতা থামে।—'নাইবে? নেও না এতরাত্রে। মুখ হাত ধুয়ে নাও শুধু।'

দ্বিধাহীন স্পষ্ট নির্দেশ। নিজের অধিকার মমতা সত্যই জানে—একটু বেশীরকম জানে।

কৃষ্ণেন্দু চান করে খেতে বসলে মমতা তাকে জানায়, সব সে ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে চির জীবনের মত—স্বামীকে, বাপকে, আত্মীয়-স্বজনকে, ভদ্রলোকের সংসর্গকে। আর আপশোষ নয়, একসঙ্গে দুটি জগতে বাস করার মিথ্যা চেষ্টা নয়, যাদের নিয়ে তার কাজ তাদের মধ্যে সে নেমে যাবে এবার। বাড়ী পর্য্যন্ত সে আর ফিরে যাবে না।

না, আজ রাত্রের জন্যেও নয়। নিজের বাড়িতেও দু'রাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। আজ সে এখানে ঘুমোবে—কৃষ্ণেন্দুর বাড়িতে। তারপর বস্তিতে হোক, গ্রামে হোক, যেখানে কৃষ্ণেন্দু তাকে কাজে লাগাবে সেইখানে চলে যাবে।

না, দু'নৌকায় আর সে পা দেবে না। বাকী জীবনের খানিকটা নয়, সবটা সে খরচ করবে চাষী মজুরদের জন্য। ওদের মধ্যে ওদের মত হয়ে থাকবে, ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে ওদের একজন হয়ে কাজ করবে ওদের জন্য। মমতা শান্ত হয়েছিল, আবার তার মধ্যে উত্তেজনা ঘনিয়ে আসে। কিন্তু কথা সে বলে ধীর ভাবেই, উত্তেজনা প্রকাশ পায় শুধু তার চোখে আর যুদ্ধ ঘোষণার উদ্ধত ভঙ্গিতে।

কণক গিয়ে রাগ করে শুয়েছিল, কিন্তু ছিল সজাগ হয়েই, কান পেতে। উঠে এসে বাড়া ভাত সে-ই কৃষ্ণেন্দুর সামনে ধরে দিয়েছে। গেলাসের জল ফেলে নতুন করে জল গড়িয়ে দিয়েছে। মমতার কথা শুনতে শুনতে তার মুখ হাঁ হয়ে আসে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই? কি বলছ এসব?'

মমতা বিরক্ত হয়ে বলে, 'চুপ কর বৌদি। তুমি এসব বুঝবে না।'

মমতা কোনদিনই কণককে বিশেষ কেয়ার করে না, এসব রাঁধা-বাড়া ছেলে-মানুষ-করা সঙ্কীর্ণমনা সাধারণ আত্মপরিতৃপ্ত মেয়েদের প্রতি তার একটা দারুণ অবজ্ঞার ভাব আছে—বিশেষতঃ যে সব মেয়ের কিছু করার সুযোগ ছিল। এরকম হবার জন্যেই যারা মানুষ হয়েছে ঘরের মধ্যে, তাদের বরং সে ক্ষমা করতে পারে, সইতে পারে, কিন্তু নামকরা কংগ্রেস নেতা নিরঞ্জন বসুর মেয়ে হয়ে, পূর্ণেন্দুর স্ত্রী আর কৃষ্ণেন্দুর বৌদি হয়ে যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ঘরের কোণে এই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক জীবন বেছে নিতে পারে, তাকে পছন্দ করা মমতার

পক্ষে অসম্ভব। অথচ মাঝে মাঝে বেশ ভালই লাগে কনককে তার। নিজের স্বামী-পুত্র-ভাওরকে স্নেহ করার তার অদ্ভুত ক্ষমতা সময় সময় অসতর্ক মুহূর্ত্তে মমতার অবহেলার বর্ম্ম ভেদ করে মর্ম্ম স্পর্শ করে তাকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়। পরক্ষণে মনে মনে হেসে সে অবশ্য সামলে নেয় নিজেকে। এতো উচ্ছ্বাস, এতো ভাবপ্রবণতা, নিছক দাসীর মনোবৃত্তি।

কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দু একদিন একথা স্বীকার করেছিল, বলেছিল, 'নিশ্চয়। তবে কি জানো, ওদের পক্ষে এই ভাল। এইরকম প্রকৃতি দাঁড়িয়ে গেছে, এভাবে স্নেহ করতে না পারলেই বিগড়ে যাবে, এমনি তীব্রতার সঙ্গে তখন সবাইকে হিংসা করবে—নিজের লোককে শুধু নয়, পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে। কত মেয়ে ওরকম হয়ে যায়, তুমি নিজেও তো দেখেছ। রমেশ বসুর স্ত্রীকে মনে নেই? দিনরাত ঝগড়া করছে বাড়ীর আর পাড়ার লোকের সঙ্গে, স্বামীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্তি দিচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, ছেলের বৌ দিনরাত কাঁদছে আর গলায় দড়ি দেবার কথা ভাবছে—ওর স্নেহ করার নেশা মিটলে এমন হত না। ওরকম হওয়ার চেয়ে স্নেহপাগল হওয়া কি ভাল নয়? যার যেমন প্রকৃতি, উপায় কি বলো!'

মমতা বলেছিল, 'নিজের প্রকৃতি বদলাতে পারে না মানুষ? চেষ্টা করলে সংযত করতে পারে না নিজেকে?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'পারে বৈকি, কিন্তু সে বড় কঠিন চেষ্টা। ভাবের আবেগে ফাঁসি যাওয়া বরং সহজ, ভাবপ্রবণতা সংযত করার চেয়ে। রীতিমত সাধনার ব্যাপার। নিজে নিজে একা একাজ কি সম্ভব সকলের পক্ষে? একজন মহাপুরুষ বহুকাল একটানা চেষ্টা করলে তবে এসব মানুষের স্বভাব বদল করতে পারেন।'—কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল, 'যদিও মহাপুরুষ নই, আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম

বৌদিকে বদল করে দলে টানতে। শেষে দেখলাম, সব কাজ বন্ধ করে অর্দ্ধেক জীবন বৌদির পেছনে লেগে থাকলে তবে যদি কিছু করতে পারি। তার চেয়ে বৌদি যেমন আছেন তেমনি থাকতে দেওয়াই ভাল।'

কৃষ্ণেন্দু নীরবে খেয়ে যায়। কতকগুলি কাজ কৃষ্ণেন্দু বড়ই আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে করে, তার মধ্যে খাওয়া একটা। তিন জনেই চুপচাপ। ঘুম ভেঙ্গে পুতুল এসে বাপের গা ঘেঁসে বসে পড়ে। পাতে তখন অবশিষ্ট আছে তিনটি পটোলের মোরব্বা। পুতুল গাল ঘষে কৃষ্ণেন্দুর বাহুতে। মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে।

কণকও হাসে—'দুষ্টু মেয়ে!'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নাড়ে।—'না।'

কণক বলে, 'দাও না ঠাকুরপো আধখানা ভেঙ্গে? তুমি যেন কি!'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না।'

কণক বলে, 'দাঁড়া পুতুল, আমি দিচ্ছি তোকে।'

আস্ত একটি মোরব্বা এনে সে বাড়িয়ে দেয় পুতুলের দিকে, বলে, 'নে। ধর।'

পুতুল নড়ে না, হাতও বাড়ায় না। কৃষ্ণেন্দুর গায়ে ঠেস দিয়ে তেমনি ভাবে বসে থেকে একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে বলে, 'খাব না তো।'

মুখ লাল হয়ে যায় কণকের। বাড়ানো হাত ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে সে মর্ম্মাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খাও পুতুল, নাও। জেঠিমা দিচ্ছে যে?'

তখন পুতুল সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। হাতের মোরব্বাটি উঠানে ছুঁড়ে দিয়ে কণক উঠে চলে যায় ঘরে। পাতের একটি মোরব্বা মেয়ের হাতে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খেয়ে নিয়ে জেঠিমাকে হাত ধুয়ে দিতে বলবে, কেমন?'

মমতা মন্তব্য করে, 'তোমার মনটা তো বড় দুর্ব্বল কেষ্টদা ? দেবে না বলে আবার দিলে, বৌদির একটু ছেলেমানুষী অভিমান হয়েছে বলে ? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলে ?'

কৃষ্ণেন্দু আনমনে বলে, 'হ্যাঁ, দুর্ব্বল বৈকি। নিশ্চয় দুর্ব্বল। মানুষের মনটা কি জানো—' হঠাৎ সে সচেতন হয়,—'কি বলছিলে ? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলাম ? ওইটুকু মেয়ের আবার ডিসিপ্লিন কিসের ?'

'গোড়াতেই দিলে না কেন তবে ?'

কৃষ্ণেন্দু যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মমতার মুখের দিকে। —'আমাকে তুমি কি ভাব বল দিকি মমু ? মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো ? আমাকে তুমি মানুষ ভাবো না, যন্ত্রটন্ত্র মনে কর। আমি যাই বলি যাই করি, সব কিছুর একটা বিশেষ মানে থাকা চাই তোমার কাছে, উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন বলত ?'

'কি জানি। সত্যি ওরকম ভাবি নাকি তোমাকে ?'

'মনে তো হয়। বেশী মিষ্টি খেলে পুতুলের পেট কামড়ায়, তাই প্রথমে না বলেছিলাম। একটা মোরব্বা খেলেই যে পেট কামড়াবে তার কোন মানে নেই। তাই শেষে বললাম, খাও। অত কড়াকড়ি করা যায় না খুঁটিনাটি সব বিষয়ে।'

'তাই নাকি ?' খোঁচা দিয়ে মমতা বলে, 'কড়াকড়ি কিছু কম করা হয়েছে বলে তো মনে হয় না ? তুমি বললে, নিও না, বাস্, ওইটুকু মেয়ে বৌদির কাছ থেকে খাবার নিলে না। তুমি বললে, নাও। অমনি ও হাত বাড়িয়ে দিলে। এতো প্রায় মিলিটারি ডিসিপ্লিন! এটা আপনা থেকে শিখেছে মেয়েটা, না ?'

এবার কৃষ্ণেন্দুর মুখ কৌতুকের হাসিতে ভরে যায়,—'বৌদি ঠিক বলেছে মমু, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি ভাবছ আমার ভয়ে পুতুল বৌদির কাছে খাবারটা নিতে চায় নি ? কি বুদ্ধি তোমার! আমি

দেব না বলায় ওর অভিমান হয়েছিল। আমি হার মেনে নিতে না বললে ওকি করে মোরব্বা নেয়? ছোট ছেলেমেয়ের অভিমানও চেনো না? চিনবে, নিজের হোক, তখন টের পাবে—'

'এ জন্মে আর আশা নেই টের পাবার।'

ঘরে এসে তারা বসেছে। পুতুলের সঙ্গে কণক এসে বলে, 'তোমার মেয়েকে নিয়ে আর পারি নে ঠাকুরপো। মাথা তো খেলে ওর তুমি আস্কারা দিয়ে দিয়ে? এত করলাম, কিছুতে শোয়াতে পারলাম না মেয়েকে!'

কৃষ্ণেন্দু কড়া গলায় বলে, 'পুতুল! শীগ্‌গির শুয়ে থাক গে।'

'শোব না যাও!' সোজা এগিয়ে এসে পুতুল কৃষ্ণেন্দুর কোল দখল করে বসে পড়ে। মমতার দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু অসহায়ের মত বলে, 'একদম ডিসিপ্লিন মানে না মমু।'

'খুঁচিও না কেষ্টদা, ভাল হবে না। আমার বলে মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে, তুমি তামাসা জুড়লে আমার সঙ্গে। নিজে তো খেলে পেট ভরে, আমি যে এখনো—'

কণক বলে, 'খাওনি এখনো? বেশ!'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বলতে পার নি?'

'খেয়াল ছিল নাকি যে বলব?'

'কি এখন খাওয়াই তোমাকে আমি!' বলতে বলতে কণক লুচি আর বেগুন ভাজতে যায়। একটু পরেই ষ্টোভের আওয়াজ কানে আসে। মমতার এতক্ষণে খেয়াল হয়, তার জীবনের এত বড় ওলোট-পালোট সম্বন্ধে কৃষ্ণেন্দু এ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নি।

'কই, কিছুত বললে না তুমি?'

'কি বলব?'

'কি বলবে! কিছুই বলার নেই তোমার? তুমি বুঝি এখনো ভাবছ

আমি ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে বসেছি, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'ঝোঁকের মাথায় কিনা জানি না মমু। তবু আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ!'

মমতা ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু তাকে সমর্থন করবে না, ভুল সংশোধনের চেষ্টাকে ভুল মনে করবে, এটা সে কল্পনাও করতে পারে নি। ষ্টোভের আওয়াজের মতই একটা সশব্দ ক্ষোভ যেন পাক দিয়ে উঠে তার সমস্ত সংযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, মনে হয় এই মুহূর্তে উদ্ভট খাপছাড়া কিছু একটা না করলে, সে বাঁচবে না। হীরেন তাকে সস্তা মনে করে, তাকে হার মানায়। কৃষ্ণেন্দু মনে করে ভুল করাই তার স্বভাব।

মমতার ক্ষোভটা অভিমানে পরিণত হতে হতে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কি আর তোমায় বলব মমু, আমি নিজেই থতমত খেয়ে গিয়েছি। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এড়িয়ে যেতে পারবে। তা হল না। এতদিন ভাসা ভাসা ভাবে চলছিল, সখ করে নিজেকে কষ্ট দেবার মজা টের পাও নি, এবার বুঝবে। মনটা ঘুরিয়ে নিতে পার না মমু? আমি জানি, তুমি একটু মন বুঝে চললে, একটু প্রশ্রয় দিলে, হীরেন বদলে যাবে।'

'তুমি আমায় কি ভাব বলত?'

'তুমি জান না তোমায় আমি কি ভাবি?'

'জানতাম, আজ খটকা লাগছে। সখ করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি মানে? সব আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি, এ হল আমার সখ! এরকম সখ কটা মেয়ের মধ্যে তুমি দেখেছ কেষ্টদা? সখ দুদিনে মিটে যাবে। তুমি বুঝি তাই ভাবছ? ভাবছ আমি পারব না? সখ মিটে গেলে ফিরে যাব? কি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে। সুপ্রভা, কুন্তলা, কল্যাণী এরা যা পারছে, আমি তা পারব না!'

'তুমি পারবে না বলি নি। কি ভাবে পারবে সেটাই ঠাউরে উঠতে পারছি না। সুপ্রভারা যতটা পারে ততটা করছে—আনন্দের সঙ্গে করছে। ওদের সব সময় নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না। নিজেকে পীড়ন করার দরকার হয় না। তুমি ওদের মত সহজভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবে না মমু, যতই চেষ্টা কর। হয় তুমি ওদের ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে, অসাধারণ কাজ করবে, নয় তোমার কাজের বিশেষ কোন মূল্য থাকবে না, জিদের বশে মনের জোরে কোন মতে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবে। আদর্শের জন্য হঠাৎ ত্যাগ করা আর আদর্শের জন্য হাসি মুখে দিনের পর দিন খেটে যাওয়া ভিন্ন জিনিষ। ত্যাগ করলেই যে কাজও করা যাবে এমন কোন মানে নেই। ত্যাগের দুঃখ বরণ করা যায়, সওয়া যায়। মনে দুঃখ নিয়ে কাজ করা যায় কি? কাজ করে সুখ পাওয়া চাই—আনন্দ থাকা চাই, উৎসাহ থাকা চাই কাজের পিছনে।'

'হীরেনের জন্য খুব কষ্ট হবে সত্যি কিন্তু—'

'শুধু হীরেনের জন্য নয়। ও দুঃখের কথা বলি নি। এ দুঃখ তো কাজের আনন্দই বাড়ায়—কাজটাই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় মানুষের—অবশ্য যদি কাজের দিকে মন যায়। আমি বলছি নতুন জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা। তোমার হয় তো ভাল লাগবে না, তবু তোমাকে জোর করে চালিয়ে যেতে হবে। তখন তোমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ হবে, যে কেউ তা পারবে।'

'ভাল লাগবে না? এতদিন যা করছি তা ভাল লাগবে না?'

'এতদিন যে একভাবে করেছ। এখন অন্যভাবে করতে চাইছ।'

'অন্যভাবে মানে?'

'মানে? এই যেমন ধর, কানুর ছেলে আর বোটার বসন্ত হয়েছে শুনে ছুটে দেখতে গিয়েছিলে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টাকা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এসেছিলে। তুমি চাইছ এবার থেকে ও অবস্থায় শুধু ওইটুকু না করে একেবারে শিয়রে বসে সেবা করবে।'

'তাই যদি হয়? সেবা করতে পারব না ভাবছ তুমি?'

'পারবে না কেন? কিন্তু ভাল লাগবে কি না তাই ভাবছি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও ওদের জন্য আমার আসলে দরদ নেই?'

'দরদ থাকাটাই সব নয় মমু। হীরেনের জন্য তোমার দরদ কম নয়, কিন্তু ওর জন্য তো—'

মমতা অধীর হয়ে বলে, 'এসব আজে বাজে তর্ক রাখো কেষ্টদা। কাল থেকে আমায় কাজে লাগিয়ে দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু একটু ভাবে।

'নিজের বাড়ী ফিরে যাবে না কেন মমু? তোমার বাবা কি দোষ করলেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। হীরেন কি মনে করে জানো? আমার বাবার অনেক টাকা আছে বলে আমার এত তেজ, কাউকে গ্রাহ্য করি না। তোমার মত হীরেনও বিশ্বাস করে না, আমি সত্যি কুলি মজুরকে ভালবাসি, ওদের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বড় লোকের মেয়ে হয়ে জন্মে যেন মস্ত অপরাধ করেছি।'

হীরেনের জন্য? হীরেনকে মমতা দেখতে চায় তার মধ্যে ভেজাল নেই, সে খাঁটি সোনা? কৃষ্ণেন্দু জানে এটা খাপছাড়া কিছু নয়, দোষেরও নয় মমতার পক্ষে। নিজেদের কক্ষচ্যুত করার সাধ মমতাদের এইরকম কারণ থেকেই জাগা স্বাভাবিক। এরকম একটা অথবা কতগুলি সাধারণ কারণ না থাকলে নতুন আবেষ্টনীতে নতুন জীবনে নতুন সার্থকতা খুঁজবার কথাটা এদের মনেই বা পড়বে কেন। তার নিজের বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে নি? অভাগাদের চেয়ে তাকে বেশী টেনেছিল ওদের হয়ে লড়াই করার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, বাহাদুরীর মোহ। তবু মানুষের কাছে অকস্মাৎ নৈর্ব্যক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করার মত বোকামি যে কিছু নেই, কৃষ্ণেন্দু আজ যেন তা ভুলে

যায়। মমতাকে তার মনে হয় নিজের মনের মোহের বাষ্পে ফাঁপিয়ে তোলা ফানুষ। মনে হয়, মমতাকে সে চিনতেই পারে নি এতকাল— চিনতে চায় নি বলে। নিছক নিজের প্রয়োজনেই সে এই সুন্দরী শিক্ষিতা ভাবময়ী বুদ্ধি-বিলাসিনী বালীগঞ্জী ধাঁচের সাধারণ ধনীকন্যাটিতে অসাধারণত্ব আরোপ করে কাছাকাছি রেখেছে। সারদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যেমন রেখেছে এই নিরালা গৃহের কোণে কণকের ঘরোয়া স্নেহ যত্ন, পুতুলের মায়া আর ঘুমের বিশ্রাম, তেমনি রেখেছে রূঢ় বাস্তবতার ঘষায় ছড়ে যাওয়া মনের জন্য মমতার সাহচর্য্যের মলম। মমতার মধ্যে যেটুকু খাপছাড়া সে শুধু তারই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। ওর জগতের অন্য যে কোন মেয়ে এভাবে তার সংস্পর্শে এলে মমতার মত হতে পারত!

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে হাকিমের রায় দেওয়ার সুরে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বেশ। কাল সুপ্রভা চাটগা যাবে। তুমিও ওর সঙ্গে যেও।'

কিন্তু বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে ধাতস্থ হয়ে কৃষ্ণেন্দু মত বদলায়। নিজেকে বড় অপদার্থ মনে হয় তার। এত দিন কেটে গেল এত কাজে, এত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল, এখনো তার এ দুর্ব্বলতা রয়ে গেছে! কবে আর তবে সে জয় করতে পারবে মনের এই দীনতা? কবে সংশোধন হবে? মন যার গড়ে উঠতে সে দেয় নি, কেন সে তার কাছে অসম্ভব প্রত্যাশা রাখে, তাকে বিদায় করে হিংস্র সমালোচকের মত? শাস্তি দিতে, ভেঙ্গে ফেলতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করে কৃষ্ণেন্দু ঘুমায়। নরেশকে যেদিন সে মেরেছিল, সেদিন রাত্রেও বিছানায় শুয়ে সে এমনিভাবেই ছটফট করেছিল।

তাই, বাস্তবের কষ্টিপাথরে নিজকে যাচাই করে নেবার সুযোগ

মমতাকে দেওয়া কৃষ্ণেন্দু উচিত বিবেচনা করল বলে, অজানা অচেনা চাটগাঁর বদলে মমতা বাস করতে এল রম্ভাদের বাড়ী। বস্তি তার চেনা, বস্তির মানুষের সঙ্গে তার কারবার ছিল। এদের সঙ্গেই তার আগে ঘনিষ্ঠতা হোক।

এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়াবাড়িই করতে চাইছিল মমতা। রাতারাতি একটা বিপ্লব না হলে তার চলছিল না—নিজের জীবনে। হীরেনকে তার বুঝিয়ে দিতে হবে তার জীবনে আপোষ নেই, জোড়াতালি সে চায় না। কৃষ্ণেন্দুর কাছেও প্রমাণ দিতে হবে প্রাসাদের চেয়ে খোলার ঘর তার প্রিয়।

'তুমি মিথ্যে ভাবছ। মিছে তর্ক তুলছ আমার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার রুচি অভ্যাসের। দেখো, সাতদিনের মধ্যে আমি ওদের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাব।'

'তা হলে তো মুস্কিল। শেষে তোমায় না ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝাতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার দরকার। গা রগড়ালে মাটি উঠবে না তো মমু?'

বাড়ীতে ঘর খালি ছিল না একটিও। সুরেশ আর নরেশকে ঘর ছেড়ে দিতে হয় মমতার জন্য। নরেশের থাকার ব্যবস্থা হয় দুর্গার ঘরে। দর্জ্জি গোপালেরও দু'খানা ঘর, তার পরিবারের মেয়েপুরুষ কজনকে চেলে নিয়ে একটা ঘরে তার দুই ছেলে আর জামাইয়ের সঙ্গে সুরেশকে থাকতে দেওয়া হবে স্থির হল। কাজ থেকে বাড়ী ফিরে খবর শুনে সুরেশ গেল চটে।

'ধুত্তেরি যতো সব—ওই শালী এসে থাকবে এখেনে, ওই বেম্মো মাগী? থাকো তোমরা—আমি বাবা চললাম।' বলে সে সুবালার ওখানে চলে গেল। দিন তিনেক সত্যই তার টিকিটি দেখা গেল না।

মমতা নিজে এসেছিল। মিষ্টি করে হেসে সুন্দর করে সবাইকে

জানিয়ে গিয়েছিল যে তাকে যেন সবাই আপন মনে করে। ভদ্রলোকদের সে ঘেন্না করে, তাই একেবারে ছোটলোক বনে গিয়ে এদের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

সে চলে যাবার পর লক্ষ্মী সকলের মনের ভাবকে প্রথমে ভাষা দিল, 'মোরা ছোট লোক!'

দুর্গা বিশদ করে বলল, 'খালি ডিঙ্গি মেরে বেড়ালে বিগড়ে যাবে না মাথা মেয়েলোকের? বাপ সোয়ামীর টাকায় মোটর চাপেন, পুরুষ চাখেন, কিচিরমিচির করেন দিনরাত। কতকাল আর ভাল লাগে বল? এমনি ঢং করতে হয় তখন।'

'মোদের তরে জীবন দেবে গো জীবন দেবে!' বলে বিন্দের বৌ।

'এখানে জীবন দিতে আসা কেন?' পুষ্প শুধোয়।

'টাকার গরম বড় গরম।' ক্ষান্ত পিসী মন্তব্য করে।

রম্ভা মোড় ঘুরিয়ে দেয় কথার।—'কি যে বল সব তোমরা? ছি ছি! বড়লোকমি দেখলে কোথা ওর, টাকার গরম? কেষ্টবাবুর শিষ্য উনি জানো না? নিজে গড়ে পিটে মানুষ করেছেন ওকে কেষ্টবাবু?'

সবই চেপে গেল তারপর, শুধু লক্ষ্মী ছাড়া।

'রাজা করেছেন।' বলল লক্ষ্মী।

ধুয়ে মুছে সাফ করে রাখা হল ঘরখানা মমতার জন্য। জিনিষপত্র সামান্যই সঙ্গে আনল মমতা। একটি বড় আর একটি মাঝারি চামড়ার স্যুটকেশ, বিছানাপত্র এবং বেতের বাস্কেটে একজনের মত সদ্য কেনা কম দামী বাটি ঘটি গেলাস কেটলি চায়ের কাপ ইত্যাদি তৈজসপত্র। আসবাব এলো না একটিও। পায়ার নীচে ইঁট দিয়ে উঁচু করা পুরানো যে তক্তাপোষটি ছিল ঘরে, তাতেই পাতা হল বিছানা। দড়ি টাঙ্গিয়ে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল কাপড় জামা গামছা। ভুল করে মমতা মস্ত ভারি তোয়ালে এনে বসেছিল, কিন্তু স্যুটকেশ থেকে সেটা বার না করে

একটা গামছা কিনে আনিয়ে ভুলটা সে সংশোধন করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। আসবাবের অভাবের দিক দিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হল মমতার। রম্ভার ঘরে, দুর্গার ঘরে, গোপালের ঘরে কাঠের আনলা আছে, দু'একটা চেয়ার আছে কাঠ আর লোহার, টেবিলও যে নেই কেরোসিন কাঠের তাও নয়।

কোথায় খাবে মমতা? কি খাবে?

রম্ভার সংসারে, তারা যা খায়।

সকালে পৌঁছেই কথাটা খোলসা করে নিল মমতা।—'শোন বলি, দুজনে আমরা ভাগাভাগি করে রাঁধব। তোমরা যা খাচ্ছ আমিও তাই খাব, বেশী কিছু আয়োজন করতে পাবে না আমার জন্যে। আমি খাব বলে যদি একটা পদও বেশী রান্না কর ভাই, ভারি রাগ করব কিন্তু বলে রাখছি।'

'কি করে জানবেন আমরা কি খাই, কি খাওয়াই আপনাকে?'

'সে আমি টের পাব। তুমি বলতে বললাম যে আমাকে?

'বলব—বলব। অভ্যেস কি সহজে কাটান যায়? কিন্তু এত কষ্ট করবেন কেন? নিজের পয়সায় খাবেন যখন, ভাল জিনিষ খাবেন। আমাদের খাওয়া আপনার সইবে কেন?'

'সইবে। যত ভাবছ, অত দুধ ঘি পোলাও খাই না আমি। শাক চচ্চড়ি খেতে জানি।'

কিন্তু আসবাবহীন সোঁদাগন্ধী আধো-আঁধার ঘরে তক্তাপোষে বিছানা পেতে দড়িতে কাপড় ঝুলিয়ে শাকচচ্চড়ি খেয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেও সকলের খাপছাড়া অভ্যর্থনা তাকে অপ্রস্তুত করে দিল। কাল এ বাড়ীতে আসামাত্র সকলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, মৃদু উত্তেজনা, হাসি মুখ আর নিরীহ সম্মানসূচক ভঙ্গি দিয়ে নীরব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল: এসেছেন? আমরা খুসী হয়েছি! আজ সে ভাবে সবাই তো এল না।

রম্ভা, দুর্গা, নরেশ, রামপাল এরা কজন মাত্র কাছে এল। চৌকাঠ ডিঙোবার সময় ভিতর থেকে কলরব কানে এসেছিল, ভিতরে ঢোকা মাত্র সে কলরব হঠাৎ গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। তার আবির্ভাব যে সবাই শুধু টের পেয়েছে তা নয়, মমতা বুঝতে পেরেছিল, সবাই রীতিমত প্রতীক্ষা করছিল কখন সে আসে! অথচ যে যার কাজেই আটকে রইল, কাছে এল না। উঠানে কলতলায় যারা ছিল তারা শুধু ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখল দু'চারবার। বাসন হাতে সামনে দিয়ে যাবার সময় বিন্দের বৌ দাঁড়ালো না, একটু হাসি দেখিয়ে চলে গেল।

পরে অবশ্য সকলেই এল, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক পরে। এক সঙ্গে নয়, একে দু'য়ে। তার অপকর্ম্মের সূচনার সময় এরা যেন দায়ভাগী হবার ভয়ে কাছে ঘেঁষেনি, নিজের দায়িত্বে তাকে আরম্ভ করার অবসর দিয়ে কর্ত্তব্য পালন করতে এসেছে,—দু'চার মিনিটের জন্য। আসে আর দু'চার কথা বলে চলে যায়। সকলের অস্বস্তিবোধ, তাকে এড়াবার চেষ্টা, মমতাকে বিস্মিত এবং আহত করে।

দুর্গা এক সময় গম্ভীর মুখে তাকে জানায়: 'এখানে আসা ঠিক হয় নি আপনার। কদ্দিন গা ঢাকা দিতে পারবেন এখেনে? পাড়ায় জানাজানি হবে, পুলিশের কানে খবর যাবে। দূর দেশে পালিয়ে যেতে পারতেন কোথাও।'

'পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছি ভেবেছ নাকি তোমরা?'

'দ্যান্ নি?' দুর্গার গলার সুরে চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'ও! তাই তোমরা ভয় পেয়েছ! কিন্তু কাল যে তোমাদের বলে গেলাম, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে এসেছি?'

'বলে তো গ্যালেন।'

রম্ভাকে মমতা বলল, 'এরা এসব কি ভাবছে রম্ভা?'

'এরা ভাবতেই পারছে না আপনি কেন এখানে এসে থাকবেন।

কাল বিন্দে পুলিশের কথাটা তুলল, সবাই ভাবল তাই হবে বুঝি তাহলে। সত্যি নয়, না ?'

উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন। সত্যি হলে যেন ভারি খুসী হয় রম্ভা!

'না না, সত্যি নয়। কি সব আজগুবি কথা! তুমি এক কাজ কর তো ভাই, সবাইকে ডাকো একবার। ভাল করে বুঝিয়ে বলি।'

রম্ভা ভেবেচিন্তে বলল, 'থাক্ না কি দরকার? যে যা ভাবছে ভাবুক। আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে দুদিনে।'

কিন্তু মমতার কি ধৈর্য্য ধরে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না তুমি ডেকে আনো ওদের।'

তবু ইতস্ততঃ করে রম্ভা।—'কি লাভ হবে বলুন? এ কথাটা বুঝিয়ে দেবেন, ওরা আরেকটা কথা ভাববে। একটা লাগসই কারণ তো থাকা চাই আপনার এখানে আসার? মিছিমিছি এমন কেউ আসে?'

'কারণ তো বলেছি সবাইকে?'

'ওটা সবাই ঠিক ধরতে পারছে না।'

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এত করে বুঝিয়ে দেবার পরেও তার এখানে আসার সহজ সরল সঙ্গত ও মহান কারণটা সবাই ধরতে পারছে না! খাপছাড়া উদ্ভট কারণ আবিষ্কারের প্রয়োজন হচ্ছে এখানে তার আবির্ভাবকে স্বীকার করতে!

'তুমিও বোধ হয় পারছ না ধরতে?'

'তা নয়, মানে আর কি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

খানিক গুম্ হয়ে থেকে মমতা বলল, 'ডাকো তো সবাইকে।'

নিজেকে ব্যাখ্যা করে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল মমতা। তাদের জন্য যে স্বামী ছেড়েছে, স্বামীর ঘর ছেড়েছে, বাড়ী ছেড়েছে, আত্মীয় বন্ধু সবাইকে ছেড়েছে, তাদের সঙ্গে সে যে এক হয়ে যেতে চায় এবং কেন চায়, সমস্তই সে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল সকলকে।

তবু, এমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকেই সবাই শুনল কথাগুলি যে তারা বুঝল কি বুঝল না এ বিষয়ে বেশ একটু খটকা রয়ে গেল মমতার মনে।

তারপর রম্ভার রান্নাঘরে গিয়ে মমতার মনটা হোঁচট খেল নোংরামিতে। ব্যথায় কনকনিয়ে উঠল মনটা। এসব বাড়ীতে সে এসেছে অনেকবার কিন্তু কারো রান্নাঘরে ঢোকে নি কোনদিন। প্রথমে মনে হল, ধোঁয়ার কালচে মারা সেঁতসেঁতে নিরন্ধ্র সঙ্কীর্ণতাটাই বুঝি চরম নোংরামি। তারপর চোখে পড়ল চলটা তোলা এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, শীতকালে পথে-পড়া ভিখিরির চামড়ার মত দেয়ালের ফাটল ধরা ফোঁড়া ওঠা গোবর-মাটির চোলকা, ধুলো তেল কালি ল্যাপটানো হাঁড়ি কলসী, তেলমসলার পাত্র রাখার আধ হাত উঁচু বেদী, জল বেরোবার নালা, ভাতের হাঁড়ি, তরকারীর ঝুড়ি, কয়লা রাখার ভাঙা কড়াই, মাকড়সা, টিকটিকি, আর্সোলা।

রম্ভা কথা কয়। মমতা ঠায় বসে থাকে পিঁড়িতে। ক্রমে ক্রমে তার চোখে ধরা পড়ে, রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে রান্নাঘরটি, যতটা সাধ্য ও সম্ভব ততটা। নোংরামি যা আছে সেটা স্বাভাবিক, কারো ক্ষমতা নেই সেটা দূর করে, কয়লা ধুয়ে কালি সাফ করার মত। বাসনগুলি মেজে ঝকঝকে করেছে রম্ভা, কিন্তু এই গর্ত্ত আর ফাটল ধরা মেঝেকে সে ধুয়ে মুছে কি করে মার্ব্বেল পাথর করবে, কি করে তাড়াবে আনাচে কানাচে নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে যে আর্সোলার দল শুঁড় নাড়ছে তাদের!

স্নানের আগে মমতা গেল পায়খানায়। ফিরে এল বিবর্ণ মৃতপ্রায় হয়ে। দশ বছর বয়সে প্রৌঢ় প্রাইভেট টিউটর ধরণীবাবু অত্যাচার করার পর যে অবস্থা হয়েছিল তেমনি দেহমন নিয়ে।

সাবান হাতে স্নান করতে গেল কলতলায়। পূরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। চোখ! চারিদিকে চোখ!

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গায়ের জোরে সায়া ব্লাউজ খুলে ফেলল। গুমোটের গরমে সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে গেছে, কিন্তু জল ঢালতে ঠিক যেন জ্বরতপ্ত গায়ের মত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার গা।

ছারপোকার কামড়ে রাত্রে তার ঘুম হল না। তক্তাপোষ আর মনের ছারপোকার কামড়ে।

সারাদিনে একজনকেও সে আপন মনে করতে পারে নি। নিজের টনটনে স্নায়ুগুলিকে স্বস্তি দিতে সে ঘরে ঘরে ঘুরেছে সারাটা দুপুর। মেয়েপুরুষের আসর বসিয়ে সন্ধ্যার পর সকলের সঙ্গে গল্প করেছে, নিজে গান গেয়ে শুনিয়েছে আর রামপালের গান শুনেছে, কথা কইবার চেষ্টা করেছে ভোঁতা অমার্জ্জিত ভাষায়, হাসবার চেষ্টা করেছে অভদ্র রকমে। ঘরে ঘরে সবাই হয়ে থেকেছে ভীত, সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ; আসরে সবাই হয়ে থেকেছে কাঠ। যদি বা দু'চার জন হেসেছে কখনো, সে হাসি হয়েছে সম্মানীয়া একজনের হাস্যকর পাগলামী দেখে ঝি-চাকর যেভাবে হাসে! আর লণ্ঠনের আলোয় সে কি বিষণ্ণ হতাশ সন্ধ্যা—বিষণ্ণতার ঘনায়মান রাত্রি! কোনমতেই মমতা শেষপর্য্যন্ত সেই গুরুভার গভীর নিরাশার ক্রমিক সঞ্চারকে ঠেকাতে পারে নি। ঝিমিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে।

আরও কি ভয়ানক শ্বাসরোধ করা ফাঁদে সে পড়েছে ত্যাখো! হার মানা মানে দাঁড়িয়ে গেছে শুধু হীরেন আর কৃষ্ণেন্দুর কছে নয় এদের কাছেও হার মানা! এদের আপন না করে এখন পালিয়ে গেলে এরা তাকে টিট্‌কারি দেবে, কোন মর্য্যাদাই আর থাকবে না তার এদের কাছে। রাতদুপুরে কি অসহায় যে নিজেকে মনে হয় মমতার! সুযোগ পেয়ে শৈশবের ভূতের ভয় পর্য্যন্ত যেন ভিড় করে আসে তাকে কাবু করতে!

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু আসে। বলে, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার মমু? ছি, কত করে তোমায় বললাম—'

মমতা উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে, 'কি বললে? দোহাই তোমার, উপদেশ দিও না। আমি জানি, তুমি আমার মন ভাঙতে এসেছো। প্রমাণ করতে এসেছ তোমার কথাই ঠিক। তা হবে না কেষ্টদা, আমায় তুমি তেমন মেয়ে পাও নি।'

'তাই দেখছি।'

'কি দেখছো? চেহারা খারাপ হয়ে গেছে একদিনে? চোখের নীচে কালি পড়েছে? আমিও আয়নায় দেখেছি নিজের চেহারা। এটুকু তো হবেই। আমি কি আরাম করতে এসেছি এখানে?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যাবার আগে কি যেন সব রম্ভা তাকে বলে চুপি চুপি। বুকটা জ্বলে যায় মমতার। রম্ভা নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুকে তার কালকের পাগলামির বর্ণনা শোনাচ্ছে।

পাগলামি? কিসের পাগলামি! এরা তো মনে করবেই এদের ভালো করার চেষ্টাকে পাগলামি, সেজন্য তার দমে গেলে তো চলবে না! অন্ধকারের বঞ্চিত জীব এরা, এরা কি করে প্রত্যাশা করবে যে আলোর জগৎ থেকে কেউ তাদের এই নরকে নেমে আসতে পারে তাদের আলো দেবার জন্য। চোখ এদের ঝলসে গেছে, এরা চমকে গেছে, ভড়কে গেছে, ভয় পেয়েছে, অবিশ্বাস করছে।

'কদিন তুমি এসো না কেষ্টদা। আমি না ডাকলে এসো না।'

'বেশ।'

আহত ও ব্যাহত একগুঁয়ে জেদি অভিমানী মানুষের উদ্দীপ্ত উদ্যমে মমতা আবার লড়াই সুরু করে। নতুন ভাবে। মনে হয় তার আত্মবিশ্বাসে যেন জোয়ার এসেছে নতুন করে। সোজাসুজি আপন করা আর আপন হওয়ার স্পষ্ট মুখর অনাবৃত চেষ্টা সে ছেড়ে দেয়।

ভাবে যে কাজের মধ্যে এদের কাছে টানতে হবে, এদের ভালো করার চেষ্টা দিয়ে, সংস্কার ও সংশোধনের সাহায্যে। এখানকার জীবনটা সইয়ে নেবার পক্ষে তার নিজেরও তাতে সাহায্য হবে।

চোখ মেলে তাকায় মমতা আর চারিদিকে ছোটবড় অসংখ্য ত্রুটি চোখে পড়ে, কথার, কাজের, ব্যবহারের, স্বভাবের, জ্ঞানের, বুদ্ধির, চিন্তার, ধারণার, ভাবের, অনুভূতির—সব কিছুর খুঁত! তার খাতিরে একটা দুটো দিন সকলে সংযত হয়ে থাকে, অত্যন্ত রূঢ় ও স্থূল স্বরূপগুলির প্রকাশ চেপে রাখে কোনমতে, কিন্তু তারপর আর ধৈর্য্য থাকে না কারো। কতদিন থাকবে মমতা তারো তো ঠিক নেই, তার মুখ চেয়ে কাঁহাতক মানুষ স্বভাব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভদ্রভাবে চলতে পারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য? ঝগড়া, গালাগালি, হীনতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি, মাতলামি সব একে একে আবির্ভূত হতে থাকে সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত অন্তর্দ্ধানের প্রয়োজন শেষ করে, সঙ্কোচের বাধা ঠেলে।

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুঝতে পারে, মাঝে মাঝে এসে আর মাঝে মাঝে কাছে ডেকে যাদের সে চিনত, এরা তারা নয়। ধরা এরা তার কাছে কোনদিন দেয় নি। নিজে সে যে পরিচয় নির্দ্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছে এদের জন্য, এরা নির্ব্বিবাদে সেই পরিচয়ই গ্রহণ করেছে তার কাছে পরিচিত হবার জন্য! বাছা বাছা দুঃখের কথ বলেছে, নিরীহ ভীরু হয়ে থেকেছে, সায় দিয়ে গেছে তার কথায় ও ইচ্ছায়। এদের সে যেমন ভাবতে চেয়েছিল এরা তাকে তেমনি ভাবতে দিয়েছে। কখনো প্রতিবাদ করে নি। নিজেদের আসল জীবন থেকে এমন একটি টুকরোও তার সামনে উপস্থিত করে নি, তার ধারণার সঙ্গে যা খাপ খায় না। কত কথাই এদের মত শত শত মেয়ে-পুরুষ বলেছে তার কাছে, তবু কেন যে কোনদিন কেউ নিজেকে চিনিয়ে দেবার জন্য একটি কথাও বলে নি, সেটাও মমতা এখন বুঝতে

পারে। এরা জানে না পরিচয় দিতে। এরা জানে না পরিচয় দেবার প্রয়োজন। এরা মানেই জানে না পরিচয় দেবার। এরা জানেও না নিজেদের পরিচয় কি!

কি সে ভেবেছিল এদের! বঞ্চিত নিপীড়িত দুঃখী ও নিরীহ একদল মানুষ, ধুঁকতে ধুঁকতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে প্রাণহীন ভোঁতা শূন্য জীবন যাপন করে। আঘাত পেলে কাঁদে, দু'হাত শূন্যে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে বলে, ভগবান!—আবার ঝিমিয়ে যায়। অথচ চোখের সামনে আজ সে দেখেছে এদেরই একটানা বিস্ফোরণের মত সংশয়হীন প্রাণপূর্ণ প্রচণ্ড সংঘাতময় আত্মঘাতী জীবনের লীলা।

পাড়ার কয়েকটি বাড়ী ঘুরে এসে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। আগে যেমন জানত তেমনি যেন হয়ে গেল ওসব বাড়ীর মানুষগুলি তার সামনে, জীবনটা তাদের চলে গেল নেপথ্যে—অন্য জগতের অপরিচিত মানুষের সামনে রুগ্ন শিশুর যেমন যায়।

মমতার মনে হল, এদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে গেছে—অনেক দূরে চলে গেছে এরা। ব্যবধান অবশ্য যা থাকবার তা ছিলই—মমতার কাছে সেটা ধরা পড়ছে মাত্র। কিন্তু সেজন্য বিব্রত বা বিচলিত হওয়ার বদলে সে যেন খুসীই হল ভেবে চিন্তে। একটা গুরুতর সত্য সে আবিষ্কার করেছে, কৃষ্ণেন্দুও হয় তো যার হদিস পায় নি। সে উৎসাহ বোধ করে। কোমর বেঁধে উঠে পড়ে কাজে লেগে যায়। বলে, 'না। কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া চলবে না। ঝগড়া করে লাভ কি বলো? জলের পরিমাণ কি তাতে বাড়বে? সবারি জল চাই—সবাই যাতে জল পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এক বাড়ীতে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হলে কি কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে

এই নিয়ে ঝগড়া করা চলে? তুমি তো দু'কলসী নিয়েছ কান্ত পিসী, এবার রাণীর মাকে দু'কলসী নিতে দাও। গোপাল তুমি পুরুষ হয়ে ঝগড়া করতে এসেছ মেয়েদের সঙ্গে? তোমাদের বেশী জল দরকার তা জানি। আমি আজ হিসেব করে নিয়ম বেঁধে দেব, কার পর কে নেবে, কতটা করে নেবে। দু'তিন দফায় জল নিতে হবে তোমাদের। একজন হাড়ি কলসী বালতি সব ভর্ত্তি করবে আর আরেকজনের জলের জন্য রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে থাকবে, সেটা তো ভাল নয়।'

গোপালের বৌ বলে, 'ওতে কি টানাটানি কমবে দিদিমণি? সবার কুলোয় না জলে। ক'বাঁক জল যদি আনিয়ে ন্যান মালীকে দিয়ে রাস্তার কল থেকে—'

'বেশ তো। সবাই মিলে চাঁদা তুলে—'

'চাঁদা? এর জন্যে আবার চাঁদা?' রাণীর মা তোয়াজের হাসি হেসে বলে, 'দুটো কি তিনটে টাকা তো নেবে মালী। ঘরে আপনার লাখ টাকা পচছে, দুটো তিনটে টাকার জন্যে চাঁদা তুলবেন কি বলছেন, মাগো মা হাসির কথা!'

সুযোগ পেয়ে মমতা তাদের দশ কথা শুনিয়ে দেয়। ভাল ভাল কথা, খাঁটি উপদেশ। নিজেদের উপর নির্ভর না করে পরের ভরসায় থাকলে তাদের যে কোনদিন কিছু হবে না এই বিষয়ে উপদেশ।

'জল আনার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা নিজেরা মিলে মিশে ব্যবস্থাটা করে নিলেই আমি খুশি হতাম।'

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন ওঠে চারিদিকে।

'ও বাবা, কাজ নেই জলে মোদের, খুসী মনে না দিলে।'

'তিনটে টাকার জন্য এত!'

'এতকাল চলে নি মোদের? মিলেমিশে চালাইনি মোরা?'

মমতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তোমরা রাগ করছ কেন? কথা বুঝছ না

কেন আমার? তোমাদের কি এই একটা অভাব? এটা মিটলেই সব দুঃখদুর্দ্দশা শেষ হয়ে যাবে? সবাই মিলে না করলে দুঃখ তোমাদের কোনদিন ঘুচবে না। কিসে মিলবে তোমরা? এই সব অভাবের প্রতিকার চেয়ে কাজ করার তাগিদেই মিল হবে তোমাদের। প্রথমে এ বাড়ীর সবাই মিলবে, তারপর পাড়ার সবাই, তারপর দেশ জুড়ে। তখন কে ঠেকাবে তোমাদের? এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদের। আবোল তাবোল কথা মনে আসছে কেন তোমাদের?'

'মনটাই যে মোদের আবোল তাবোল গো দিদিমণি!' বলে লক্ষ্মী হাসে।

পরদিন ভোরে উঠে মমতা খালধারে একটু বেড়াতে গেছে, ফিরে এসে ছাখে, কলতলায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। তার তালিকা অনুসারে প্রথম দফায় প্রয়োজন মত প্রত্যেক পরিবারের এক থেকে তিন বালতি বা কলসী জল পাবার কথা। গোপালের বৌ বিরাট একটি বালতি এনেছে কোথা থেকে, রাণীর মা এনেছে তার চাল রাখার মাটির জালাটি! এই হল ঝগড়ার একটা কারণ। আরেকটি কারণ হয়েছে শিউশরণ। বিতরণের প্রথাটা কাল মেনে নিলেও আজ সে গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। লোক কম হলেই জল কম লাগবে কেন তার মানে সে বোঝে না। লোক কম বলে ঘরের ভাড়া কি কম নেওয়া হয় তার কাছে? গোড়ায় বেশী তেজ দেখায় নি শিউশরণ, জগদম্বা আর পুষ্প তার পক্ষ নেওয়ার পর সে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠেছে।

দু'বাঁক জল দিয়েই মালী চলে গেছে, আর সে জল দিতে পারবে না। চার টিন জলের মধ্যে রম্ভা আর দুর্গা নিয়েছিল দু'টিন, গোপালের বৌ নিয়েছিল দেড় টিন। অন্যেরা আড় চোখে দেখেছিল চেয়ে চেয়ে। আধ টিন জল নিয়ে মালী যেই গেছে বিন্দের ঘরের দিকে, সে কি রাগ আর গালাগালি বিন্দের! টিন উল্টে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে সে

বলেছে, 'যা যা ওদের দিগে যা। দিদিমণির পেয়ারের লোককে দিগে যা। ওখানে টিন টিন জল দিয়ে দু'ঘটি জল নিয়ে কুলকুচো করাতে এসেছো ব্যাটাচ্ছেলে? ফের জল দিতে এসে অপমান করবি তো মাথা ফাটিয়ে দেব তোর।'

বিবরণ শুনে কথা সরে না মমতার মুখে, সে থ' বনে যায়। মনে মনে বলে; এরা শিশু না সয়তান? অ্যাঁ, শিশু না সয়তান এরা?

মমতা বলে, 'রোজ সন্ধ্যার পর আমি তোমাদের একঘণ্টা করে বই পড়ে শোনাব। সকলে হাজির থাকবে কিন্তু।'

প্রথম দিন প্রায় সকলেই হাজির থাকে। বেশ উৎসাহ দেখা যায় সকলের। রামপালের কীর্ত্তন শোনার মত উৎসুক মনে হয় সকলকে। পরদিন আসর প্রায় খালি পড়ে থাকে, রম্ভা দুর্গা পরেশ নরেশ আর লক্ষ্মী ছাড়া কেউ আসে না মমতার মূল্যবান পড়া শুনতে। ডাকতে গেলে বলে, 'আসছি, দিদিমণি আসছি।' কিন্তু আসে না।

মমতা বলে, 'তোমরা এত বোকা কেন? এক বাড়ীতে এতগুলি উনুন জ্বলে, কত পয়সা নষ্ট হয়। এতগুলি হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ হয়, মিছিমিছি কত বেশী খাটুনি। সবাই মিলে একসাথে রান্নার ব্যবস্থা করলে কত পয়সা আর পরিশ্রম বাঁচে বল দিকি? আচমকা এটা করা যাবে না জানি। কটা দিন যাক, আমি সব ঠিক করে দেব। এ ব্যবস্থা করে তবে আমি নড়ব এখান থেকে।'

শুনে আশঙ্কায় সকলের মুখ লম্বা হয়ে যায়।

এমনি কত কথাই যে বলে মমতা, কত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টাই সে যে করে!

সমষ্টিগত জীবনেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও। সর্ব্বদা সে যেন ওৎ পেতে থাকে কখন কে কি অন্যায় করেছে, কার কি ভুল হচ্ছে।

কদর্য্যতা আর বীভৎসতা যত অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে, তত সে মরিয়া হয়ে মেতে যাচ্ছে এই সব হতভাগা হতভাগিনীদের জীবনের আবর্জ্জনা সাফ করার কাজে। এদের কিছু করলে তবে তো তার মুক্তি, তবে তো সে এখান থেকে চলে গিয়েও বলতে পারবে, দেখলে তো পালিয়ে আসিনি, আমি এই করেছি আর ওই করেছি ওদের জন্য। তার জন্য তাই এখানে কেউ সাধ মিটিয়ে অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করতে পারে না, প্রাণ কেঁদে ওঠে সকলের সেই অনুচ্চারিত শব্দ-গ্যাসে। ছেলে মেয়েকে মারতে পারে না, গা চুলকোতে পারে না, পিক ফেলতে পারে না, খোস প্যাঁচড়ায় ওষুধ না মাখিয়ে রেহাই পায় না, রান্নায় ঝালমশলার স্বাদ পায় না, মুখরোচক অখাদ্য খাওয়া হয় না, নেশা করা যায় না, আরও কত কি।

তাছাড়া, সবাই টের পেয়েছে এতটুকু উপকার পাবার ভরসা তার কাছে নেই। একে একে কয়েকজন নানাভাবে দুঃখ ও প্রয়োজন জানিয়ে টাকা চেয়ে গেছে তার কাছে। টাকা দিয়ে কারো উপকার করতে মমতা অস্বীকার করেছে। বলেছে, 'আমার কি টাকা আছে যে দেব? আমি যে তোমাদের মত গরীব।'

তাছাড়া, তার কথা শুনে মেয়েরা কিছু অবাধ্য হতে শেখায় আর মেয়েদের উচিতমত শাসন করতে না পারায় পুরুষরা বিরক্ত হয়েছে। মেয়েরা বিরক্ত হয়েছে পুরুষদের এক একজনের সঙ্গে যখন তখন একা একা সে গুজগাজ ফিসফাস করে বলে।

কয়েকদিনের মধ্যে তাই চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা তুলতে আরম্ভ করে। কেবল কথা না শোনার বিদ্রোহ নয়, ঝাঁঝালো আক্রমণ। হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর বিদ্বেষ গুমরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দ্বিধা ভয় সঙ্কোচের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সুরু করে। মমতা চমকে উঠে দিশেহারা হয়ে যায়।

বিন্দের বৌ দশমাস পোয়াতি। বিন্দের বৌকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করে মমতা, লজ্জায় কাঠ হয়ে জবাব দেয় বিন্দের বৌ, মানে বুঝতে পারে না তার প্রশ্নের; মনে মনে ভাবে যে পাগল নাকি মানুষটা? তারপর মমতা লাগে বিন্দের পিছনে। তাকে বোঝায় যে, বৌকে তার এখন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, নয় তো ভিন্ন শোয়া উচিত তাদের। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই বিন্দের? সে কি পশু? বিন্দের কাছে ব্যাপার শুনে বিন্দের বৌ বোঝাপাড়া করতে আসে।

বলে, 'কত আর ঢং করবে দিদি? ঢং দেখে বাঁচিনে তোমার।' তুমিই তাকে বলে বিন্দের বৌ। এখানে এসে অনেক চেষ্টা করেও 'মমতা' কাউকে তুমি বলাতে পারে নি, আজ বিন্দের বৌ নিজে থেকেই অন্তরঙ্গ সম্বোধনটা ব্যবহার করে। 'গড় করি তোমার পায়ে দিদি, ধম্মো দেখালে বটে মেয়ে মানষের। একসাথে শুই বা না শুই তোমার তাতে কি শুনি? মতলব বুঝিনে তোমার আমি? সে গুড়ে বালি তোমার দিদি, ওদিকে নজর দিও না। বাপের বাড়ী যাই তো ওকে সাথে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে যাব, তোমার খপ্পরে রেখে যাব ভেবো না। নিজের সোয়ামী ছেড়ে পরের সোয়ামী নিয়ে টানাটানি, দড়ি জোটে না গলায়?...'

সৈরভীকে তার স্বামী মারে। কোনদিন সোহাগ করে, কোনদিন মারে। কোনদিন সোহাগ করে মারে, কোনদিন মেরেও সোহাগ করে। একরাত্রে সে কব্‌জী আর কনুই ধরে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করেছে সৈরভীর হাত, সৈরভী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে 'বাবাগো, মাগো, মেরে ফেল্লে গো,' বাড়ীর লোক কেউ শুনছে কেউ শুনছে না, কেউ হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে—মমতার মাথাটা গেল বিগড়ে।

রামপালকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়ে সৈরভীর ঘরের দরজা খোলাল। রঙ্গমঞ্চের রাণীর মত জিজ্ঞেস করল, 'তোমায় মারছিল সৈরভী?'

হাতের অসহ্য যন্ত্রণায় সৈরভীর মাথাটাও তখন বিগড়ে গেছে। সে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'একেবারে মেরে ফেলেছে দিদিমণি, মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে হাতটা।'

এতকাল মমতা শুধু গুজব শুনেছে যে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে মারে। সর্ব্বাঙ্গ তার ঝিম ঝিম করছিল, প্রাণে উথলে উঠছিল ফুটন্ত প্রতিহিংসা, হীরেনকে আঘাত করতে হবে। রামপালকে সে হুকুম দিল, 'ওর হাতটা মুচড়ে দাও তো রামপাল। জোরে মুচড়ে দাও।' রম্ভা রামপালের গেঞ্জি ধরে টেনে রেখে বলল, 'আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে দিদিমণি? তুমি এর মধ্যে যেও না।'

রামপালের তখন চড়া নেশার অবস্থা। গুমোটের গরমে শুতে গিয়ে মমতা গায়ে জামা রাখে নি। শুধু শাড়ীর আঁচলা সে ভাল করে জড়াতেও জানে না গায়ে। বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত চোখে রামপাল তার অর্দ্ধ অনাবৃত পিঠ আর বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মমতা প্রায় আর্ত্তনাদ করে ওঠে: 'ওর হাতটা মুচড়ে দিলে না রামপাল? কথা শুনতে পাও না?'

বাঁ হাতে রামপাল একটু ঠেলে দেয় রম্ভাকে, রম্ভা পাঁচ হাত পিছু হটে যায়। এগিয়ে গিয়ে রামপাল সৈরভীর স্বামীর হাতটা ধরে মুচড়ে দেয়। মট করে হাতটা ভেঙ্গে যায়। হাঙ্গামার হদিশ পেয়ে অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে জমা হয়েছিল দুয়ারের কাছে। সৈরভীর স্বামীর হাত ভাঙ্গার শব্দটা শুনতে পায় সকলেই।

স্বামীর গগনভেদী আর্ত্তনাদে বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসে সৈরভীর। বোধ হয় তার মনে পড়ে যায় যে এই লোকটা তাকে খাওয়ায় পরায়—ভাল রোজগার করে, ভাল খাওয়ায় পরায়, সোহাগ করে, ভালবাসে—কষ্টের মাঝে শুধু একটু মারে। ঝড়ের মত ছুটে এসে স্বেচ্ছায় সে মমতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কামড় বসায়

রামপালের হাতে। তারপর আরম্ভ করে আহত স্বামীকে বুকে আগলে নিয়ে হৈ চৈ হা-হুতাশ। মেঝে থেকে উঠতে উঠতে তাদের দুজনকে এভাবে একান্ত কাছাকাছি দেখে মমতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে গোপাল ভাঁড়ীয় কমিকে পরিণত হয়ে যায়। লম্বা চওড়া স্থূলকায়া সৈরভীর পাশে এমন বেঁটে রোগা ক্ষীণকায় দেখায় তার স্বামীকে!

হাঙ্গামা মিটতে রাত আড়াইটে বেজে গেল। হাঙ্গামা কি কম। ডাক্তার এনে সৈরভীর স্বামীর ভাঙ্গা হাড় সেট করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কত টাকা পেলে সৈরভী আর তার স্বামী মেনে নেবে আজ রাতে কিছুই ঘটেনি সেটা স্থির করা, উত্তেজনা কমিয়ে হৈ চৈ থামিয়ে সকলের ঘরে যাওয়া—বড় বড় গুরুতর সব ব্যাপারের জের।

এ পর্য্যন্ত রম্ভা উপস্থিত থাকে, হাঙ্গামা মেটাতে সাহায্যও করে। তারপর হেঁটমাথা মমতাকে বলে, 'কাল আপনি চলে যাবেন এখান থেকে।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই সে গট গট করে চলে যায়।

তক্তাপোষে মাথা হেঁট করে বসে থাকে মমতা। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রামপাল। ইতিমধ্যে গণ্ডগোলের ফাঁকে শ্রীপদর সঙ্গে সে আরও খানিকটা দেশী মদ খেয়েছে।

'শোবে যাও রামপাল।'

'যাই।'

বলে মমতাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রামপাল তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। সৈরভীর চেয়েও উঁচুগ্রামের তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা চিরে যায়। রাগ করে চলে গেলেও রম্ভা শোয় নি, দুয়ারের

বাইরেই ছিল। বিয়ের পর আজ দ্বিতীয়বার রামপাল মদ খেয়েছে। মাতাল রামপালকে ভগবানের নামে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ভরসা তার ছিল না।

'খাটাসের মত চেঁচিও না দিদিমণি।' মমতাকেই রম্ভা ভৎ'সনা করে। তার গলার আওয়াজেই শিথিল হয়ে যায় রামপালের আলিঙ্গন। মমতাকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে গিয়ে টলে পড়বার উপক্রম করে মমতার কাঁধ ধরে সে সামলে নেয়। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে রম্ভা ফিরে আসে।

সে বোঝাপড়া করতে এসেছে ভেবে মমতা বলে, 'এই নিয়ে তুমি রামপালের ওপর রাগ কোরো না রম্ভা। ওর মাথাটা নিশ্চয় হঠাৎ—'

'ও আবার কি দোষ করল?'

মমতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।—'তুমি তবে রাগ করনি রম্ভা?'

'রাগ যদি করি আপনার ওপর করব, ওর ওপর করব কেন?'

'ও! তুমি তাই ভাবছ?'

রম্ভা একটু চুপ করে থাকে।

'দিদিমণি, আপনার মোটে কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওদের কাছে আপনি হলেন আকাশের পরী, রূপকথার রাজকন্যে। এমনিতে কি ওরা ভাবতেও পারে আপনার হাতটি ধরার কথা? কিন্তু আপনি যদি এসে গায়ে পড়ে যা তা সুরু করে দ্যান, মাথা ঘুরে যাবে না ওদের? ও আজ মদ খেয়েছে আপনার জন্যে। কদিন থেকে অস্থির চঞ্চল হয়ে ছিল, শ্রীপদ খাওয়াতে চাইলে না বলতে পারে নি। বাড়ীর সবাই জানে, আপনার মাথায় ছিট আছে। ভদ্রলোক আপনার রোচে না, মনের মত পুরুষ খুঁজতে আপনি এখানে এসেছেন, ওকে আপনার পছন্দ হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এত কি হাসি মসকরা আপনার?'

'হাসি মস্করা? আমি কারখানার কথা আলোচনা করেছি।'

মমতার সকাতর ভাব দেখে রম্ভা হেসে ফেলে।—'তা জানি। আপনার মন জানতে বাকী আছে আমার? বড় বোকা আপনি। আপনার মনে কি আছে এখানে কে জানতে যাবে? এরা দেখবে আপনার ব্যাভার। কোন পুরুষের সঙ্গে ওভাবে কখনো দেখেছেন আমাদের কাউকে মিশতে? পাঁচ সাত জনের সামনে করলেই হত আলোচনা!'

রম্ভা ঘরে গেল। ধুক ধুক বুক বেজে রাত্রি কাটল মমতার। সকালে যখন সূর্য্য উঠবে, সবাই জাগল, তখনও সে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে রইল।

ঘুম ভাঙল শান্ত, শুব্ধ মন নিয়ে। সব কাজ, সব উদ্যম, সবরকম নড়াচড়া আর চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে গভীর বিতৃষ্ণা। আলস্যই শান্তি, আলস্যই জীবন—নিশ্চিন্ত মনে গা ঢেলে দেওয়া। শুয়ে থাকার আরাম কি নিবিড়!

মেঝেতে মাদুরে বসে কৃষ্ণেন্দু কথা বলছিল রম্ভার সঙ্গে। রম্ভা তাকে খবর দিয়ে ডেকে এনেছে।

রম্ভা বলল মমতাকে, 'আপনার সাহস আছে। কত কাণ্ডের পর দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়েছেন? জ্বরের রুগীর মত দেখাচ্ছে আপনাকে। বসুন, চা আনি। চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।'

রম্ভা বেরিয়ে গেলে বিনা ভূমিকায় কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তোমায় তো যেতে হবে রম্ভা এখান থেকে।'

'যেতে হবেই?'

'তাই মনে হচ্ছে! এরা কেউ চায় না তুমি এখানে থাকো। সবাইকে এমন চটালে কি করে বল তো?'

'আমি সত্যি অপদার্থ কেষ্টদা।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওসব বিচার করব আমি। আমার ওখানেই যাই চলো ?'

'চলো।'

দুজনকে চা এনে দিয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু নীরবে মাথা হেলাতে সে যেন স্বস্তি বোধ করল স্পষ্ট। বোঝা গেল, তার মনে আশঙ্কা ছিল জিদের বশে মমতা হয় তো এখান থেকে নড়তে রাজী নাও হতে পারে। একবার ফুঁসিয়ে উঠেই আবার নির্জ্জীব হয়ে গেল মমতার মনটা।

রম্ভা বলল, 'ও তোমায় বলতে বলে গেছে দিদিমণি, নিজে গিয়ে মাপ চেয়ে আসবে তোমার কাছে। কাজে যেতে হল কিনা, নইলে আজকেই মাপ চেয়ে যেত।'

মমতা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তোমার কাছে মাপ চেয়েছে তো ?'

'শুধু মাপ চাইবে ? প্রাচিত্তির করবে।' রম্ভাও হেসে জবাব দিল।

বস্তি এলাকা পার হয়ে তাদের গাড়ি বড় রাস্তার গাড়ির ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে মমতা বলে, 'ব্যাপারটা রম্ভা এত সহজ ভাবে কি করে নিল ভেবে পাই না। ভান করছিল নিশ্চয়।'

'ভান করবে কেন ? আমাদের দেখাতে যে ওর মনটা খুব উদার ? না, আমাদের খাতির করতে ?'

'তুমি কি তবে বলতে চাও এই নিয়ে ওদের ঝগড়া হবে না ? অশান্তি সৃষ্টি হবে না ?'

'ঝগড়া হতে পারে, অশান্তি সৃষ্টি হবে না। ওরা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে ব্যবহারের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করে। ওর কাছে রামপালের আচরণটা শুধু অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেলেছে, আর কিছু নয়। এর মধ্যে আর কোন জটিলতা নেই ওর কাছে।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন তার দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রে বাড়ি ফিরে স্নান করে সে খেতে বসলে মমতা সামনে বসল, শিষ্যার মত অনুগত ভাবে। এবার কি করা যায়। তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। কোন কাজের যোগ্যতাই তার নেই। সারাদিন ভেবেও সে আবিষ্কার করতে পারেনি পৃথিবীতে কি দরকারে সে লাগতে পারে।

কৃষ্ণেন্দু তাকে ভরসা দেয়।

'আমি তোমাকে কাজ দেব। জগতে কাজের অভাব আছে? অত হতাশ হয়ো না। নিজেকে অপদার্থ মনে করার কোন কারণ ঘটে নি। একটা প্রবাদ আছে জানো তো, যার কাজ তারে সাজে অন্যে করলে লাঠি বাজে? যে কাজ তোমার নয়, তাই তুমি করতে গিয়েছিলে, লাঠিও বেজেছে। বলা যায়, তুমি ভুল করেছ। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না কোন কাজের যোগ্যতা তোমার নেই। মন খারাপ কোরো না। কত বড় একটা অভিজ্ঞতা হল বল দিকি? তার দাম কি কম?'

'কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেছে সব বিষয়ে। যেরকম ভেবেছিলাম কিছুই যেন সেরকম হল না। হীরেনের জন্যও তো সে রকম মন খারাপ হল না? এটা অদ্ভুত ঠেকছে কেষ্টদা, সবই কি ফাঁকি আমার মধ্যে?'

'বিষাদ জমজমাট হয় নি, না? কি করে হবে বলো? বিরহ বেদনাকেও জোরালো করতে হলে কালচার করা দরকার হয়। রীতিমতো সাধনার ব্যাপার। তোমারও হত, কিন্তু তুমি তো মোটে সুযোগ দিলে না। নিজেকে নিয়ে আড়ালে সরে যেতে, একলাটি নিজের মনে শুধু ভাবতে যে বিচ্ছেদ যখন হয়েছে একজনের সঙ্গে আর বাঁচা কেন, দেখতে বিরহ কেমন চড় চড় করে চড়ে যায়, কি অসহ্য হতে পারে বিরহ।'

'ভালবাসা, বিরহ এসব তবে মনের বিকার তোমার কাছে ? প্রশ্রয় দিলে বাড়ে, নইলে নির্জ্জীব হয়ে থাকে ?'

'পাগল, ভালবাসাকে বিকার ভাবতে পারি, ভালবাসার ক্ষমতাই যখন মানসিক সুস্থতার সব চেয়ে বড় লক্ষণ ? কিন্তু ভালবাসাও তো মনেরি ধর্ম্ম। অনুশীলনের নিয়মটা ভালবাসার বেলাতেও বাদ পড়ে না, বিরহের বেলাতেও নয়।'

'কিন্তু আর একটা মুস্কিল হয়েছে। বিরহের অভাবটা নয় বুঝলাম। কিন্তু বিতৃষ্ণা ? বিরহ না হলে কি বিতৃষ্ণা হয় ? ওর কাছে ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। ভাবতেও এমন বিশ্রী লাগছে !'

কৃষ্ণেন্দু ভাতের গরাস মুখে তুলছিল, নামিয়ে রাখল।

মমতা হাই তুলে বলল, 'আরও শুনবে ? আরিফের জন্য আমার মন কেমন করছে।'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নীচু করে খেয়ে যায়। তাদের এখন আর মোটেই গুরু ও শিষ্যার মত মনে হয় না।

'কেন মন কেমন করছে জানি না। কিছুই বলার নেই ?'

'না।'

'ভাবনার কথা কিন্তু। ভালবেসে বিয়ে করা স্বামীর জন্যে বিতৃষ্ণা, ভাল না বেসে বিয়ে না করা বন্ধুর জন্য মন কেমন করা। ব্যাপারটা বোঝা দরকার।'

'কি হবে বুঝে ?'

'আগে তো বুঝি, তারপর ওটা বিবেচনা করা যাবে। হীরেনকে একটা খবর দেবে, আমায় এসে নিয়ে যাবার জন্যে ? বলে দিও এসে একটু যেন সাধাসাধি করে।'

পুতুল এসে বসে কৃষ্ণেন্দুর কাছে। মমতা হাত বাড়িয়ে দেয়। পুতুল সরে যায় কৃষ্ণেন্দুর আরও গা ঘেঁষে।

'পুতুলও চায় না আমাকে।'

'মন খারাপ কোরো না মমু। এসব মুডকে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

মমতা শুনতে পায় না। বলে, 'উঃ, আমি কি অসুখী কেষ্টদা আমি যদি রম্ভা হতাম!'

মাসখানেক পরে একদিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে মমতাকে জানাল, রম্ভা তাকে সন্ধ্যার পর সিন্নী খাবার নেমন্তন্ন করেছে।

'রম্ভা নেমন্তন্ন করেছে, না তুমি রম্ভাকে দিয়ে করিয়েছ?'

'রম্ভাই করেছে। তবে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল তোমায় বলা উচিত হবে কিনা, তুমি রাগ করবে কি না।'

'আমায় নেবে সঙ্গে? তোমার অজ্ঞাতবাসের জায়গাটি দেখে আসব।' হীরেন বলল।

'তুমি যাবে? সবাই অবাক হয়ে যাবে তোমায় দেখে!' মমতা বলল উৎসাহিত হয়ে।

সন্ধ্যার পর তারা পৌছল। গানের আসর বসেছিল কিন্তু গান আরম্ভ করা হয়নি, এদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। হীরেনকে দেখে চোখের পলকে আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে শুধু অবাক নয় একেবারে যেন হয়ে গেল হতভম্ব।

দাওয়ায় তাদের জন্য বসবার বিশেষ ব্যবস্থা করা ছিল। রম্ভা তাদের সিন্নী আর ফল এনে দিল। তারপর সুরু হল রামপালের গান।

রামপাল আজ স্বদেশী গান ধরেছে।

কৃষ্ণেন্দু চেয়ে দেখল, হাসি আর গর্ব্ব মুখে ফুটিয়ে রামপালের দিকে তাকিয়ে রম্ভা গান শুনছে।

দুটি গানের পর কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল, বলল, 'কাছেই একটা কাজ আছে, সেরে আসছি এক্ষুনি।'

হীরেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বলল, 'চল, আমিও যাব।'

দু'জনে যখন রাস্তায় পৌঁছল, অধিকাংশ গেরস্থ বাড়ী আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেতরের দিকে গলির ডাইনে বাঁয়ে এবং দু'পাশের সরু সরু শাখা-গলির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর অনেক রূপজীবিনী বাস করে। এই বাড়ীগুলি এখনো পুরোদস্তুর সজাগ। মানুষের আসা যাওয়ার বিরাম এখনো হয় নি, গানবাজনা চেঁচামেচিতে খোলার ঘরগুলি হুল্লোড়িত হয়ে আছে। গলির মোড়ে পথের ধারে এবং বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে অনেক স্ত্রীলোক এখনো প্রতীক্ষা করছে। বেচাকেনা চলছে পান বিড়ি আর ডিম মাংসের দোকানে। পুলিশ মন্থর পদে হাঁটছে, টুংটাং শব্দে রিক্সা আনাগোনা করছে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চোখে পড়ছে অনেক।

'এসব মেয়ের অনেকের স্বামী আছে জানিস হীরেন? স্বামীপুত্র নিয়ে রীতিমত ঘর সংসার করে। স্বামীর উপার্জ্জনে চলে না, স্ত্রীও তাই এভাবে কিছু উপায় করে। সন্ধ্যার পর রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, কেউ এলে দরদস্তর ক'রে ঘরে নিয়ে যায়, স্বামী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করে। হয়তো ঘরের সামনেই বারান্দায় বসে বিড়ি টানে, ছেলেমেয়ে সামলায়। ভাবতে পারিস, চোখের সামনে আরেকজন পুরুষ স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল?'

'পারি। এরা তো অশিক্ষিত ছোটলোক, আমায় একজন নিজে ডেকে নিয়ে আদর করে ঘরে বসিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক, পাড়ায় মানসম্ভ্রম আছে, মোটামুটি উপার্জ্জনও আছে। বাপ মেয়েকে, ভাই বোনকে, স্বামী স্ত্রীকে ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগার করে, সংসারে এটা তোর এই পাড়ায় প্রথম ঘটছে না।'

'ওসব ভদ্র পাষণ্ডের কথা বলি নি। এ পাড়ায় অশিক্ষিত ছোট

লোকের মধ্যেও ওরকম মানুষ আছে। আমি যাদের কথা বল্‌ছি, তারা আলাদা জাতের লোক, নিরীহ, শান্ত, ভালোমানুষ। কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলে এরা খুসী থাকে, টাকার জন্য পাপ করার তাগিদ এদের মধ্যে নেই। আমি কয়েকজনকে জানি, বিয়ের পর কয়েকবছর এভাবে টাকা রোজগারের কথা স্বামী-স্ত্রী কল্পনাও করতে পারত না। দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হবার পর যখন আর উপায় রইল না তখন বাধ্য হয়ে এই পথ নিল। এদের প্রবৃত্তি নীড় বাঁধবার, ভাঙ্গবার নয়। শুধু ঘর গেরস্থালি বজায় রাখবার জন্য এসব মেয়ে পাপ করে, স্বামী মুখ বুজে থাকে। এতবড় পাপ হজম করে সুখে শান্তিতে সংসার করার সাধ্য তোমার আমার নেই, ওদের সয়ে যায়, গরীব কিনা। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এইটুকু। ওই দিকটা বাদ দিয়ে এদের ছাখো, অবিকল আর দশটি গরীব গৃহস্থের মত জীবন কাটাচ্ছে, না জানা থাকলে দেখে কিছু টেরও পাবে না। স্বামী বাজার করছে, ঘরের কাজে সাহায্য করছে, কাজে যাচ্ছে, বৌ রান্না করছে, বাসন মাজছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, স্নেহমমতা মান অভিমানের পালা চলছে, সব একরকম। ঘরকন্নাকে বড় করে পাপকে ছোট করে নিয়েছে বলেই বোধ হয় এটা সম্ভব হয়েছে। পুরুষ যেমন কলকারখানায় গতর খাটিয়ে রোজগার করছে বৌও তেমনি গতর খাটিয়েই রোজগার করছে, সেটা পরপুরুষের আলিঙ্গন সইতে গতর খাটানো হোক, আর যাই হোক। ব্যাপারটা ওরা বোধহয় এই ভাবে নেয়।'

'সহরের বস্তিটস্তিতে এরকম ঘটে।'

'সহরের বস্তি? গাঁয়ে এমন কত দেখেছি। তোদের একটা ধারণা আছে সহরের বস্তিতে জগতের যত নোংরামি জড়ো হয়েছে, বস্তির বাইরে কোথাও দারিদ্র্য নেই, দুর্নীতি নেই। গাঁয়ে যারা সত্যি

গরীব, সমাজের নীচুস্তরের জীব, তাদের মধ্যে কিছুদিন থেকে আয়, দেখতে পাবি বেঁচে থাকার জন্য তাদেরও নীতির বাঁধন কত ঢিল করতে হয়েছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের চেহারা দেখিস নি। গড়পড়তা আমাদের কত রোজগার তার হিসেবটা পড়ে মাথা চুলকে শুধু ভাবিস, তাইতো, আমরা সত্যি বড় গরীব। গরীব হওয়ার মানে যেন শুধু গরীব হওয়া—আর কিছু নয়। ছেঁড়া কাপড় পরা, পেট ভরে খেতে না পাওয়া, কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা—এই হল দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ রূপ। দেশে যেন কয়েক কোটি গরু ছাগল বাস করে, ঘাস বিচালির অভাবে তাদের শুধু হাড়গোড় বেরিয়ে পড়ছে—আর কিছু হয়নি।'

পাঁচ

লোকনাথ কয়েকমাস আগে একটি রঙের কারখানা কিনেছিলেন। কারখানায় যারা কাজ করত তাদের মধ্যে সাতজন ছিল মুসলমান, তিনমাসে একে একে তাদের মধ্যে তিনজনকে বিদায় করা হয়েছিল। কদিন আগে বাকী চারজনকে হঠাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল বাধার আগেই খবর পেয়ে কৃষ্ণেন্দু লোকনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল। লোকনাথ অজুহাত দিয়েছেন, ওই সাতজন দল বেঁধে ঘোঁট পাকিয়ে নানা ভাবে কাজে অসুবিধা ঘটাচ্ছিল, তাই তিনি ওদের ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

'ঘোঁট পাকাচ্ছিল কেন ?'

'ওসমান আলির জন্য।

কারখানার আগে যিনি মালিক ছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন ম্যানেজার,—নামে। ওসমান আলি ছিল একাধারে তাঁর সহকারী

ও কারখানার শ্রমিক ও কর্ম্মচারিদের সর্দ্দার। মালিক হিসাবেই হোক আর ম্যানেজার হিসাবেই হোক আগেকার মালিক-ম্যানেজার সমস্ত ব্যাপারে নির্দ্দেশ দিতেন ওসমানকে, কারখানার কাজে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতেন না। লোকনাথ কাঠের কারখানার হাঙ্গামার পর এখানে উমাপদকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। আফিসে বসে ওসমানের মারফত উমাপদ ম্যানেজারি করলে কোন গোলমাল হবার কারণ ছিল না, যেমন কাজ চলছিল তেমনি চলত, কিন্তু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছেঁটে ফেলে, কারখানার উন্নতির চেষ্টা না করে, নিজের চোখে কাজ কর্ম্ম না দেখে, পুতুল সেজে বসে থাকতে উমাপদ রাজী হল না। যুক্তির দিক থেকে, উমাপদের ম্যানেজারির বিরুদ্ধে ওসমানের বলবার কিছু ছিল না, প্রথম থেকে এই ব্যবস্থায় কাজ করে এলে তার ক্ষোভও জাগত না। কিন্তু শুধু যুক্তি নিয়ে মানুষের চলে না; দায়িত্ব ও ক্ষমতা অকারণে আইনসঙ্গত ভাবে কেড়ে নিলেও মানুষ জ্বালা বোধ করে। তাছাড়া কাগজে কলমে ম্যানেজার হবার আশাও ওসমানের ছিল। সে আই, এস্-সি পাশ করেছে, এতকাল কারখানায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা অসঙ্গত হত না। তার বদলে তার মাইনে শুধু পাঁচটাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

লোকনাথ বললেন, 'মুসলমান বলে একজনকেও তাড়াইনি কেষ্টবাবু। ওরা ভাল কাজ করছিল, আমার কাজ নিয়ে কথা। প্রত্যেকে দোষ করেছে, তবে বিদেয় দিয়েছি।'

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আপনি ভারি অন্যায় করেছেন।'

লোকনাথ চটে গেলেন।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'গোড়ায় ওসমানের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নেওয়া আপনার উচিত ছিল। নতুন ম্যানেজার আসবে, নতুন ব্যবস্থা হবে,

ওসমানকে কি অবস্থায় কি কাজ করতে হবে, এসব ওকে আগে বলে দিতেন। সোজাসুজি এসব না করে আপনারা ওর সঙ্গে আরম্ভ করলেন লড়াই,—যেমন চলছিল তেমনি চলতে দিলেন কিছুদিন, তারপর আস্তে আস্তে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ওকে অপদস্থ করতে লাগলেন। কি দরকার ছিল তার? ভাবলেন বুঝি যে আপনার কারখানা, আপনার মাইনে করা লোক, যা ব্যবস্থা করবেন তাই চলবে?'

হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওসমানের খোঁজে গেল। খাল আর ট্রাম লাইনের মাঝামাঝি ওসমানের ছোট্ট পাকা বাড়ী, ট্রাম লাইন থেকে চওড়া যে গলিটা এঁকে বেঁকে দক্ষিণে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমেই সরু আর নোংরা হয়ে এ অঞ্চলের দরিদ্রতম মুসলমান পাড়ায় পৌঁচেছে, তারই ধারে। ওসমানের বাড়ীটি আগাগোড়া সাদা চুনকাম করা। পাশেই একটি পুকুর। পুকুরের অপর তীরে কতকগুলি ছোট ছোট খোলার বাড়ী কেমন যেন তিন দিকের বাড়ীগুলি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ওখানে একদল ধাঙড় বাস করে। একটি পাকা বাড়ীর পিছন দিকে উঁচু দেয়াল, খানিকটা আবর্জ্জনা ভরা পতিত জমি, ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, এইসব মিলে এত কাছে রেখেও অন্য সব বাড়ী থেকে ধাঙড়দের ঘরগুলিকে কত যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে।

ওসমান আগে গলি ধরে আরো এগিয়ে মুসলমান পাড়ার একটি খোলার ঘরেই থাকত। অবস্থা ভাল হওয়ায় খানিকটা তফাতে সরে এসে দেড় কাঠা জমি কিনে একতালা বাড়ীটি করেছে। এখানে দাঁড়ালে এই গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তার উপরে উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে একজন ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর প্রকাণ্ড বাড়ীর খানিকটা চোখে পড়ে। ওসমান হয়তো মবারক সাহেবের ওই বাড়ীটির পাশে ওইরকম আরেকটি বাড়ী তুলবার স্বপ্ন ছাখে তার এই একতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

ওসমান বাড়ীতেই ছিল, সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলল, 'কেষ্টবাবু! আসেন, আসেন। ছালাম।'

হীরেনের দিকে সে তাকিয়েও দেখল না। অবজ্ঞাটা এতই স্পষ্ট যে হীরেনের ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর মত সে উদার নয়, নির্বিকারও নয়। কৃষ্ণেন্দু ঠিক এই অবস্থায় পড়লে ওসমানের ব্যবহারকে অপমান বলে গ্রহণ করতেই অস্বীকার করত, যেচে হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলত, প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিত যে জটিল ব্যাপারটার একটা মীমাংসার জন্য তার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে এসেছে বন্ধুভাবে। তবে হীরেনের সহ্যশক্তি আছে। কোন অবস্থাতেই সহজে সে বিচলিত হয় না। কৃষ্ণেন্দুকে ওসমানের সম্মান দেখানোর বহর দেখে তার মত অন্য কেউ হয়তো বলে বসত, তোমরা কথা বলো ইন্দু, আমি চললাম,—বলে, গটগট করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিত। হীরেন চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দেবার জন্য ওসমান ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোথায় বা বেচারী বসতে দেবে অতিথিকে! বাড়ীর সামনে তার একহাত চওড়া একটু রোয়াক। তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে সে একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে এল। কিন্তু চেয়ার পাতবে কোথায়, বাড়ী তার রাস্তার ঠিক ওপরে, রাস্তায় ছাড়া চেয়ার পাতবার জায়গা নেই। বাড়ীর কোণে পুকুরের দিকে একটু ঢালু যায়গা আছে, ওখানেই চেয়ারটা সে পাতবে কি? কিন্তু ওখানে বাড়ীর ছায়া পড়ে নি, এই কড়া রোদে কি মানুষেকে চেয়ার পেতে বসতে দেওয়া যায়? লজ্জিত অপদস্ত ওসমান অসহায় ভাবে যায়গাটুকুর দিকে তাকাতে লাগল, হাত থেকে চেয়ারটা নামিয়ে রাখবার খেয়ালও তার হল না।

কৃষ্ণেন্দু হেসে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হবে। দেবেন তো আলাপ করিয়ে?'

বলতে বলতে সে রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল, হীরেনকেও ডেকে বসাল। আহত করুণ চোখে ওসমান তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখে মনে হতে লাগল, এতবড় একটা সবল তেজী মানুষ গৃহে সমাগত ভদ্রলোককে মনের মত সমাদর করতে না পেরে যেন ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত শিশুর মত কাতর হয়ে পড়েছে।

কত কষ্টে এই বাড়ীটুকু সে তুলেছে কেউ তা জানে না। জমি কিনে দু'খানা ঘর তুলতে তার নগদ টাকা ফুরিয়ে গেছে, সামনের এই দেয়াল আর রোয়াক করেছে টাকা ধার নিয়ে। এখন তার মনে হতে থাকে, এসব না করলেই হত! তার খোলার বাড়ীর সামনে চওড়া বারান্দায় চৌকী থাকত, নতুন একখানা পাটি বা মাদুর বিছিয়ে মানুষকে বসতে দিলে না হত ভদ্রতার ত্রুটি, না হত বেমানান।

'তামাসা করছি আলি সা'ব।'

'নিশ্চয়! তামাসা বুঝিনা কেষ্টবাবু?' ওসমানও হাসবার চেষ্টা করল।

'তবে পর্দ্দা একদিন আপনাদের ঘুচাতে হবে। আমার ছেলের কাছে আপনার ছেলের বৌ পর্দ্দা রাখবে না।'

'ঠিক কথা। কি জানেন কেষ্টবাবু, আমারও একদিন ঝোঁক ছিল। কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছি, সাদি করেছি তিন কি চার সাল। বাবার এক ধমকে ঝোঁক কেটে গেল।'

'আপনার ছেলের ঝোঁক কাটবে না। তার বাবা তাকে ধমক দেবে না। কি বলেন?'

'খোদা জানেন। ধমক না দেই, হয়তো স্রেফ মার লাগাব।'

ওসমান অনেকটা সামলে উঠেছে। কৃষ্ণেন্দুর কথা ও ব্যবহার নিজের অজ্ঞাতসারেই তার মনে কাজ করছিল, সে শুধু বুঝতে পারছিল মানুষটাকে আজ তার বিশেষ করে ভাল লাগছে। মানুষের সহজ ও

শান্ত ভাব অতিশয় সংক্রামক, অন্যের গভীর উত্তেজনাও অল্প সময়ে ফুরিয়ে দিতে পারে। ঝির ঝির করে অপরাহ্নের বাতাস বইতে সুরু করেছিল, তিনজনেরই ঘামে ভেজা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাসন হাতে একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক মাটির খাঁজে বাঁশ বসানো ধাপে পা দিয়ে তালগাছের গুঁড়িতে তৈরী পুকুরের ঘাটে নেমে গেল। ওসমান সরে এসে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'এঁকে চেনেন না?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

ওসমান সায় দিয়ে শুধু বলল, 'চিনি।' তারপর এক মুহূর্ত্তে কি ভেবে অমায়িক ভাবেই হীরনকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছেন?'

হীরেন সম্পর্কে ওসমানের ভদ্রতার অভাবটা কৃষ্ণেন্দু ঠিক মত বুঝে উঠতে পারছিল না। শত্রু বাড়ীতে এলে তাকে খাতির করে, এই প্রকৃতি ওসমানের। এতক্ষণে সে টের পেলে যে হীরেনকে শত্রু ভেবে নয়, সে তার ভূতপূর্ব্ব মনিবের ছেলে বলে ওসমানের ভয় হয়েছে তার বিনয়কে হয়তো সে তার বাপের বেতনভোগী মানুষের স্বাভাবিক দীনতা হিসাবে গ্রহণ করবে, প্রভু যে ভাবে ভৃত্যের নম্রতাকে গ্রহণ করে সেই ভাবে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দু হীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত দেরী করে কেন রাস্কেলটা, ওকি ওসমানের কথার জবাব দেবে না? যদি ও তুমি বলে বসে ওসমানকে!

হীরেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে যেন সচেতন হয়ে উঠল। বলল, 'ভালই আছি। আপনার খবর ভাল?'

চোখের পলকে ওসমানের মুখের ভাব বদলে গেল। খুসী হয়ে তার মধুর গম্ভীর আওয়াজে সে বলল, 'চলছে একরকম। আপনি যে গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন—'

হীরেন আর টানতে পারল না, ক্লিষ্টভাবে একটু হেসে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'বলেন কি!'

কৃষ্ণেন্দুর ওপর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মমতা ফিরে আসবার পর থেকে হীরেন যেচে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে অনেক যায়গায় গিয়েছে, কুলিমজুরদের আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্যে। তার এই পরাজয়ের উদারতায় মমতা যদি খুসী হয় এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে আলাদা ব্যাপার। ওসমান তো গরীব নয়, কথায় ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে এখানে কৃষ্ণেন্দু কি বলে তাকে নিয়ে এল?

তারপর তারই সামনে ওসমানের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু যখন কারখানার গণ্ডগোলের বিষয় আলোচনা সুরু করল, রাগে হীরেনের রক্তে যেন আগুণ ধরে গেল একেবারে। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একথা পর্য্যন্ত তার মনে হল যে, কৃষ্ণেন্দু তার বন্ধু নয়, আর দশটি বড়লোকের ছেলের মত তাকেও কৃষ্ণেন্দু ঘৃণা করে, তাকে নিয়ে এই রকম মজা করার জন্যই সে বন্ধুত্বের ভানটা বজায় রেখে চলে তার সঙ্গে।

লোকনাথকে যেমন বলেছিল, ওসমানকেও তেমনি ভাবেই কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আপনি বড় অন্যায় করেছেন, আলি সা'ব। এত হাঙ্গামা করবার কি দরকার ছিল আপনার? অপনার কদর ওরা বুঝল না, আপনি কাজ ছেড়ে দিলেন, হাঙ্গামা চুকে গেল। আপনার কি কাজের অভাব হত কিছু? বেলেঘাটার বসাকবাবু আজ গেলে কাল আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেবে। ম'বুব, আজিজ, আমিরুদ্দীন, এদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতে গেলেন কি বলে?'

ওসমান মুখ অন্ধকার করে বলল, 'কেষ্টবাবু, আপনি যদি বলেন আমি মুছলমান, ওরাও মুছলমান, তাই ওদের বেছে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছি—'

'তা জানি। অন্য সবাই এলে তাদের নিয়েও ঘোঁট পাকাতেন, তারা যদি নিজে থেকে আসত। তাদের আপনি ডাকেন নি, এদের ডেকেছেন।'

'আমি ডাকলে ওরা আসবে কেন? আমি মুছলমান।'

'এবার জবাব দিন আলি সা'ব। আপনাকে ছাড়িয়ে দিয়ে লোকনাথবাবু তবে কি দোষ করেছেন? পাঁচ সাত বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন লোককে দিয়ে আপনি কাজ করালেন, তারপর যখন নতুন মালিক এসে আপনাকে ছাড়িয়ে দিল, সাতজন মুছলমান ছাড়া আর কেউ আপনার দলে গেল না। কেমন কাজ করেছিলেন আপনি সাত বছর? জাতভাইদের দিকে টেনে বাকী সকলের ওপর অন্যায় করেছিলেন নিশ্চয়। আপনি যদি এমন লোক, আপনাকে কি করে রাখা চলবে বলুন?'

ওসমান কথা বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে চলল, 'অরেকটা মানে হতে পারে। আপনি ব্যবহার করতেন ভাল কিন্তু ওই বাকী লোকগুলি খারাপ লোক, আপনি মুছলমান শুধু এইজন্য আপনাকে দেখতে পারত না। বেশ কথা। তাই ধরে নিলাম। কিন্তু তাহলেও লোকনাথবাবু আপনাকে বাহাল রাখতেন কি করে বলুন? চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন লোকের মধ্যে ত্রিশ জনেরও বেশী যাকে পছন্দ করে না, তাকে সর্দ্দার রেখে কি কারখানা চলে? আপনার সব বাজে অজুহাত আলি সা'ব। আপনার রাগ হয়েছিল, রাগের জ্বালায় ম'বুব, আজিজদের ক্ষেপিয়ে আপনি গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন। আপনি চুপচাপ চলে এলে ওরা কাজ করে যেত, এমন কষ্টে পড়ত না। ওদের ইজ্জৎ রাখতে আপনি কোথায় জান দেবেন, নিজের ফাঁকা ইজ্জত রাখতে, গায়ের ঝাল ঝাড়তে, আপনি ওদের মারলেন।'

ওসমান অনেকক্ষণ গুম খেয়ে রইল। তারপর ঝাঁঝাঁলো গলায় বলল, 'আপনি বড় কড়া কড়া কথা বলেন কেষ্টবাবু।'

'খাঁটি খাঁটি কথা বলি আলিসা'ব। এমনি ওদের প্রাণটুকু ধুক

ধুক করছে, নিজেদের ভালর জন্য ওদের দিয়ে কিছু করানো প্রাণান্ত ব্যাপার, আপনি আমি যদি আপনার আমার আজেবাজে কাজে ওদের প্রাণটুকু ফুঁকে দিই ওরা যায় কোথায় বলুন? কটা লোক দরদ করে ওদের? আপনার একটু দরদ আছে, আপনিও যদি ওদের কথা আগে না ভেবে নিজের কথা ভাবেন, দুদিন পরে ওরা কবরে যাবে। না আলিসা'ব, আপনার আমার মান অপমান নেই। আপনাকে তাড়ালে চুপ করে আপনি চলে আসবেন। নজর রাখবেন যারা রইল তাদের দিকে। ওদের একজনকে যখন অন্যায় করে তাড়াবে, তখন ফোঁস করে উঠে বলবেন—খপর্দ্দার।'

'ওদেরও তাড়িয়েছে।'

'কাজের বদলে ঘোঁট করায় তাড়িয়েছে, কাজ করতে গেলেই ফিরিয়ে নেবে। হীরেনবাবুকে তাইতো সঙ্গে আনলাম। জিজ্ঞেস করুন।'

ওসমান কিছু জিজ্ঞেস করল না। হীরেনও চুপ করে বসে রইল। এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করে এতক্ষণের আলোচনাকে একেবারে যেন বাতিল করে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ বলে বসল, 'এক গেলাস জল দিন তো আলিসা'ব।'

ওসমান ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেল।

জল আসতে কিন্তু দেরী হতে লাগল অদ্ভুত রকম। চাপা গলায় ওসমান ও দুটি নারীকণ্ঠের বাদানুবাদ মাঝে মাঝে কাণে ভেসে আসতে লাগল। জল আনতে গিয়ে ওসমান কি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছে? গেলাস নেই বলে তাড়াতাড়ি গেলাস মেজে দিতে বলেছে? অথবা শুধু জল না দিয়ে অতিথিকে আরও কিছু দেবার হাঙ্গামা নিয়ে তর্ক আর আলোচনা সুরু হয়েছে?

কৃষ্ণেন্দু ও হীরেন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, ওসমান এসে সবিনয়ে বলল, 'ভেতরে আসবেন একবার?

শুধু কৃষ্ণেন্দুকে নয়, হীরেনকেও সে ভেতরে যাবার আহ্বান জানাল।

ওসমান যে সত্যসত্যই তাদের বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, দুজনে তা কল্পনাও করতে পারে নি। এমন কয়েকজন মুছলমান বন্ধু কৃষ্ণেন্দুর আছে, নতুন জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যাদের ওসমানের চেয়ে শতগুণ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তার চেয়ে যারা ঢের বেশী দুঃসাহসী। মনে প্রাণে পর্দ্দার বিরোধী হয়েও তারা আত্মীয় পরিজন পাড়াপ্রতিবেশীর মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

ছোট উঠানটি পরিচ্ছন্ন। এক কোণে একটি মাত্র মাটির টবে একটি অজানা চারা, ফুল ফোটেনি। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত টাঙ্গানো লোহার তারে একটি দু'রঙা লুঙ্গি ও একটি গাঢ় হলুদ রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ী শুকোচ্ছে। একটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, জানলার পাট অল্প একটু ফাঁক করে একজন কেউ উঁকি দিচ্ছে বোঝা যায়। ওসমান তাদের অন্য ঘরটিতে নিয়ে গেল। খাটে শুধু তোষকের ওপর রঙীন সুতোয় বোনা সস্তা চেক চাদর পাতা। খাটটি বহুকালের পুরাণো, অতিরিক্ত বাহারের কাজ ও বাহুল্য নক্সায় ভরা। এখন রঙ চটে গেছে, নানা স্থানে মেরামত করা হয়েছে, একটি পায়া একদম বাদ দিয়ে সাধারণ কাঠের সাধারণ একটি পায়া বসাতে হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় খাটটি নিলামে কেনা। এ ছাড়া, ছোট একটি টেবিল, কাঠের একটি চেয়ার ও সস্তা একটি ক্যাম্প চেয়ার ঘরের আসবাব। ইঁটের ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে ঘরে তৈরী পাড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া দুটি বাক্স একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে। দেয়ালে তিনটি ছবি টাঙ্গানো, তিনটিই মাসিকপত্র থেকে সংগ্রহ করা। একটি নুরজাহানের, একটি রঙিন পাখীর, অন্যটি রক্তগোলাপ হাতে ওমর খৈয়ামের।

বাইরে যে চেয়ারটি নিয়ে গিয়েছিল, ওসমান সেটিও নিয়ে আসে। ব্যস্তভাবে সে ঘরে বাইরে আনাগোনা করে, সমাদর জানানোর চেষ্টায় অর্থহীন কথা বলে। ছেলেমানুষের মত সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার এই উত্তেজনার আসল কারণটি তখনো কৃষ্ণেন্দু অনুমান করতে পারেনি, একসময় সে হাসিমুখে অনুযোগ দিয়ে বলে, 'অত খাতির করবেন না, আলি সা'ব। মুস্কিলে ফেলে দিচ্ছেন যে আমাদের!'

বলতে বলতে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মুখখানা সুশ্রী ও কোমল, গায়ে কব্জি-হাতা জামা, পরণে ফিকে সবুজ শাড়ী, পায়ে জরি বসানো চটি। ঘরে ঢুকেই দ্বিধাভরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আরও দু'পা এগিয়ে এল। মেঝের দিকেই সে তাকিয়ে রইল, একবার শুধু চকিতের জন্য তার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি তাদের দিকে ঝিলিক দেওয়ার মত খেলে গেল।

ওসমান পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার স্ত্রী। ইনি কৃষ্ণেন্দু বাবু, ইনি হীরেন বাবু।'

ব্যস্ত সমস্ত ভাব কেটে গিয়ে ওসমান এখন শান্ত ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে আমিনার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করে। আমিনার অবস্থা সে ভাল করেই বুঝতে পারছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত হাস্যকর হয়ে না যায়, এখন ওসমানের এই আশঙ্কা। বেশী কিছু আশা করে না সে আমিনার কাছে। পাঁচ ছ'মাস আগে কৃষ্ণেন্দুর বাড়ীতে তার বৌদিদি কেমন সহজভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার সঙ্গে আলাপ করেছিল, ওসমানের মনে পড়তে থাকে। ওদের অভ্যাস আছে, ওদের কথা আলাদা। জীবনে আজ এই প্রথমবারের চেষ্টায় আমিনা কেন ওদের মত হতে পারবে। সে যেন শুধু ভেঙে না পড়ে, হঠাৎ যেন পালিয়ে না যাস!

কৃষ্ণেন্দু তার চেয়ারটি আমিনার কাছে এগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'বসুন।'

আমিনা অস্ফুটস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। চেয়ারের পিঠে একটি হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণেন্দু অধ্যবসায়ী, সহজে হার মানে না।

'বাড়ীর ভেতর চড়াও হয়ে আপনাকে বড়ই জ্বালাতন করলাম।'

আমিনা একবার চোখ তুলে তাকাল।

'উপেনবাবু আর জলধর বাবুর মেয়েদের সঙ্গে আপনি খুব মেলামেশা করেন শুনেছিলাম। ওঁরা আমায় বলেননি, আমার সামনে ওঁরা বার হন না। আমার বৌদির কাছে শুনেছি।'

আমিনার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল।

'আমাদের বাড়ীটা একটু দূরে। আপনি তো আর যাবেন না, বৌদিকে একদিন নিয়ে আসব।'

আমিনা মৃদুস্বরে বলল, 'আনবেন। আনবেন তো?' সংক্ষিপ্ত বিরামের পর সে আবার যোগ দিল, 'আমিও যাব।'

আমিনার কথার সুর আশ্চর্য্য রকম মিষ্টি। মিহি গলার মৃদু উচ্চারণে ক্ষীণ একটু ঝঙ্কারের আভাস মিশে থাকায় তার কথা পাখীর কুজনের মত অপূর্ব্ব শোনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিধাসঙ্কোচের ভাব তার অনেকটা কেটে গেল। লেখাপড়া সে বিশেষ জানে না, বাইরের জগতকে একরকম চেনে না। ওসমান নিজে তাকে কিছু কিছু পড়তে শিখিয়েছে, তারই মারফত বাইরের জগতের দুটি একটি খবর সে পায়। অতিথি দু'জনকে সে আম আর দোকানের খাবার খেতে দিল। বার বার কৃষ্ণেন্দুকে মনে করিয়ে দিল বৌদিকে নিয়ে সে যেন একদিন বেড়াতে আসে। আধ ঘণ্টা একটি অপরিণত শৈশব-আশ্রয়ী মনের সংস্পর্শে কাটিয়ে হীরেন মুগ্ধ ও কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ হয়ে বিদায় নিল।

'ম'বুব, আজিজদের বলে আসি চলুন আলি সা'ব, কাল থেকে ওরা যেন কাজে লাগে।' কৃষ্ণেন্দু বলল।

ওসমান বলল, 'আপনি কেন যাবেন? ডেকে পাঠাচ্ছি ওদের।'

'চলুন না আমরাই যাই। তাতে দোষ নেই আলি সা'ব।'

অনিচ্ছুক ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু গলি ধরে এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে পথ হয়ে এল সঙ্কীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। পথের ধারে জলের কলের কাছে বালতি কলসী নিয়ে পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ চুল, রুগ্ন দেহ, সায়া সেমিজের অভাববশতঃ ময়লা শাড়িখানিই দুফেরতা জড়ানো। পথের ধারে চাল ডাল তেলমসলার দোকানে নারী পুরুষ দৈনিক সওদা কিনছে, দু'এক, আধপয়সার। এরা তেল, নুন পর্য্যন্ত দিন কিনে দিনের প্রয়োজন মেটায়, একসঙ্গে কয়েকটা দিনের সওদা কিনে রাখবার পয়সা নেই। একটি খোট্টা মেয়ে তিনটি ছাগল তাড়িয়ে ডাইনের একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ল, তকমা আঁটা এক চাপরাসী এলুমিনিয়ামের পাত্র হাতে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো এক বাবুর ছেলে ছাগলের দুধ খায়। কোথা থেকে ভিজে কাপড়ে আবির্ভূতা হয়ে একটি স্থূলাঙ্গী বাঙ্গালী যুবতী ওই বাড়ীতেই প্রবেশ করার সময় কৃষ্ণেন্দুদের সামনে নির্ভীক নির্লজ্জতার সঙ্গে চাপরাসীকে বিলোল কটাক্ষ হানল, অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে নিজেকে ঢাকবার ছলে মুহূর্ত্তের জন্য বুকের আবরণ সরিয়ে দিল, তারপর ক্রুদ্ধ উপেক্ষার ভঙ্গিতে নাক সিঁটকে মুখ উঁচু করে ভেতরে চলে গেল।

হীরেনের চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল।

'এটা বিজ্ঞাপন ভাই। পাঁজীর বিজ্ঞাপনের চেয়ে অশ্লীল ঠেকল? চাপরাসীটা যদি কেনে, আজ ওর আট আনা রোজগার হবে, কাল কুঁচো চিংড়ি আনিয়ে পেট ভরে ভাত খাবে। জোরালো শরীর বলে ওর

খিদের তাগিদটা একটু বেশী। ব্যায়রামে ভুগে যখন শরীরটা ভেঙে পড়বে, খিদে কমে যাবে, তখন আর এরকম অভদ্রতা করবে না।'

'ওকে চিনিস?'

'চিনি। ওর নাম কালী। ভীষণ দজ্জাল। বেচারীর কপালটা বড় মন্দ। না খেয়ে না খেয়ে স্বভাবটা বেশ নরম হয়ে আসে, একজন কাউকে পাকড়িয়ে তার সঙ্গে কয়েকদিন খুব ভাল ব্যবহার করে। পেটভরে খেয়ে গায়ে জোর হলে আবার আসল মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়ে। কাউকে নিজে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, কেউ আপনার থেকে পালায়।'

বাঁ দিকে দু'হাত চওড়া একটি গলির মধ্যে প্রথমেই ম'বুবের বাড়ী। তিনজনে গলিতে ঢুকতেই কয়েকটা মুরগী উচ্চকিত হয়ে পালিয়ে গেল। গলির দুদিকেই টিন আর খোলার ঘর, পুরাণো এবং জীর্ণ। আবরু রক্ষার জন্য দু'পাশের বাড়ীতেই এখানে ওখানে জীর্ণ চটের পর্দ্দা ঝুলছে। তবু দরজার ফাঁক দিয়ে ম'বুবের উঠানের খানিকটা চোখে পড়ে। সেখানে কতগুলি ঘুঁটে গাদা করা, কাছে শুয়ে হাঁপাচ্ছে একটা লোমওঠা ঘেয়ো কুকুর। চোখ ফিরিয়ে নিতে কৃষ্ণেন্দুর নজরে পড়ল, এদিকের বাড়ীর ঠিক সামনের ঘরখানার ভেতরে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে এই অবেলায় পড়াশোনা করছে। ঘরটি খুব ছোট, ভেতরে আবছা অন্ধকার। বেড়ার গায়ের ছোট জানালাটিতে বাঁশের বাতা বসানো। মাটির মেঝেতে চাটাই-এর আসন পেতে ছেলেটি বসেছে, সামনে একটা কেরাসিন কাঠের চৌকো বাক্স হয়েছে তার টেবিল, তাতে কয়েকটি বই খাতা আর দোয়াত কলম। একটি বই খুলে অল্প আলোর জন্য বইয়ের পাতার ওপর ঝুঁকে ছেলেটি একমনে পড়ে চলেছে।

বাড়ীটা নেওয়াজের। কৃষ্ণেন্দু আনমনে বাঁশের বাতা বসানো

জানালার ফাঁকে অধ্যয়নরত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। কার কাছে সে যেন শুনেছিল নেওয়াজের ছেলে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। এতদিন খবর নেয়নি কেন ?

ম'বুব, আজিজ, নেওয়াজের গোলমালটা মিটেও মিটল না। ওসমান বেলেঘাটার বসাকদের কারখানায় ঢুকেছে, এদের সাতজনকে লোকনাথের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা আর কোন গোলমাল করতে চায়নি, কিন্তু উমাপদ ছাড়বার ছেলে নয়, সে এদের পেছনে লেগেছে। এদের ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা তার ছিল না, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন লোকনাথকে বুঝিয়ে রাজী করানোয় সে আর কিছু বলতে পারে নি। সেই রাগটা সে ঝাড়তে আরম্ভ করল এই বেচারীদের ওপর। ওই ছোট কারখানার সামান্য ব্যাপারটা যে কতখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল, হিন্দু-মুছলমান মজুরদের মধ্যে ধর্ম্মগত একটা বড় রকম হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা তলে তলে আরম্ভ করে দিয়েছিল হিন্দু ও মুছলমান দুই ধর্ম্মেরই কয়েকজন ওস্তাদ ব্যক্তি, সেটা বুঝবার ক্ষমতা উমাপদর ছিল না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

লোকনাথের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন, 'কেষ্টবাবু, দয়া করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন না।'

সেদিন সকালে ভারতের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গের লাভজনক ব্যাপারে উৎসাহী একজন নাম করা ধনী হিন্দু নেতা যে লোকনাথের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণেন্দু তা জানত না।

ভেবে চিন্তে সে কারখানার সব মজুরকে জড়ো করে হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

হীরেন যায় অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু বিনা প্রতিবাদে।

প্রতিবাদ করে না, কিন্তু আপশোষ জানায়। নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না কেষ্ট।'

'অশান্তিটা কিসের ?' কৃষ্ণেন্দু শুধোয়।

'এই ঘরে মমতাকে নিয়ে, বাইরে তোকে নিয়ে।'

বলে সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। ভীরু অপরাধীর মত কেমন এক ধরণের হাসি। তার জীবনে অশান্তি কথাটা যেন অন্যায়, তারই দোষ। এভাবটা হীরেনের দিন দিন বাড়ছিল। মমতা আর কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে সে যতদূর সম্ভব লোপ করে দেয়—তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ভাল-লাগা ভাল-না-লাগার কথা মুখে এলে উচ্চারণ করেই গিলে ফেলে। ভেতরটা তার পুড়ছে। ঘুঁটের মত ধীরে ধীরে গোপনে। এটাও সে মানতে চায় না—জ্বালাটা পর্য্যন্ত। সে কি ছোট লোক, অমার্জ্জিত, অসভ্য, স্বার্থপর যে আরিফ জেলে আছে, মমতা শান্ত হয়ে ফিরে এসে সন্ধি করেছে, তবু সে ঈর্ষায় জ্বলবে, সর্ব্বদা মনে হবে মমতা তাকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে, ঠকাবে।

যদি সে ভাবতে পারত যে মেয়ে জাতটাই এরকম। এটা ভাবতে গেলেই দিগম্বরীর কথা মনে ভেসে আসে—গেঁয়ো অশিক্ষিতা দিগম্বরী, স্বামী ছাড়া যার জগতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই, সেবা আর শ্রদ্ধা যার স্বভাব।

কৃষ্ণেন্দুও হয়তো তাকে তুচ্ছ অনাবশ্যক মনে করে এ সন্দেহের জ্বালাটা যখন বেড়ে যায়, নিজেকে বড় একা মনে হয় হীরেনের, গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আসে।

সন্দেহ সত্য হয়ে দাঁড়াবার ভয়ে সে কৃষ্ণেন্দুর ওপরে বন্ধুত্বের জোর খাটায় না, নির্ব্বিরোধ ব্যবহারের চেষ্টা করে।

তাই, কৃষ্ণেন্দুকে চটাবে না বলে হীরেন মজুরদের সভায় গেল। দু'চার জন ছাড়া লোকনাথের কারখানার সকলে প্রায় একসময়েই

মিস্ত্রীঘরে এসে জড়ো হল। কারখানা থেকে তারা সোজা এখানে এসেছে। কৃষ্ণেন্দু তাদের জন্য খাবার যোগাড় করে রেখেছিল,—রুটি, তরকারী আর একটি করে গুড়ের সন্দেশ। পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত মানুষ-গুলি এই খাদ্য উদরস্থ করে যখন ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটী জল খেল, স্পষ্ট অনুভব করা গেল তাদের উপস্থিতির প্রকৃতিই যেন বদলে গেছে। অধীর উত্তেজনাপ্রবণ মানুষগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল ধীর ও শান্ত। এ বিষয়ে কৃষ্ণেন্দুর অভিজ্ঞতা আছে। সে জানে, পেট ঠাণ্ডা না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করার ক্ষমতা এদের হয় না।

আলোচনার গোড়াতেই জানা গেল, ম'বুব আজিজদের সম্পর্কে কারখানার অন্য সকলের মনে এতটুকু বিরুদ্ধভাব নেই, অনেকদিন তারা একসঙ্গে কাজ করছে। প্রতিবাদ না করলেও ওদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তারা সমর্থন করে না। ক্ষমতা থাকলে প্রতিবাদও তারা করত।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তাই তোমাদের করতে হবে।'

এদের মধ্যে দীননাথ সবচেয়ে বিচক্ষণ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল আর গায়ের ফতুয়াটার জন্য তাকে আরও বেশী বিচক্ষণ দেখায়। হীরেনের দিকে একনজর তাকিয়ে সে উদাসভাবে বলল, 'আমরা কি করতে পারি বলুন ?'

'এরা সাতজন যা করে, তোমরাও তাই করবে। এদের একজনকে উমাপদবাবু অপমান করলে বাকী ছ'জন গা পেতে নেয়, এবার থেকে তোমরা সবাই গা পেতে নেবে। দরকার হলে ওদের সঙ্গে তোমরাও বেরিয়ে আসবে কাজ ছেড়ে দিয়ে।'

কেউ কথা বলে না। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনতে শুনতে বার বার সকলের দৃষ্টি পড়তে থাকে হীরেনের ওপর। এই সভায় হীরেনের

উপস্থিতি তাদের কাছে ধাঁধাঁর মত হয়ে উঠেছে, সকলেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে; প্রথমে সকলে ভেবেছিল মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেবার জন্য সে এসেছে, কর্তৃপক্ষ থেকে সে তাদের ভরসা দেবে যে ভবিষ্যতে আর কারখানার কারো প্রতি কোনরকম দুর্ব্ব্যবহার করা হবে না। আপোষ আলোচনার পরিবর্তে যখন প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা উঠল, হীরেনের সামনেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উমাপদর সমালোচনা করে কৃষ্ণেন্দু যখন বুঝিয়ে দিতে লাগল, ওই একটি লোকের গোঁয়ার্তুমির জন্যই বিশ্রী ব্যাপারটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সে আর লোকনাথের একগুঁয়েমির জন্যই ব্যাপারটা মেটানো যাচ্ছে না, সকলে তখন এমন বিব্রত হয়ে পড়ল বলবার নয়। কারো কারো একথাও মনে হল যে এমনিভাবে বাপভাই-এর নিন্দা শুনিয়ে অপমান করার উদ্দেশ্যেই হয়তো কৃষ্ণেন্দু ভুলিয়ে-ভালিয়ে হীরেনকে সভায় এনে হাজির করেছে।

হীরেনও প্রথমে কল্পনা করতে পারেনি তাকে ডেকে এনে কৃষ্ণেন্দু এভাবে অপদস্থ করবে। তারও ধারণা ছিল, সকলের অভিযোগ শুনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে বলে সে কথা দেবে, এইটুকু কৃষ্ণেন্দু তার কাছে আশা করে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যতই সে অস্বীকার করুক তাকে দিয়েই কৃষ্ণেন্দু যে একটা মীমাংসা করিয়ে ছাড়বে, তাও হীরেন জানত।

প্রথমে অসহ্য বিস্ময় জাগল, তারপর অপমানে দুটি কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কৃষ্ণেন্দুর দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। লোকনাথ বা উমাপদর নিন্দায় যেন হীরেনের কিছু এসে যায় না, তার সামনে কারখানায় ষ্ট্রাইক সুরু করার পরামর্শ করতে যেন বাধা নেই, সে তাদের লোক, সে বিভীষণ। আগেও অনেকবার মনে হয়েছে, এখন আবার হীরেনের মনে হয়, এই অত্যধিক লম্বা, হাড্ডিসার কুদর্শন

পুরুষটি তার সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে হিংস্র শত্রু, এমনিভাবে ফাঁদে ফেলে তাকে আঘাত করার তীব্র আনন্দের জন্য দিনের পর দিন তার বন্ধু হয়ে থাকে। বন্ধুত্বের ভাণ করেনা, সত্য সত্যই বন্ধু হয়ে থাকে নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধু। হৃদয়মন রামময় করে রাখতে চেয়ে, রামের হাতে মরতে চেয়ে, রাবণ রামের শত্রু হয়েছিল। সেও শত্রুতার ভাণ করেনি। জগতের ধনী আর স্বরের প্রতিনিধি হিসাবে সব সময় তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তাকে আঘাত করার আনন্দ চেয়ে, কৃষ্ণেন্দু নিজেকে তার মিত্র করেছে।

'চুপ কর! ষ্টুপিড, রাস্কেল, চুপ কর বলছি।'

হীরেন উঠে দাঁড়িয়েছে। আকস্মিক স্তব্ধতায় কৃষ্ণেন্দুর বিস্মিত প্রশ্ন কি যে কর্কশ শোনালো বলবার নয়: 'কি হয়েছে?'

হীরেন তার প্রশ্নের জবাব দিল না। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলল, 'শোন বাপু, সকলে মন দিয়ে শোন। এসব বাজে ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দাও। ম্যানেজার বাবু তোমাদের কারো সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার করবেন না।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তুমি যদি সেটা করে দিতে পার, তাহলে তো ভালই হয়।'

এ মন্তব্যও হীরেন কানে তুলল না। ম'বুব সকলের সামনে বসেছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ম'বুব। দু'তিন মাস ধরে কারখানায় তোমরা নানা রকম গোলমাল করেছিলে, ম্যানেজার বাবুর যদি একটু রাগ হয়ে থাকে তোমাদের ওপর, সেটা কি অদ্ভুত ব্যাপার কিছু? আবার যখন কাজে লাগলে, সবাই মিলে একবার গেলেনা কেন ম্যানেজার বাবুর কাছে, নরমভাবে বললে না কেন ম্যানেজার বাবুকে, আগের কথা মনে করে তিনি যেন রাগ না রাখেন? মানিয়ে চলতে শেখোনি তোমরা।'

এধার থেকে ওসমান বলে উঠল, 'দু'তিন মাস ধরে কেউ কিছু অন্যায় কাজ করেনি হীরেন বাবু। যেচে ম্যানেজার বাবুর কাছে ঘাট মানতে যাবে কেন?'

হীরেন চটে গেল।—'তা যদি বলো—'

'এবার তুই চুপ কর।' কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই আলিসা'ব। হীরেন বাবু যখন কথা দিলেন ম্যানেজার বাবু আর খারাপ ব্যবহার করবেন না, বাস্, এইখানে সব কথা খতম হোক।'

সকলে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোনদেশী রসিকতা হল?'

'কোনটা?'

'আমার কারখানার কুলিমজুরের কাছে আমায় অপমান করা?'

'অপমান কিসের? কারখানা তোর নয়। ওরা তোর কুলিমজুর নয়। তুই ওদের।'

'আমার হয়ে সেটা বুঝি ঠিক করেছিস তুই?'

'আমি তাই ধরে নিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ঘরে মমতা, বাইরে তুই। বেশ বাঁদর নাচাচ্ছিস দু'জনে আমাকে।'

আজ আবার একগাদা মদ খেল হীরেন। সেবার হোটেল থেকে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে মমতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, আজ একটা বেঁটে লোকের সঙ্গে মদ খেতে গেল একটা মেয়ের বাড়ী। তিনদিন সেখানেই তার কাটল।

মমতা ড্রাইভারের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাকে উদ্ধার করে আনল কৃষ্ণেন্দু।

তারপর থেকে হীরেন মাঝে মাঝে মদ খায়।

দিন কাটতে থাকে, হীরেনের মধ্যে মদের পিপাসা জাগবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পাঞ্জাবীর দু'পকেটে পোর্ট বোঝাই করে কোন এক মেয়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়। তাকে দেখেই মেয়েটির দু'চোখ লোভে জ্বল জ্বল করে ওঠে, বাড়ীর ঘরে ঘরে অন্য মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, পাড়ায় খবর রটে যায়, সেই তিনি এসেছেন !

মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে বসাতে না বসাতে বেঁটে ফর্সা নিরীহ একটা লোক হাজির হয়। আনন্দ জানায় না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না, একবার জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছেন। কাল যেন তার হীরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপর সে ফিরে গিয়ে মদ পাঠাতে থাকে, ছোট বড় নানা আকারের নানা বোতলে। একে একে পাঁচ সাতটা দিন কেটে যায়, হীরেন বাড়ী ফেরে না, এ বাড়ীর বাইরেও পা দেয় না। মেয়েটার ঘরে মদ খায় আর ঘুমায়, ঘুমায় আর মদ খায়। দু'একদিন কাটবার পরেই কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু কি ভাবে যেন আন্দাজ করে নিয়ে আসা সুরু করে, কোন কোনদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটির ঘরে ডজনখানেক মানুষের সমাবেশ পর্য্যন্ত ঘটে যায়। নিরীহ বেঁটে লোকটা ইতিমধ্যে একবারও দেখা দেয় না। দুপুরে হোক, সন্ধ্যায় হোক, রাত্রি তিনটেয় হোক, খবর পাঠানো মাত্র বোতল পাঠিয়ে দেয়।

তারপর খবর আসে কৃষ্ণেন্দুর কাছে। খবর যে দিতে আসে তাকে কৃষ্ণেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'আর দু'চার দিন চালালে মরবে মনে হয় ? যদি মরতে পারে দু'চার দিনে, তবে কটা দিন পরেই যাব।'

আধঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু মেয়েটির ঘরে গিয়ে পৌঁছয়। হয়ত দেখা যায় মেয়েটি তার চেনা, আগেও দু'একবার এর ঘর থেকেই হীরেনকে সে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

'কখানা গয়নার দাম তুললে ভাই ?' কৃষ্ণেন্দু তাকে জিজ্ঞেস করে।

'বন্ধুকেই শুধোন না ?' মেয়েটি হাসে, 'মদের দেনা দাঁড়িয়েছে।'

'মদের দেনা, তোমার দেনা, সব মিটিয়ে দেবে ভাই, ভেবোনা।'

'তা দেবে। আনা পাই হিসেব করে দেবে। মদের দামের একশো ভাগের এক ভাগ যদি আমি বখশিস চাই, বলবে, তোমায় দেবো কেন ? তুমি তো কমিশন পাবে।' বলে তুড়ি দিয়ে মেয়েটি মুখে শব্দ করে, 'ফুস্!'

হয়তো কয়েক ঘণ্টার বিরাম গেছে, হীরেনের নেশা তখন কম। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বালিশ থেকে মাথা তুলবার চেষ্টা করে সে শুধু হাসে। খাটে উঠে জোড়াসন হয়ে বসে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কিরে হতভাগা !'

'শনি এলে তো ?' হীরেন বলে।

'গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দয়া করে গা তুলুন।'

আগে থেকে অনুমান করে টাকা কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে নিয়ে যায়, বন্ধুকে নিয়ে চলে আসবার আগে সব দেনা সে মিটিয়ে দেয়। টাকা সে পরে হীরেনের কাছ থেকে আদায় করে নেবে, নিজের কাজে তার অনেক টাকা দরকার, মদের দাম মিটিয়ে সে টাকা চেয়ে নিতে ভুলে যাওয়ার মত খাতির এ জগতে কারো সঙ্গে তার নেই। বেঁটে ফর্সা নিরীহ লোকটি আসে, টাকা বুঝে নিয়ে চলে যায়।

কৃষ্ণেন্দু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমায় কত দেব ভাই ?'

মেয়েটি বলে, 'যা খুসী দিন।'

হীরেন হয়তো এতক্ষণ চোখ বুজে থাকে, কৃষ্ণেন্দু কাকে কত দিচ্ছে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মনোযোগ আছে মনে হয় না। এইবার হঠাৎ সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'আজ কি বার ?'

'বুধবার।'

'আরেক মঙ্গলবার এসেছিলাম। আজ ধরে ন'দিন। প্রথম দিন ত্রিশ টাকা, তারপর পঁচিশ টাকা করে। ওকে দুশো ত্রিশ টাকা দে।'

মুখ কালো করে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে, 'দেখলেন?'

হীরেন বলে, 'দেখলেন কি? যা কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে তাই দেওয়া হচ্ছে। এক পয়সা কম দিচ্ছি যে ওকে সাক্ষী মানছ?'

কৃষ্ণেন্দু নিঃশব্দে দুশো ত্রিশ টাকা গুণে মেয়েটির হাতে দেয়। নোটগুলি হাতে নিয়ে ভয় বিস্ময় ও বিদ্বেষ মেশানো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকিয়ে থাকে হীরেনের দিকে।

হীরেনকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ একবার নেমে যায়। চট করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে কতগুলি নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হীরেন সন্দিগ্ধ মনে বলে, 'তুই ওকে টাকা দিয়ে এলি ইন্দু।'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না। কিছু ফেলে এসেছিস কিনা দেখে এলাম।'

এতক্ষণ পরে তাকে ভয়ানক গম্ভীর দেখায়। হীরেন আজে বাজে কথা বলে, সে গুম খেয়ে থাকে। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'টাকা দেবার জন্যে, কিছু ফেলে এসেছ কিনা দেখবার জন্যে, তোকে আর ফিরে যেতে হবে না। মনে থাকবে?'

তখন হীরেন কাতরভাবে তার চিরন্তন কৈফিয়ত জানায়। বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না ইন্দু।'

ছয়

কয়েকটি ছোট বড় হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে কৃষ্ণেন্দু বিব্রত হয়ে ছিল। সবগুলিই শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপার। এক সময়ে ছোট বড় এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন কল কারখানায় এত বিভিন্ন কারণে গোলমাল সুরু হতে

সে কখনো ছাখে নি। নতুন চেতনার লক্ষণ আবিষ্কার করে পুলকিত হবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। চেতনা কই? জোরালো একটা অসন্তোষ সাড়া দিচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, এইটুকু শুধু সে অনুভব করতে পারে। অধিকারের দাবী কেউ তুলছে না। কয়েকটা অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু চাইছে। তাও আবার পূরোপুরি নিজেদের ভেতরকার তাগিদে নয়!

অনেক সঙ্ঘ ও সমিতি তাদের ব্যাপারে কৃষ্ণেন্দু হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। চেষ্টা করেও কৃষ্ণেন্দু সেখানে আমল পায় না।

'এই নিয়ে ধর্ম্মঘট করবেন না। অনর্থক শক্তি ক্ষয় হবে।' কৃষ্ণেন্দু বলে।

'আপনি ওসব বুঝবেন না।' বলে খদ্দর পরিহিত সোণার চশমা লাগানো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িযুক্ত সমিতি।

'বুঝব বৈকি। কাল পরশু সুরু করে দিন সাতেক ষ্ট্রাইক চালাতে পারলে ফণ্ডে কিছু টাকা আসবে।'

'তবে তো বুঝতেই পারছেন। টাকা সম্পর্কে আপনার মত জানি না, আমরা টাকাটা খুব দরকারী মনে করি। আমরা দেখেছি, টাকা দিয়ে এদের যত ভাল করা যায়, বক্তৃতা দিয়ে উপদেশ শুনিয়ে তার সিকিও হয় না। প্রোপাগাণ্ডার পেছনেও আমরা টাকা খরচ করি না যে তা নয়।'

'চিন্তামণি মিল কি খুব বেশী টাকা দেবে?'

'মন্দ দেবে না। তাই বা পাচ্ছি কোথা বলুন?'

'কিন্তু এরা যদি অর্ডারটা না পায়—ষ্ট্রাইক সুরু হলে পাবেও না—এদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছেন কি? এদের কাজ কমিয়ে ফেলতে হবে। বহু লোককে ছাড়িয়ে দেবে।'

'তেমনি চিন্তামণি যদি অর্ডারটা পায়, ওদের কাজ বাড়াতে হবে। বহু লোকও নেবে।'

'খুব বেশী নেবে কি? বাজার মন্দা চলছে, ওরা অন্য কাজ কমিয়ে দেবে। আপনারা কার লাভ দেখছেন 'বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বুঝবেন না।'

এই সময় ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বর একদিন তার সঙ্গে এসে দেখা করল। তার সাহায্য ও পরামর্শ চায়।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে একটা পাকা রাস্তা শ্রীনাথপুর হয়ে সদরে চলে গেছে। মাইল দশেক পশ্চিমে খড়্গাপুরের পথ। শ্রীনাথপুর থেকে একটি নতুন রাস্তা ঝুমুরিয়ার পাশ দিয়ে নিয়ে খড়্গাপুরের রাস্তায় মিলিয়ে দেওয়া হবে। ঝুমুরিয়ার আগের ও পরের মাইল পাঁচেক পথ তৈরী করে দেবার কনট্রাক্ট হেরম্ব চক্রবর্তীর। অন্য কাজের ভিড়ে নিজে সে প্রথমে রাস্তা তৈরীর কাজটার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে নি, এতদিন কাজও এগোয় নি একেবারেই। সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় হেরম্ব এবার প্রবল বেগে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সুরু হয়েছে নানা অত্যাচার। রাস্তার বাকী অংশ যারা ঠিকে নিয়েছে প্রথম থেকে আশেপাশের সাঁওতাল কুলীদের তারা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। হেরম্ব আসা মাত্র তারা কাজ ছেড়ে চলে গেছে। দূর থেকে লোক এনেও হেরম্ব কুলোতে পারছে না। ঝুমুরিয়া আর আশেপাশের গ্রামে তার প্রজাদের ধরে বেঁধে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। যেখানে যার গরুর গাড়ী পাচ্ছে তাই দখল করছে। বর্ষার আগে এখন চাষের জন্য জমি ঠিক করতে হবে, জমি ফেলে রেখে বহু লোককে গাছ আর মাটি কাটতে হচ্ছে, গরুর গাড়ীতে রাস্তার মাল মশলা বইতে হচ্ছে। যেখানে একটু তফাৎ থেকে মাটি আনবার দরকার হয় সেখানে কাছাকাছি ফসলের জমি খুঁড়ে মাটি তোলা হচ্ছে, জমির মালিককে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে খতে।

কুলিদের জন্য কম দামে জবরদস্তি চাল কেনা হচ্ছে। এইরকম আরও অনেক কিছু।

বীরেশ্বর এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে হেরম্বের বাড়তি ঠোকাঠুকি চলছিল। তাদের কিছু ভাল ডাঙ্গা জমি রাস্তার কবলে পড়েছে। চার বছর আগে যখন এই জমি কেনা হয়েছিল, চাষের যোগ্য দামী ডাঙ্গা জমি গণ্য করেই তখন দাম ঠিক হয়। পতিত মেঠো জমিকে চাষের জমি বলে ঘোষণা করার জন্য বীরেশ্বর এবং আরও তিনজনের নামে হঠাৎ নালিশ হয়েছে। হেরম্বর শ্বশুর জমিদার, সে স্বীকার করেছে এই জমিতে কোনদিন চাষ হত না। বীরেশ্বর যে দলিল-পত্র দাখিল করেছিল সেগুলি কাছাকাছি অন্য জমি সম্পর্কে। রাতারাতি ওইসব জমিতে হেরম্ব ছোট ছোট কয়েকটি ঘর তুলে কয়েকজন লোক বসিয়ে দিয়েছিল, তারা ঘোষণা করছে যে বহুকাল ওইখানে তাদের বসবাস, এই জমিতে কখনো লাঙল পড়ে না, ঘর তুলবার জন্য বছরে তারা এত এত খাজনা দেয় বীরেশ্বরকে। এই যে খাজনার রসিদ।

এক রাত্রে ঘেরা জাল ফেলে বীরেশ্বরের পুকুর থেকে দেড়শ' দু'শো টাকার মাছ তুলে হেরম্ব কুলি মজুরদের বিলিয়ে দিয়েছে।

আশেপাশে আরও কুয়ো আছে। বীরেশ্বরের বাড়ির ভেতরের উঠানের কুয়ো থেকে সারাদিন খাবার জল নেবার জন্য লোক আসছিল। দু'তিন দিন চুপচাপ সহ্য করে কাটাল বীরেশ্বর, তার দুই ছেলে আর গাঁয়ের কয়েকটি লোক দা' লাঠি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। এবার কি হবে ভগবান জানেন!'

'হেরম্ব চক্রবর্ত্তীর এত রাগ হবার কারণ কি?'

কারণ তো সব বললাম। আমরা গাঁয়ের অনেকে একত্র হয়ে অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিচ্ছি, এইটাই আসল রাগ। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত একটা ব্যাপারও আছে।'

দু'এক দিনের মধ্যে একবার ঝুমুরিয়া যাবে কথা দিয়ে কৃষ্ণেন্দু তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। যেতে যেতে তার দেরী হয়ে গেল দিন পাঁচেক। বিকাল চারটার সময় ঝুমুরিয়া পৌঁছে শুনল, দুদিন আগে বীরেশ্বর খুন হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দাঙ্গা বাধো' বাধো' অবস্থায় পুলিশ এসে পড়ে। বীরেশ্বরের দলকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য পুলিশ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে—তারপরেই দেখা যায়, বন্দুকের গুলি লেগে বীরেশ্বর শেষ হয়ে গেছে। পুলিশের গুলিতে নয়, পুলিশ ফাঁকা আওয়াজই করেছিল, গাদা বন্দুক দিয়ে বীরেশ্বরকে মারা হয়েছে। পরীক্ষার পর জানা গেছে বন্দুকটি বহু পুরাণো ধাঁচের, গুলি বা ছর্‌রার বদলে পেরেক, লোহার টুকরো, পাথরের কুচি দিয়ে গাদা হয়েছিল। বন্দুকটি কার, কে ছুঁড়েছিল, কিছুই জানা যায় নি। আওয়াজ হওয়ার পর হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে অনেকক্ষণ কেউ একা খেয়ালও করতে পারে নি যে অন্য বন্দুক ছুঁড়ে কেউ বীরেশ্বরকে খুন করেছে।

কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি। পরদিন বেলা বারটার গাড়ীতে সে চলে এল। অন্ততঃ এক সপ্তাহ ঝুমুরিয়ায় থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে। বাড়ী পৌঁছল সে রাত দশটায়।

কণক বলল, 'রম্ভা দু'বার তোমার খোঁজ করে গেছে ঠাকুরপো।'

'রম্ভা খবর পেয়েছে নাকি?'

'খবর জানতে এসেছিল।'

রামপালের বাড়িতে খবর দিতে যাওয়ার আগে হীরেনকে সে ফোন করল। বলল, 'কিছু টাকা খসাতে হবে ভাই। কাল বারোটার মধ্যে হাজার খানেকের একটা চেক ভাঙ্গিয়ে রাখিস।'

'আমার টাকা নেই।'

'রম্ভার বাবা খুন হয়েছে।'

'রামপালের বৌ রম্ভা ? কবে ? কোথায় ?'

খবর দিতে কৃষ্ণেন্দু এত রাতে রামপালের বাড়ী যাবে শুনে হীরেন একটু ভেবে বলল, 'দাঁড়া, আমিও আসছি।'

কৃষ্ণেন্দুর গলার আওয়াজ পেয়ে রম্ভা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বলল, 'ভিতরে আসেন মেজবাবু।'

একটি মাত্র বেতের মোড়া রম্ভার সম্বল। মোড়াটি হীরেনকে দিয়ে সে পিঁড়ি পেতে কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দিল। রামপালকে আগেই জাগিয়ে দিয়েছিল, আবার সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার উপক্রম করছে দেখে জোরে জোরে ঠেলা দিয়ে কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ক্যামনধারা মানুষ তুমি ?'

উঠে বসে হাতের আড়ালে রামপাল মস্ত হাই তুলল, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেনের সম্মান রাখতে চৌকী থেকে নেমে মেঝেতে বসে নিদ্রালস চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

রম্ভার চোখে গভীর ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠা। বারবার সে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হল না। মুখচোখের ভাব একান্ত নির্ব্বিকার রেখে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল রামপালকে, 'তোমার শরীর কি ভাল নেই রামপাল ?'

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে লজ্জিতভাবে রামপাল বলল, 'আজ্ঞে, যা বলেন।'

'সিদ্ধি গিলেছ, না ?'

রামপাল চুপ।

'তুমি একটি অদ্ভুত জীব, রামপাল।' কৃষ্ণেন্দু মৃদু ও অমায়িক হাসির সঙ্গেই বলে, 'তোমার মত আর দেখলাম না। এমন আলসে অকর্ম্মণ্য হয়ে থাক কেমন করে ?'

'দিনভর কাঠ চিরি মেজবাবু।'

'আর কেউ চেয়ে না? তারা তো তোমার মত নিঝুম মেরে যায় না?'

এসব বাজে কথা। রম্ভার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। কৃষ্ণেন্দুকে সে জানে। যত গুরুতর বিষয় হয়, কথা আরম্ভ করতে তার ব্যস্ততা দেখা যায় তত কম, তুচ্ছ কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তত বেশী। ভেতরে সে যে খুব উদাসীন হয়ে থাকে তা নয়, বাইরে এই ভাব দেখায়। অন্যদিন হয়তো তার এই খেয়ালকে রম্ভা প্রশ্রয় দিত, আজ সে আর সবুর করতে পারল না।

'খবর পেয়েছেন কেষ্টবাবু?'

'খবর ভাল নয় রম্ভা।'

শুনে মুখ পাংশু হয়ে যায় রম্ভার।

'জানি বাবাকে জেলে দিবে, ছাড়বে নি।'

'জেল নয় রম্ভা, তোমার বাবার জেল হলে তো বলতাম, খবর ভাল। তোমার বাবা, কি জান রম্ভা,—' কৃষ্ণেন্দুকে একবার ঢোঁক গিলতে হয়,—'বেঁচে নেই।'

রম্ভার বাবা ভাল আছে এই খবরটা যেমন তাচ্ছিল্যভাবে জানানো চলে তার বাবার অপমৃত্যুর সংবাদটাও ঠিক তেমনি ভাবে জানিয়ে দেবে ভেবেছিল, রম্ভা যাতে বুঝতে পারে যে কেবল ছোটখাট ব্যাপারে নয়, মৃত্যুর মত ভয়ানক ব্যাপারেও ভাবপ্রবণতা তার কাছে প্রশ্রয় পায় না, সে পাথরের মত কঠিন। বলার সময় দ্বিধা বোধ করে, রম্ভার বাবাকে খুন করে ফেলা হয়েছে বলতে চেয়ে শুধু সে বেঁচে নেই বলে, নিজের মুখের চেহারা বদলে গেছে টের পেয়ে, কৃষ্ণেন্দু অনেকদিন পরে নিজের কাছে গ্লানিকর লজ্জা বোধ করল। নিজের তার ভাব-প্রবণতা নেই, নিজের সম্বন্ধে এই ধারণা যে তার ভাবপ্রবণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে, এটা আর

কোন মতেই অস্বীকার করা গেল না। বরং রামপালের অবিচলিত, সম্পূর্ণ না হোক প্রায় অবিচলিত, ভাব দেখে সে মনে মনে একটু ঈর্ষাই যেন বোধ করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল রম্ভা। এ আশঙ্কাও তার মনে মনে ছিল, তাই বাপকে যে তার মেরে ফেলা হয়েছে, স্বাভাবিক মরণ তার ঘটেনি, এটুকু তাকে আর বলে দেবার দরকার হল না। কৃষ্ণেন্দু কি কি বলতে যাচ্ছিল, হীরেন বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ। কাঁদতে দে।'

রম্ভা শুনতে পেয়ে কান্নার মধ্যেই বললে, 'এট্টু কেঁদে নি—এট্টুখানি কেঁদে নি।'

দুর্গা ও লক্ষ্মী একটু পরেই ঘরে ঢুকে রম্ভাকে ঘিরে বসল, নিমাই ও পরেশ দাঁড়িয়ে রইল দুয়ারের কাছে। ব্যাপারটা তাদেরও জানা ছিল, রম্ভার মড়া কান্নার অর্থদ্যোতক শব্দগুলি শুনেই তারা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারল কি ঘটেছে। ঘটনা নয়, ফলাফলটা।

রম্ভা একা কাঁদলে হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই কান্না স্থগিত করে দরকারী কথা আলোচনার সুযোগ দিতে পারত, লক্ষ্মী আর দুর্গা তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় কান্নার আবেগ তার ফুলে ফেঁপে উথলে উঠতে লাগল। কান্নায় ভাঁটা পড়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে রাত ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে দেখে কৃষ্ণেন্দু এক সময় বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু কেঁদে আর কি করবে রম্ভা, কেঁদো না। এর একটা বিহিত করা চাই।'

'আর কি বিহিত করবেন কেষ্টবাবু!' রম্ভা বলল কাঁদতে কাঁদতে।

'সেই কথাই বলছি রম্ভা। কান্না থামিয়ে শোনো।'

বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে রম্ভা থামল। তবু, থেকে থেকে নাক আর ঠোঁট তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ভেতর থেকে

শোক ঠেলে উঠতে চাইছে। লক্ষ্মী ও দুর্গা মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে আপশোষের আওয়াজ করতে লাগল, হৃদয়ের কোমল অস্থি যেন বেদনার ভারে মচ মচ করছে। হীরেন ভেবেছিল, বাপকে তার গুলি করে মারা হয়েছে শুনে রম্ভা না জানি কি কাণ্ডটাই করবে, এদের শোক করার রকম দেখে সে একটু থ'-ই বনে গেল। রামপালের ব্যাপারটা সে মোটেই বুঝতে পারছিল না। চোখ দুটি রামপালের এতক্ষণ ছল ছল করছিল, মুখখানা অত্যন্ত করুণ করে সে তাকিয়ে ছিল রম্ভার দিকে। আগাগোড়া সে চুপ করে আছে, কোন প্রশ্ন করে নি, মন্তব্য জানায় নি। বৌ-এর শোক দেখে সে যদি হৃদয় বেদনাতে কাতর হয়ে থাকে, উদ্যোগী হয়ে কিছু জানবার বুঝবার কৌতূহল তার নেই কেন? এবার সে বিছানার হাতখানেক পিছনে সরে বেড়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ দু'টি অর্দ্ধেকের বেশী বুজিয়ে দিল। মুখে তার ফুটে রইল সেই অসহায় করুণ ভাব, দীনতার ব্যথা প্রকাশের ভঙ্গির মত। রম্ভার দুঃখে তার সমবেদনা জেগেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অনুভূতিরই আবেশে নিজে সে যেন হয়ে গেছে বিভোর।

'তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে রামপাল?' হীরেন শুধোল।

'কি বলব বলুন?' রামপাল বলল, ভেজা করুণ গলায়।

'তোমার রাগ হয় না? গা জ্বালা করে না?'

'রাগ হলে আর করছি কি!'—চোখ মেলে রামপাল যেন একটু সজাগ হয়ে উঠল, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও বলি বাবু, শ্বশুরমশায়েরও বাড়াবাড়ি ছিল খানিক। হেরম্ববাবু লোক কি সোজা না মানুষটা সে হেজিপেজি যে তার সাথে গায়ে পড়ে লাগতে যাওয়া? লাখোপতি লোক। সবাই তার বশ—পুলিস তক্। পেটে পেটে তার প্যাচ। নয়তো পুলিশের ফাঁকা আওয়াজের সাথে পুরাণো গাদা বন্দুক ছুঁড়বার বুদ্ধি কি যার তার মাথায় আসে?'

সে সনাক্ত হবে না। হয়তো লাইসেন নেই, কিছু নেই, কেউ জানে না সে বন্দুকের খবর।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি তবে সব শুনেছ রামপাল? আমার মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ, এসব কথা শুনতে তোমার ভাল লাগে না।'

রামপাল নির্লিপ্তভাবে বলল, 'মুখ বুজে থাকলে কানে শুনতে বাধা কি কেষ্টবাবু? কথা না কইলে তো কালা হয়ে যায় না মানুষ!'

কৃষ্ণেন্দু রেগে বলল, 'কথা কইতে হয় রামপাল। বৌয়ের বাপকে একজন কুকুর বেড়ালের মত গুলি করে মেরেছে শুনলে কথা কইতে হয়। মনে মনে যদি বুঝতেও পেরে থাক বীরেশ্বর বোকামি করেছে, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হয়েছে তার, তবু কথা কইতে হয়।'

শুনে রামপাল দমে গেল। ডান হাতের তালুতে একবার মুখ মুছে বিড়বিড় করে বলল, 'কি জানি কেষ্টবাবু, জানি না। হাঁ, দুঃখু হয় বৈকি আজ্ঞা, নিশ্চয় হয়। শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

তারপর রামপাল আর মুখ খুলল না। কথা কইল কৃষ্ণেন্দু। নিষ্ঠুর সরলতার সঙ্গে কাঁটাছেঁড়া সহজ ভাষায় সে বলে গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের কথা। বীরেশ্বরের অপমৃত্যু যার নমুনা। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে বীভৎস, এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক আলোচ্য বিষয় মানুষ তো আজ পর্য্যন্ত কল্পনাতেও আবিষ্কার করতে পারে নি, কৃষ্ণেন্দু নিজেকে সামলাতে পারল না। মানুষ ভাগ হয়ে গেল হেরম্ব আর বীরেশ্বরে: যুগযুগান্ত ধরে হাজার হাজার হেরম্বের চোরা গুলিতে কোটি কোটি বীরেশ্বর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগল। অহরহ যে গভীর ক্ষোভ থমথম করে কৃষ্ণেন্দুর মনে, রম্ভার শোকের তাড়নে আজ বুঝি তাতে ঢেউ উঠেছে, কি যে ম্যাজিক এসেছে তার কথায়। রামপালের খোলার ঘরে আজ মাঝ রাত্রে অনায়াসে যে অদ্ভুত এক প্রভাব সে সৃষ্টি করল, উৎসাহী, চিন্তাশীল

দরদী মানুষের বড় বড় আসরে প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে তা কোনদিন পেরে ওঠেনি। সে চুপ করে যাবার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে হতে লাগল, পুরাণো লণ্ঠন থেকে যেমন অবিরাম ক্ষীণ লালচে আলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তেমনিভাবে এই মানুষটার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সারা বিশ্বের নিপীড়িত আত্মার, শুধু আজকের নয়, গত এবং আগামী কালেরও, অফুরন্ত স্পন্দন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের নরনারী ক'জন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আজ তাদের প্রথম ভারবাহী পশুর জীবনের উপলব্ধি এসেছে।

প্রতিবাদ করল রামপাল। সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'এমন করে শোকটা কি উস্কে দিতে হয় কেষ্টবাবু? রাত ভোর গোঙাতে লাগবে।'

দমকা বাতাসে যেমন ধোঁয়া উড়ে যায়, রামপালের মন্তব্যে তেমনি উড়ে গেল এতগুলি হৃদয়ের তীব্র তপ্ত অনুভূতির বাষ্প। মুখে মৃদু হাসি দেখা দিয়েছে খেয়াল হওয়া মাত্র হীরেন তাড়াতাড়ি মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করে ফেলল। হাঁ বুজে আবার চোখ ছলছলিয়ে এল রম্ভার। খাল ধার থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে ছোট জানলাটি দিয়ে, জানলার পাটে লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে পোকা ধরছে একটা টিকটিকি। ওদিকে ঘুম ভেঙ্গে কাঁদছে দুর্গার ছেলে।

কথা কইতে মনে হল কৃষ্ণেন্দুর গলাটা যেন একটু ভোঁতা হয়ে গেছে।

'বেশী কাঁদাকাটা কোরো না রম্ভা। কাল এখানকার সব ব্যবস্থা করে পরশু ঝুমুরিয়া যাব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, তোমার বাবার মরণের একটা বিহিত না করে ফিরব না।'

শুনে রম্ভা আবার কাঁদবার উপক্রম করে বলল, আমিও যাব ঝুমুরিয়া।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আমি তো আর তোমায় নিয়ে যেতে পারব না রম্ভা, রামপালকে বল।'

রম্ভা সজল চোখে রামপালের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য মনে হল রামপাল বুঝি কোন জবাব দেবে না। তারপর ধীরে ধীরে সে বলল, 'তা একবার নিয়ে যেতে হবে বৈকি।'

খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন বিদায় নিল। নরেশ ঘরের বাইরে দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে ছিল, সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে সহজে সে কৃষ্ণেন্দুর ধারে কাছে ভিড়তে চায় না। যাবার সময় হঠাৎ সে আজ কৃষ্ণেন্দুর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল। তার মনের বাষ্প তখনো উপে যায় নি।

'এ আবার কি?'

'কিছু না মেজোবাবু।'

'তুমি একটি আস্ত উল্লুক, নরেশ। ওসব ভক্তি টক্তি আমার কাছে চলবে না।'

'আজ্ঞে না।'

তখন নরম হয়ে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলি এতদিন?'

নরেশ ঢোঁক গিলে বলল, 'হেথায় হোথায় ছিলাম। আমাকে ঝুমুরিয়া লেবেন সাথে? আমিও একচোট লড়ব মেজোবাবু।'

'কার সাথে লড়বি?'

'হেরম্ববাবুর সাথে।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে হীরেনকে বলল, 'হুকুম দিলে ও এখন হারাকিরি পর্য্যন্ত করতে পারে হীরেন।'

হীরেন মাথা নেড়ে বলল, 'আমার সন্দেহ আছে। ছুরিটা পেটে ঠেকাতে পারবে, তারপর কি করবে বলা কঠিন। আমি ভাবছি রামপালের কথা। লোকটা এমন অপদার্থ জানতাম না।'

'ওরা সবাই এরকম। কত চেষ্টায় ওদের কাছে কতটুকু সাড়া পাই জানলে চোখে তোর জল আসত। চেহারা দেখে মনে হয় রামপালের মধ্যে বুঝি কিছু আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত, ওর সম্বন্ধে তাই বেশী হতাশা জাগে। নয়তো আর দশজনের চেয়ে বেশী অপদার্থ লোকটা নয়।'

দাওয়া থেকে নামবার আগে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। রামপাল শুয়ে পড়েছে। গানের মত মিহি সুরে রম্ভা আবার শোক সুরু করেছে। নরেশের আবেদনের জবাব দিতে ভুলে গিয়ে হীরেনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু চলে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে রামপালের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঠেলে ঠেলে তাকে জাগিয়েছে রম্ভা। জাগিয়েই একটু তফাতে সরে গিয়ে সে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না সুরু করে দিল। একবার সে রামপালের বুকে আসতে চায়, একটু সহানুভূতি চায় তার কাছে।

রামপাল তাকে হঠাৎ সজোরে বুকে চেপে ধরল। আবেগে অথবা ঘুম ভাঙ্গানোর রাগে বুঝতে না পেরে রম্ভা একটু ভয় পেয়ে গেল, আলিঙ্গনে দম আটকে আসায় কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল আচমকা।

'এখন তক্ কাঁদছিস্ সোণা? আহা রে। চুক্ চুক্।'

'মুই সইতে লারছি গো, সইতে লারছি।'

'চুক্ চুক্।'

'কাল মোকে নিয়ে চল ঝুমুরিয়া। পরশু তক থাকতে লারব।'

'কাল ঝুমুরিয়া যাবি? নিয়ে যাব। সোণাটি আমার কাঁদিস নে, ঝুমুরিয়া তোকে নিয়ে যাব কাল।'

তখন নিশ্চিন্ত হয়ে রম্ভা গা এলিয়ে দিল। রামপাল তার চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। এখন কয়েকদিন, হয়তো সাতদিন, হয়তো তারও বেশীদিন, রামপাল তাকে পাগলের মত ভালবাসবে।

সাত

পরদিন রম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া গেল। নিশুতি রাতে রম্ভাকে কথা দিয়েছিল বলে নয়, নিজে সে হিসেব করে দেখল, কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া যাওয়াই ভাল। বীরেশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরিয়ার সব হাঙ্গামা যে চুকে গেছে এ ভরসা রামপালের ছিল না। হেরম্ব চক্রবর্ত্তী কেবল বীরেশ্বরকে নিপাত করেই ভালমানুষ হয়ে গেছে কিনা বলা কঠিন। বীরেশ্বরের যোয়ান যোয়ান ব্যাটা আছে তিনটি, বাপের অপমরণকে তারা কি ভাবে গ্রহণ করেছে, একদম চুপচাপ হয়ে গেছে অথবা প্রতিশোধের জন্য কোমর বেঁধে হৈ চৈ কাণ্ড সুরু করেছে, দূর থেকে তাও ঠিকমত অনুমান করা অসম্ভব। বড় ছেলে শ্যামলাল হিসেবী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তার ওপর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে থাকায় বিশেষভাবে সংসারীও বটে। সে হয়তো কিছু করবে না। মেজো ছেলে জীবনলাল একটু ভাবুক ধরণের, একবার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, তারপর বাড়ী ফিরে বিয়ে করে আবার সংসারী হয়েছিল বটে কিন্তু একটি ছেলে রেখে বৌটা তার সম্প্রতি মরে গেছে। তার এই আত্মহারা অবস্থায় সব কিছুই সম্ভব। ছোট মোহনলালের কোন সাংসারিক বন্ধন নেই, বুদ্ধি বিবেচনা আছে কিনা সন্দেহ, রক্তও যে তার অত্যধিক গরম রামপাল তা ভাল করেই জানে। চুপচাপ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করার ছেলে সে নয়। সে যে কি আরম্ভ করেছে ভগবান জানেন। বীরেশ্বর ছাড়া ঝুমুরিয়ার আরও কয়েকজন হেরম্ব চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, তারা অবশ্যই ইতিমধ্যে তার অনুগত হয়ে যায়নি। সুতরাং ঝুমুরিয়ার অবস্থা এখন বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এই অবস্থায় কৃষ্ণেন্দু সেখানে চলেছে বীরেশ্বরের অপমরণের বিহিত করতে। রম্ভাকে সে কথা দিয়েছে। তার গোঁ রামপালের অজানা নয়। ঝুমুরিয়ার মানুষগুলি যদি ঝিমিয়ে পড়ে থাকে, সে গিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। নিবু নিবু আগুণে বাতাস দিয়ে দিয়ে, নেভা আগুনের ছাই-এ তেল ঢেলে, সে আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তখন ঝুমুরিয়ায় বাস করা মোটেই সঙ্গত হবে না।

রম্ভাকে একবার না নিয়ে গেলেও নয়। সবদিক বিবেচনা করে রামপাল তাই কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই ভাল মনে করেছে। যদি বোঝে ব্যাপার সুবিধে নয়, একরাত্রি সেখানে বাস করে কৃষ্ণেন্দু গিয়ে পৌঁছবার আগেই রম্ভাকে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসবে। ফিরে যদি রম্ভা আসতে না চায়, জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কাঁদাকাটা যদি একটু করে তো করবে, উপায় কি!

এত সব চিন্তা করে সকাল আটটার গাড়ীতে রম্ভাকে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া রওনা হল। গাড়ীতে ছিল অসম্ভব ভিড়, প্রত্যেকটি থার্ডক্লাস কামরায় গরুছাগলের মত গাদাগাদি করে মানুষ উঠেছিল, চিরদিন যেমন ওঠে। ভিড় ঠেলে উঠবার সময় রম্ভা একবার এঁকে বেঁকে দুলে উঠে বিশ্রীভাবে মুখ বাঁকিয়েছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে রামপাল শুধিয়েছিল, 'কেরে? কোন লোকটা?'

রম্ভা জবাব দেয়নি। শুধু মাথা নেড়েছিল।

'দেড়া ভাড়ার টিকিট কিনি?'

'না।'

একদিকের লম্বা বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসেছিল মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক এবং তাকে পুরুষের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে তার এপাশে ছিল কানে আধপোড়া সিগারেট গোঁজা টেরিকাটা তার সঙ্গী। মোলায়েম

হাসির সঙ্গে রামপাল সকরুণ আবেদন জানাতে সে রম্ভাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'টি বেঞ্চের মাঝখানে নিজের বোঁচকার ওপর বসল। রামপাল কৃতজ্ঞতাও বোধ করল না, খুসীও হল না। লোকটার চাউনি সাপের মত,—মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত। স্ত্রীলোকের পাশে বসবার সুযোগ রম্ভা পেয়েছে কিন্তু এপাশে তার গোঁফওয়ালা যোয়ান মদ্দ পুরুষ। বিব্রত হয়ে পাশের মানুষকে ঠেলা দিয়ে লোকটি তার আর রম্ভার মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার চেষ্টা করেছে বটে, একটু কাত হয়ে রম্ভার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছে, তবু গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে আছে খানিকটা।

এত করে বলে রামপাল, মেয়েদের গাড়ীতে রম্ভা কিছুতে যাবে না। কি যে মতিগতি ওর কে জানে। মনে মনে হয়তো সে এইসব চায়, ভিড়ের চাপ, অজানা পুরুষের বজ্জাতি, লোভাতুর দৃষ্টিপাত। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই!

ঘন ঘন রামপাল তার মুখের দিকে তাকায়। কিছু নেই রম্ভার মুখে। গভীর বিষাদ ছাড়া আর কিছুর হদিস মেলে না। কে ছোঁয় আর কে চায় যেন গ্রাহ্যই নেই তার, ওসবে কিছু যেন আসে যায় না, মানুষের এই সব অপব্যবহার যেন উচিত অনুচিত বিবেচনার পর্য্যায়েই পড়ে না। এসব কৃষ্ণেন্দু ওকে শিখিয়েছে। অন্দর বাহির একাকার হয়ে যাওয়া ভাল, স্ত্রীলোকের দিকে পুরুষের তাকানো খাবারের দিকে মানুষের তাকানোর মতই স্বাভাবিক, খাদ্যে ক্ষুধাতুর, নারীতে কামাতুর। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগোবে, ধাক্কা খেলে ধাক্কা দেবে, মাথা উঁচু করে চোখ তুলে তাকাবে। কৃষ্ণেন্দুর কাছে এই সব কথা শুনে মাথাটা রম্ভার বিগড়ে গেছে। ওই শিক্ষা সে কাজে লাগাচ্ছে মাত্র। আর কিছু নয়।

অপরাহ্নে তারা ট্রেণ থেকে নামল। ষ্টেশন থেকে ঝুমুরিয়া প্রায়

দু'ক্রোশ পথ, গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। গাড়ী চলতে সুরু করলে রম্ভার মনে হল গাড়োয়ান তার চেনা।

'ঝুমুরিয়া ঘর বটে না?'

'নাহঁক। মোর ঘর পাঁচনিখে। তুমাকে চিনি তালেও মেয়্যা।'

দিব্বু গাড়োয়ানের কাছে ঝুমুরিয়ার খবর পাওয়া গেল। অন্য সব কৃষ্ণেন্দুর কাছে শোনা পুরাণো খবর, নতুন খবর শুধু এই যে ঝুমুরিয়ায় এখন কোন গোলমাল নেই। হাঙ্গামার দিন পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছিল, দু'দিন পরে আরও তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে। না, রম্ভার ভাই তারা নয়, রম্ভার ভায়েরা তিনজনেই সুস্থ শরীরে কাজকর্ম্ম করছে। গাঁ এখন শান্ত, সকলে শিষ্ট ভালমানুষ হয়ে আছে।

শুনে রামপাল অনেকটা নিশ্চিন্ত হল কিন্তু পুরোপুরি খুসী হতে পারল না। মনে তার কি যেন একটা প্যাচ আছে, মানুষের এই নিষ্ক্রিয় ভালোমানুষী চিরদিন তার মধ্যে অসমর্থন জাগিয়ে তোলে, মৃদু অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কেবলি মনে হয়, এরকম হওয়া যেন উচিত ছিল না। নিজে সে সবরকম হাঙ্গামা এড়িয়ে চলতে ভালবাসে কিন্তু অন্যের বীর্য্যহীন সহনশীলতা তার সয় না। তার দিক থেকে ভালই হয়েছে যে ঝুমুরিয়া চুপ করে গেছে, রম্ভাকে ক'দিন বাপের বাড়ী থাকতে দেওয়া চলবে, কাল পরশু টেনে হিঁচড়ে তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার দরকার হবে না, কিন্তু রম্ভার ভাইগুলি, বীরেশ্বরের যোয়ান মর্দ্দ ছেলেগুলি? ঝুমুরিয়ার পুরুষগুলি? ছি!

নতুন রাস্তা ঝুমুরিয়ার কাছাকাছি ষ্টেশনের এই পথকে অতিক্রম করে ঝুমুরিয়ার গা ঘেঁষে গেছে। মোড়ের কাছাকাছি নতুন রাস্তার কাজ এখনো কিছু কিছু চলছে। মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, রাস্তা কতদূর এগিয়েছে। প্রায় সিকি মাইল দূরে বাঁকের কাছে দু'পাশে সারি সারি

খোয়ার স্তূপ, আধ পেশা রাস্তায় ছোট বড় তিনটে রোলার, বাঁকের ওদিকে হয়তো আরও আছে। নবীন সামন্তের আমবাগানের প্রান্তে তিনটি ছোট ছোট তাঁবু আর তালপাতার ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী ঘর। একটি তাঁবুর সামনে ভূর করে রাখা দুরমুস, গাঁইতি, কোদাল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। পথের ওপাশে এক সারি গরুর গাড়ী, গাড়োয়ানেরা গরু খুলে প্রকাণ্ড এক শিমুল গাছের নীচে তাদের বেঁধে খড় ও জল দিচ্ছে, গলায় বাঁধা ঘণ্টার সমবেত টুংটাং শব্দ কানে আসছে অনেক মন্দিরে অনেক সন্ধ্যারতির ইঙ্গিতের মত। একটা লরী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সশব্দে সমুখ দিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। আজের মত কাজ শেষ হয়েছে, কুলীরা অনেকে চলে গেছে, অনেকে এখনো যাচ্ছে। বাঁকের কাছে রাত্রির বিরামের ব্যবস্থায় কতকগুলি মানুষ ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। এখানে ওখানে জ্বলছে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা আগুন।

এই মোড় আর ওই বাঁকের মাঝামাঝি এক অনির্দিষ্ট স্থানের দিকে হাত বাড়িয়ে কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শোচনীয় করে দিব্‌বু বলল, 'ওই হোথা সামন্ত মশায় গুলি খেয়েছে।'

গাড়ী থেমেছিল, আবার চল্‌তে আরম্ভ করল। রম্ভা একটু কাঁদল। গভীর উপভোগ্য বিষাদ ঘনিয়ে এসে রামপালের মন হয়ে গেল উদাস। চর্চ্চা করে করে তার অল্পশিক্ষিত মনের কল্পনা আশ্চর্য্যরকম উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। সামান্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণকে আশ্রয় করে তার মানসচক্ষে ঘটনা ও আবেষ্টনীর ছবি ফুটে ওঠে। আসন্ন সন্ধ্যায় এই গেঁয়ো পরিবেশ, রম্ভার মনোবেদনার ছোঁয়াচ আর সেই সঙ্গে কল্পনায় আম জাম শাল পিয়ালের সবুজ দৃশ্যপটে দিনান্তের আবছা আলোয় মুখোমুখি দু'দল মানুষ। বীরেশ্বরের বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী দাঁড়ানো পর্য্যন্ত রামপালের চোখের সামনে বীরেশ্বর কেবলি অতর্কিতে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল।

গাড়ী থেকে নেমে রম্ভা বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার ক্ষণেক পরেই চার পাঁচটি নারী কণ্ঠে কান্না ধ্বনিত হয়ে উঠল। কারা কাঁদে ? কেন কাঁদে ? ও, বীরেশ্বরের মেয়ে, বৌ ও ছেলের বৌরা শোক করছে। অন্যমনা হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে রামপাল তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

পিঠাপিঠি দু'ভায়ের মধ্যে বয়সের তফাৎ যত কম হওয়া সম্ভব, শ্যামলাল ও জীবনলাল ততটুকু ছোটবড়, কিন্তু দু'জনের চেহারা থেকে সেটা অনুমান করা যায় না। বত্রিশ বছর বয়সে শ্যামলাল ভুঁড়ি বাগিয়ে মাংসপেশী ঢিল করে মুখে ভারিক্কি ভাব এনে নিজের চেহারাটি দাঁড় করিয়েছে, চল্লিশ পেরোনো গেরস্তের মত, জীবনলালকে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বাপের মত তার শক্ত বাঁধুনির জোরালো দেহ। শ্যামলাল রোগা এবং লম্বা। নতুন গোঁপ তার এখনো তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে যায়নি। অশৌচের খাওয়া, জামাই বাড়ী এলেও অল্পসময়ের মধ্যেই সংক্ষেপে সব চুকে গেল। বড়ঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে তারপর কথা বলতে বসল রামপাল, রম্ভার তিন ভাই এবং তাদের খুড়ো কাশীশ্বর। ছোট কলাবাগানটির ওপাশেই কাশীশ্বরের ঘর। তার অপরিপুষ্ট শীর্ণ দেহে আর পরণের ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে দারিদ্র্যের ছাপ অতি স্পষ্ট। একটু ভাল অবস্থার ভাইপোদের সঙ্গে বসে আলাপ করার ভঙ্গিটাও খাপছাড়া রকমের বিনয়াপন্ন।

খুড়োর দিকে পিছন ফিরে বসে তামাক টানতে টানতে শ্যামলাল ধীরে ধীরে গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারের ইতিহাস রামপালকে বিশদভাবে শুনিয়ে দিল। শুনতে শুনতে রামপালের মনে হল, সে যেন একটু হেরম্ব চক্রবর্ত্তীর দিকে টেনে কথা কইছে, একেবারে সমর্থন করতে না পারলেও খুব বেশী দোষ দেখতে পাচ্ছে না লোকটার। আহা, হেরম্ব চক্রবর্ত্তী কি আর ভালমানুষ দেবতা, তা বলছে না শ্যামলাল। ওসব লোক

ওইরকম হয়। বীরেশ্বর বেশীরকম বাড়াবাড়ি করেছিল। অতটা না করলেই হ'ত।

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কিছুটাক্।' কাশীশ্বর সায় দিল।

'কিসের বাড়াবাড়ি?' ঝাঁঝালো সুরে মোহনলাল জিজ্ঞেস করল। শ্যামলাল একবার তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। হুঁকোটা কাশীশ্বরের কাছে বেড়ায় ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে উঠে একবার ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এল।

না, হেরম্ব চক্রবর্ত্তীকে পিতার হত্যাকারী বলে ধরে নিতে শ্যামলাল রাজী নয়। কার বন্দুক কোথা থেকে কে ছুঁড়েছিল না জেনে আন্দাজে একজনের ঘাড়ে দোষ চাপালেই তো হয় না। দোষ কার সঠিক জানা গেলে তাকে শাস্তি দেবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে পথের ভিখারী হতে সে রাজী আছে, জীবনটাই নয় দিয়ে দেবে। কিন্তু অন্ধকারে ঢিল সে ছুঁড়বে কোনদিকে, কার দিকে?

'সে নয় তো কে ছুঁড়বে বন্দুক?' মোহনলাল মন্তব্য করল।

শ্যামলাল মাথা নেড়ে বলল, 'কে জানে কে ছুঁড়বে। শত্তুর কি একটা ছিল, লোকের পেছনে লাগা রোগ ছিল বাবার।' সজোরে শ্যামলাল নিঃশ্বাস ফেলল।—'ভগবান আছেন। মোদের যে সর্ব্বনাশ করেছে সে ধরা পড়বে। পুলিশ খোঁজ করছে।'

'পুলিশ! পুলিশ ও ব্যাটার দলে।'

মোহনলাল এক একটা ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঝাঁঝাঁলো মন্তব্য করে আর মুখ ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অন্ধকার উঠানের দিকে। মনের জ্বালার তাপে মুখ চোখের যে অবস্থা হয়েছে ছেলেটার, একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলে তেমন হয়। একটু উস্কে দেবার কেউ থাকলে যে কোন মুহূর্ত্তে সে গিয়ে হেরম্বকে খুন করে আসতে পারে।

জীবনলাল কম কথা কয়। সে বলল, 'মোরাও তলে তলে সাক্ষী-

প্রমাণ খুঁজছি। কেষ্টবাবু এসে পড়লে শলা পরামর্শ মিলত। দাঙ্গার ব্যাপারটাতে মোদের জড়িয়ে দিলে মুস্কিল হয়ে যাবে।'

শ্যামলাল যেন একটু জোর দিয়েই বলল, 'মন করে যে তা জড়াবে না। অ্যাদ্দিনে তবে টেনে নিয়ে যেত।'

দাঙ্গা হয়নি, বাধবার উপক্রম শুধু হয়েছিল। মোট যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাকি দাঙ্গা করার অভিযোগেই চালান দেওয়া হবে। ওরা আটজনেই অবশ্য হেরম্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সেদিন ঘটনাস্থলে সকলে তারা উপস্থিত ছিল না। শ্যামলালদের তিন ভাইকে কেন যে ধরা হয়নি এটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হয়েছে সকলের।

শ্যামলাল সেদিন গাঁয়েই ছিল না সত্য কিন্তু বৈকুণ্ঠ দাসও তো ছিল না গাঁয়ে, তাকে দু'দিন পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জীবন ও মোহন বাপের সঙ্গেই ছিল, ওদের দু'জনকে পুলিশ অনায়াসে ধরতে পারত। সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরের ছেলেরা রেহাই পাওয়ায় গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে যাদের ধরা হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের ওপর নাকি একটু চটে গেছে। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বের মানে তারা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে দু'একজন করে গ্রাম থেকে আটদশজন লোক এসে বীরেশ্বরের ঘরের দাওয়ায় জড়ো হল। তাদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণেন্দু কবে আসবে জানতে এসেছে, কৃষ্ণেন্দু এসে পড়েছে শুনে কেউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে কৃষ্ণেন্দুর প্রতীক্ষা করছে টের পেয়ে রামপাল একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। গ্রামে কৃষ্ণেন্দুর যাতায়াত খুব বেশী নয়, গ্রামের লোকের ওপর তার এতখানি প্রভাব সে কল্পনা করতে পারেনি। অনেকদিন থেকে মুখে মুখে কৃষ্ণেন্দুর বিষয়ে নানা কথা গ্রামে রটেছে, তার সম্বন্ধে গ্রামের লোকের

ধারণা গড়ে উঠেছে সেই সব শোনা কথাকে ভিত্তি করে। কৃষ্ণেন্দুর অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি ত্যাগ ও ক্ষমতায় এদের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, কল্পনায় বড় হতে হতে কৃষ্ণেন্দু এদের কাছে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠেছে। সকলের কথায় এই মনোভাবটাই প্রকাশ পেতে লাগল যে কৃষ্ণেন্দু একবার এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যেখানে থেকে যাদের জন্য কৃষ্ণেন্দু কাজ করছে এদের মত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যেও রামপাল কখনো দেখতে পায় নি। নিজেদের গোলমাল মিটিয়ে দেবার ভার কৃষ্ণেন্দুর হাতে তুলে দেবার জন্য এমন আগ্রহও তাদের দেখা যায় না।

মন দিয়ে সকলের আলাপ আলোচনা শুনতে শুনতে একটা ব্যাপার রামপাল টের পেয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু এসে হেরম্বের অন্যায় অত্যাচারে প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবে বলে সকলে তার পথ চেয়ে নেই। অত্যাচার যা হয়ে গেছে তার প্রতিকারের জন্য সকলে তারা বিশেষ উৎসুক নয়। আর যেন অত্যাচার না হয়, শান্তিতে ও স্বস্তিতে তারা যেন দিন কাটাতে পারে, এইটুকু শুধু সকলে চায়। কৃষ্ণেন্দু এসে এ ব্যবস্থাটুকু করে দিক্।

কৃষ্ণেন্দু এসে সন্ধির বদলে লড়াই করতে চাইলে এরা সেটা কি ভাবে গ্রহণ করবে ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্রে রামপালের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, শ্যামলাল এসে নীচু গলায় বলল, 'ঘুমুলে নাকি হে?'

'নাহ্‌ঁক।'

শ্যামলাল বিছানার ধারে বসল।

'সবার সামনে বলতে পারি নি, ভেতরে ব্যাপার আছে অনেক। ধরে আমাদের নিয়ে যেত তিনজনাকে, অনেক কষ্টে সামলেছি। হেরম্ববাবুর কাছে গেছলাম।'

'বটে ?'

'বাবার জন্যে আপশোষ করলেন ঢের। আর বললেন, মোদের মাপ করেছেন। পুলিশকে সামলেছেন উনি। নয়তো তিন ভাইকে মোদের ঘানি টানতে পাথর ভাঙতে হত পাঁচ সাত বছর।'

খানিক অপেক্ষা করে রামপালের সাড়া না পেয়ে শ্যামলাল আবার বলল, 'কি করি বল? সংসার এখনে ঘাড়ে চাপল মোর, আমি ছাড়া দায়িত্ব কার! সবাই মিলে উচ্ছন্ন যাব, ভেবে চিন্তে গিয়ে তাই ঘাট মেনে এলাম বাবুর কাছে। না তো করার কি ছিল বল?'

'বটে তো।'

কিছুক্ষণ বসে শ্যামলাল চলে গেল। সেই যে ঘুম চটে গেল রামপালের, মনে হল ঘুম বুঝি আর আসবে না। রম্ভাও আসে নি। আসবার ভরসাও আর নেই। কোন ঘরে মেয়েদের সঙ্গে সে গল্প করছে অথবা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপের বাড়ী এলে এইরকম করে রম্ভা।

অন্ধকার ঘরে খালি বিছানায় একা শুয়ে থেকে রম্ভার ওপরে রামপালের রাগ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। অন্য কোন চিন্তা মনে তার স্থান পেল না।

কৃষ্ণেন্দুকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য ঝুমুরিয়ার কয়েকজন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে যাবে ভেবেছিল। তাদের মনে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে সকাল-বেলাই কৃষ্ণেন্দুরা গাঁয়ে এসে হাজির হল। একটা গোটা দিনের চেয়ে একটা রাত ট্রেনে নষ্ট করা ভাল ভেবে হীরেন আর নরেশকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

নরেশকে সে ডাকে নি। নরেশ কিন্তু তাকে তাকে ছিল। ট্রেন ছাড়বার মিনিটখানেক আগে সে একগাল হাসি নিয়ে তাদের কামরায়

উঠে দুজন যাত্রীর মধ্যেকার তিন ইঞ্চি ফাঁকটুকু বসবার মত প্রশস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে গেল।

'টিকিট করেছিস ?'

'ইস্! টিকিট্! পিলেটফারম টিকিট কেটেছি একটা তাই ব্যাটাদের ভাগ্যি!'

রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁকটা নরেশের চিরন্তন। পয়সা বাঁচানোটা অবশ্য তার আসল উদ্দেশ্য নয়, সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে আর এক দরজা দিয়ে চেকারকে উঠতে দেখে আরেক দরজা দিয়ে নেমে যেতে বড়ই তার মজা লাগে। তার মনের বাসনা কৃষ্ণেন্দুর জানা আছে। বিনা টিকিটে একদিন সে দেশদেশান্তর বেড়িয়ে আসবে,—দিল্লী বোম্বাই পুরী মাদ্রাজ সিমলা দার্জিলিং, যেখানে যেদিকে যতদূর রেলগাড়ী যায়, বজ বজ ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বাদ দেবে না। এরকম পাগলামি না থাকলে কি টেঁপিকে নিয়ে এ ছেলে পালাতে চায় কিন্তু ঘরে বসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে টেঁপিকে পাওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে! টেঁপিকে সে চায় নি, চেয়েছিল টেঁপিকে নিয়ে শুধু পালাতে। পরে এটা বুঝতে পেরেছিল বলেই ওকে মারার ক্ষোভটা এত কড়া হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর।

বড় একটা ষ্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, টিকিটও দেখা হয়। নীচে নেমে গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করাই নিরাপদ ভেবে নরেশ উঠতে যাবে, কৃষ্ণেন্দু তাকে চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল। আলপাকার জীর্ণ মলিন কোট গায়ে চেকারকে গাড়ীতে উঠতে দেখে নরেশ আরেকবার ব্যাকুলভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর এক হাতের জোরের সঙ্গেই বা সে পারবে কেন! মৃদু হেসে মাথা নেড়ে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'পালালে চলবে না। বসে থাক্।'

হতভম্ব হয়ে নরেশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অন্যদিন

আগে কৃষ্ণেন্দু তাকে মারতে মারতে প্রায় বেহুঁস করে দিয়েছিল, সে তো ভুলবার কথা নয়। আজ আবার তাকে নিয়ে সে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলবার মতলব করেছে অনুমান করবার ব্যাকুলতায় দৃষ্টি যেন তার সেঁটে রইল কৃষ্ণেন্দুর মুখে।

চেকার কাছে এলে কৃষ্ণেন্দু তাকে ছেড়ে দিল।

'আমরা তোমার টিকিটের দাম দিতে পারব না, নরেশ, চেয়ো না কিন্তু। গোড়ায় বললে টিকিট কিনে দিতাম, এখন একটি পয়সা দেব না।'

চেকার টিকেট চায়, নরেশ একদৃষ্টে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে সে কৃষ্ণেন্দুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। দুচোখে তার তাই ভর্ৎসনা ও অনুযোগের যেন সীমা নেই। তার এই নিঃশব্দ অভিযোগের ঔদ্ধত্য এত বেশী স্পষ্ট ও অভিনব যে কৃষ্ণেন্দু মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে একটু অস্বস্তিও বোধ করতে থাকে।

'বেশ লোক আপনি!'

কৃষ্ণেন্দুকে এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়ে নরেশ ধাঁ করে তার সার্টের পকেট থেকে এইটুকু একটি চামড়ার ব্যাগ বার করল এবং তার ভেতর থেকে অনেক ভাঁজে ছোট করা আস্ত একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে চেকারকে শুধোল, 'চেঞ্জ হবে মশাই?'

সেই থেকে কি যে হল নরেশের, সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গিয়ে মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে রইল। মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকায় আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছোট ষ্টেশনে একদল যাত্রী নেমে যেতে জানালার ধারে গিয়ে মাথাটা বাইরে গলিয়ে বহুক্ষণ একভাবে বসে রইল। হীরেন বাড়ী থেকে দশ বার জনের খাবার সঙ্গে এনেছিল, পথে উপোস করে মারা যাওয়ার আতঙ্কটা তার অতিশয় প্রবল। খাবারের ভাগ নিয়ে নরেশ আনমনে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে পুরতে লাগল। খিদেও যেন তার পায় নি।

কি যে খাপছাড়া মনের গতি এসব পাগলাটে ছেলের! মেরে রক্তপাত করে দেওয়ার পর দেখা হতে যে ভক্তি-গদগদ চিত্তে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসেছিল, সামান্ত একটু শিক্ষা দেবার চেষ্টা করায় আজ সে অভিমানে আত্মহারা হয়ে গেছে। কিন্তু অভিমান যদি করে থাকে, অভিমানের কথাই কিছু বলুক, অনুযোগ দিক। কৃষ্ণেন্দু ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল।

'টাকা কোথায় পেলি?'

'চুরি করেছি।'

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে কৃষ্ণেন্দুর মুখে কথা সরল না।

'পরের ষ্টেশনে পুলিশ ডাকবেন না?'

এ তো অভিমান জানানো নয়, রীতিমত গায়ের ঝাল ঝাড়া। নরেশ যে তার মুখের ওপর এভাবে কথা বলতে পারে কৃষ্ণেন্দুর দুঃস্বপ্নেও তা সম্ভব হতে পারত কি না সন্দেহ। ছেলেটার কথার ঝাঁঝে হীরেনও থ' বনে রইল। থেমে থেমে মন্থর গতিতে প্যাসেঞ্জার গাড়ী চলেছে। লোকাল প্যাসেঞ্জাররা নেমে গিয়ে গিয়ে একটু যায়গা হয়েছিল গাড়ীতে, গুটিসুটি হয়ে কোনরকমে শোয়া চলে। শোয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ আশ্চর্য্যরকম মোলায়েম গলায় বলল, 'কাজটা একটু অন্যায় হয়ে গেছে নরেশ। অত ভেবে দেখি নি।'

নরেশের কাছে এইভাবে একরকম ক্ষমা চেয়ে কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ঘণ্টা দুই পরে একবার ঘুম ভেঙ্গে ছাখে, নরেশ ওপাশের বেঞ্চে গিয়ে শুয়েছে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, ছেলেটা তাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছে, এজীবনে কখনো সে আর তার মন পাবে না। সে গভীর বিষাদ অনুভব করে, সেই সঙ্গে অপরাধ করার একটা কষ্টকর অনুভূতি। ভগবানের মত ভক্তকে কষ্ট দেবার স্বভাবটি সে কেমন চমৎকার আয়ত্ত করেছে! কত অন্যায়ের পাশ কাটিয়ে চলে, তাকে যে

মানে না তার ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা কখনো করে না, শুধু যে অনুগত তার ভাল করার উগ্র চেষ্টায় চটকে চটকে সম্পর্কটা তিতো করে দেয়। কত সে সাবধানী আর হিসেবী! যেখানে অধিকার আছে জানে, যেখানে ধরে মারলেও প্রতিবাদ আসবে না জানে, সেইখানে দেখায় বাহাদুরী। শুধু কথা বলে যদি কাজ হয় তাতে তার মন ওঠে না, জমকালো প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

সকালে দেখা গেল, কৃষ্ণেন্দুর আশঙ্কাটাই ঠিক, ক্ষমাচেয়ে নরেশের মন ভেজানো যায় নি। কাছে থেকেও সে যেন এক যোজন দূরে সরে গিয়েছে। ঝাঁঝাঁলো কথা সে আর বলল না, অবিশ্বাস্য গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুকে থেকে থেকে নিরীক্ষণও করল না। কথাবার্ত্তা চালচলন তার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। তবু বেশ বোঝা গেল কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে মন তার ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার অতিরিক্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহারে পদে পদে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।

কৃষ্ণেন্দুর একটি হাসির কথায় হীরেন হেসে আকুল হয়ে গেল, নরেশের মুখের একটি রেখাও বাঁকল না। তখন আর কোন ভরসাই রইল না যে কৃষ্ণেন্দুকে সে আর কোনদিন ভক্তি করবে।

সারাটা দিন সময় আছে ভেবে শশাঙ্ক কৃষ্ণেন্দুদের অভ্যর্থনার কোন আয়োজনই করে নি। আয়োজন আর কি, দাড়িটা কামিয়ে ফর্সা একখানা কাপড় পরে নিজে একটু ফিটফাট হয়ে থাকত, বাগান ও সদরটা একটু সাফ করিয়ে রাখত। অতিথির আদর যত্নের অন্য সব আয়োজন করবার তার ক্ষমতা কই, সে অক্ষম, তার উপার্জ্জন নেই। হীরেনরা কেউ দু'চার দিনের জন্য দেশে এলেও বাড়ীতে পা দিয়েই খরচ-পত্রের কয়েকটা টাকা শশাঙ্কের হাতে দেয়। শশাঙ্ক তাই দিয়ে তাদের

খাতির যত্ন করে। সবটা দিয়ে নয়, কিছু পারিশ্রমিক সে রাখে বৈকি! এবার কৃষ্ণেন্দু তাকে বড় বিপন্ন করল। বাড়ী ঢুকে দু'দণ্ড বসল না, খরচপত্রবাবদ টাকাপয়সা দিল না, পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদির জবাবগুলি ভাল করে দিতে না দিতে সঙ্গী দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বেলা বাড়তে লাগল, তার দেখা নেই। চা জলখাবারের আয়োজন করতেও তো সময় কম লাগে না গাঁয়ে। দুধ চিনি চা সব কিছুই সংগ্রহ করে আনতে হয়। কেনার লোক কম বলে সহরের চেয়ে গাঁয়ে দুধ অনেক সস্তা, কিন্তু দুধের বড় অভাব গাঁয়ে। গরু যদি বা থাকে দু'চারটা, রোগা প্যাটকা মুমূর্ষু গরু, দুধ দেয় এই এতটুকু। বেশী বেলা হলে দুধও হয়তো শশাঙ্ক একেবারেই যোগাড় করতে পারবে না। দুপুরের খাওয়ার জন্য মাছতরকারী কিনতেও দেড় ক্রোশ দূরে লোক পাঠাতে হবে, সে সব কিনে নিয়ে এলে তবে চড়বে রান্না। শাক চচ্চড়ি দিয়ে তো অতিথিদের ভাত দেওয়া যাবে না! শশাঙ্ক এখন করে কি?

শেষ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। দিগম্বরী সকলের সকালবেলার জলখাবারের ফেন-ভাত নামাচ্ছিল, মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'নিজের পয়সা খরচ করেই সব আনো। ঠাকুরপো তাড়াতাড়ি দরকারী কাজে চলে গেছেন, ফিরে এসে তো টাকা দেবেন? অত ভাববার কি আছে!'

তাই বটে! এই সহজ কথাটা তো তার খেয়াল হয় নি! শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত হয়ে দুধের জন্য লোক পাঠিয়ে নিজেই রাঘব মহান্তির দোকানে চা চিনি প্রভৃতি সওদা আনতে গেল।

বীরেশ্বরের বাড়ী বেশী দূরে নয়, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে সম্ভাষণ ও প্রশ্নের বাধায় বারবার হীরেন ও কৃষ্ণেন্দুকে থামতে হল। কখন এল, কতদিন থাকবে, কোথায় যাচ্ছে, বাড়ীর খবর কি ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যেকে জানতে চায়, পথে দাঁড় করিয়ে ধীর মন্থর অন্তরঙ্গ আলাপের

মধ্যে জানতে চায়। এরা ঝুমুরিয়ার ভদ্র অধিবাসী। গরীব চাষী মজুরেরা শুধু প্রণাম জানায়, দাঁড় করিয়ে আলাপ করার স্পর্দ্ধা তাদের নেই। নরেশ এক সময় কোথায় সরে পড়ল জানা গেল না। কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন যখন বীরেশ্বরের বাড়ী পেঁছিল তখন বেলা হয়েছে, দ্বিতীয় দফা চায়েও আদা দেওয়ার জন্য রামপাল নিন্দে করছে গ্রাম্য রুচির।

কথার অনিবার্য্য অপচয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে চুকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু কাজের কথা পাড়ল। 'সবার আগে তোমাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা কয়ে নেওয়া দরকার মনে করছি শ্যামলাল। তোমাদেরি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বেশী। তারপর অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। চা'টা আনিয়ে দি কিছু?'

'গাড়ী থেকে নেমে ষ্টেশনে আমরা খেয়ে নিয়েছি, ওসব নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমরা কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করি নি।'

'কিছুই না? কোন পরামর্শ হয় নি তোমাদের?'

'আজ্ঞে না। আপনার পথ চেয়ে ছিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর নি, একি একটা কথা হল?'

হীরেন বলল, 'আহা, অত কথার মারপ্যাচ ধ'রো না। সেরকম পরামর্শ হয়েছে বৈকি, অনেক হয়েছে। ও বলতে চায়, পরামর্শের কোন ফল হয় নি।'

শ্যামলাল কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন বাবু। আপনা আপনির ভিত্‌রে উই ছাড়া কি কথা আছে মোদের, কিন্তু কথা কয়ে থই মিলছে না কো।'

কথা কয়ে কৃষ্ণেন্দুও থই পাবে মনে হল না। বাপের মৃত্যুকে এরা তিন ভাই কি ভাবে গ্রহণ করেছে, সেই অত্যাচারের কিরকম প্রতিকার

এরা চায়, সে জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে এরা রাজী আছে, এসব মোটামুটি আন্দাজ করে নেবার ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দুর ছিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করে একটি স্পষ্ট ধারণাও সে আয়ত্ত করতে পারল না। তিন ভাই কথা কয় তিন রকম, আবার ভিন্ন ভিন্নভাবে ধরলে প্রত্যেকের কথা উল্টোপাল্টা, পরস্পরবিরোধী, অর্থহীন। এখন একজন তার যে কথায় সায় দেয় একটু পরে একেবারে তার বিরুদ্ধ কথাতেও সে-ই আবার সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন জানিয়ে বসে। ক্রমে ক্রমে যখন গাঁয়ের অনেকে এসে পৌছল এবং বিশেষ ভাবে বীরেশ্বরের মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ না থেকে হেরম্ব চক্রবর্ত্তীর অনাচার অত্যাচার সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা আরম্ভ হল তখনও কৃষ্ণেন্দু কারো মনের কূলকিনারা খুঁজে পেল না। প্রতিশোধের বদলে নিছক প্রতিকারের ব্যবস্থাই যে এরা তার কাছে প্রত্যাশা করছে, এটুকু বুঝতে অবশ্য তার রামপালের চেয়ে বেশী সময় লাগে নি। এটা বুঝতে তার ঝুমুরিয়া আসবার দরকার ছিল না, দূর থেকেই অনুমান করে নিতে পারত। বর্ত্তমান অরাজকতায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এদের দেহমনের, কোনরকমে শান্তিতে থাকার উপায় না খুঁজে লড়াই করতে চাইলেই এদের পক্ষে বিস্ময়কর হত। সে কথা নয়। আরও বেশী হাঙ্গামার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাক, হেরম্বের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট মনোভাব তো এদের আছে? ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা বিদ্বেষের জ্বালা তো এরা অনুভব করে? মনে মনে কামনা তো এরা করে যে হেরম্বের সর্ব্বনাশ হোক, সে উচ্ছন্ন যাক? সকলের এই মানসিক বিরুদ্ধতার গভীরতা আবিষ্কার করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রাগ দুঃখ হিংসা দ্বেষ ক্ষোভ বিরক্তি অসন্তোষ সব আছে এই মানুষগুলির মধ্যে, কিন্তু দু'একজন ছাড়া—কমবয়সী দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তেজনাপ্রবণ দু'একজন ছাড়া, সকলেই যেন ক্ষমা করেছে হেরম্বকে। বীভৎস রোগে অকথ্য যন্ত্রণা পেয়ে আজ যদি

হেরম্ব মরে যায়, শিয়াল কুকুরে যদি টেনে ছিঁড়ে খায় তার দেহ, সকলের হাড়ে বাতাস লাগবে। তবু তাকে আঘাত করতে কেউ চায় না।

জগৎ দাসের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটা হাঙ্গামার দিন বাড়ী থেকেই বার হয় নি, সর্দ্দিজ্বর হয়েছিল। জগৎ বলল, 'দশঘর সাঁওতাল প্রজা আছে, তাদের ছাড়িনি কো। সেই রাগে ছেলেটাকে ধরিয়েছে। বড় চড়া রাগ মানুষটার। চোখ যেন লাল হয়ে আছে জবাফুলের নাখান চব্বিশ ঘণ্টা। মাথাটাথা বিগড়ে যাবে এবারে, পাগলা হয়ে যাবে। ঘরে বসে ওসব তন্তর সাধন কি সয় মানুষের, বিষয়ী মানুষের, কারবার চলে ডাকিনী যোগিনী নিয়ে!'

বিপিন কুমার সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। মানুষটা, জানো কেষ্টবাবু, নেহাৎ মন্দ ছিল নাকো। ওই করে বেঠিক হয়ে গেছে গা মাথাটা।' শিবু নন্দী সেদিন মার খেয়েছিল, বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। পুলিশের টানাটানির ভয়ে জখমের কথা সে কাউকে বলে না, সর্ব্বদা গায়ে চাদর জড়িয়ে গোপন করে রাখে। শিবু বলল, 'মোর কথাও তাই। বলি, সংসার যদি করবে তো সংসারী হয়ে সংসারে থাকো, না তো সন্নেসী হয়ে বনে শ্মশানে গিয়ে কর ওসব। রাতভোর মড়ার বুকে আসন পিঁড়ি বসে থেকে ভোরে সিন্দুকের পয়সা গোণা, ও হয় না কো।'

আগেও আলোচনা বহুবার বিপথে চলবার উপক্রম করেছিল, কৃষ্ণেন্দুর জন্য হয়ে ওঠে নি। এবার সে বাধা না দেওয়ার পূরাদমে তন্ত্রমন্ত্র সাধনভজন সাধু সন্ন্যাসীর গল্প সুরু হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর কাটাকাটা কথা আর জেরায় সকলে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দশটা আজে বাজে থেই ছাড়া কথার মিশাল না দিয়ে এতক্ষণ একমনে কেবল একটা বিষয়ে তারা কথা বলতে পারে না, তা সে যতবড় গুরুতর

বিষয়ই হোক। হেরম্বের একটি গুরু ছিলেন, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু। এখন তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তার অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপের কাহিনী শুনতে শুনতে সকলে আরাম বোধ করে। অন্যমনে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণেন্দু খানিক শোনে খানিক শোনে না।

স্নানাহারের তাগিদে একসময় বৈঠক খতম হয়ে যায়। বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলের মুখপাত্র হিসাবে জগৎ দাস বলে. 'তবে ওই কথা রইল কেষ্টবাবু?'

'কোন্ কথা?'

হীরেন তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, ওই কথাই রইল বৈকি। চারিদিকের অবস্থা দেখে বুঝে শুনে কেষ্টবাবু যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।'

এত বেলায় গাঁয়ের পথঘাট নির্জ্জন হয়ে এসেছে। গাছে গাছে শুধু হনুমানের লাফালাফি। এ অঞ্চলে খুব হনুমান দেখা যায়। কৃষ্ণেন্দু গম্ভীর বিমর্ষ হয়ে পথ চলছিল, বড় একটা নিমগাছের কাছে দাঁড়িয়ে খনিকক্ষণ সে একপাল হনুমানের লীলাখেলা চেয়ে দেখল। তিনটি হনুমতী উকুন বেছে বেছে পালের গোদার অঙ্গসেবা করছে, সে দুই হাঁটুতে হাত রেখে আরামে চোখ বুজে বসে আছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কি অপরাধে একটি সেবিকাকে সে সজোরে চড় বসিয়ে দিল। লাফিয়ে তফাতে সরে খানিকক্ষণ কিচির মিচির করে সেবিকাটি যেন অভিমান করেই গোদার দিকে পিছন করে বসল এবং সন্তানকে বুকে নিয়ে অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে স্তন দিতে লাগল।

হীরেন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

কৃষ্ণেন্দু চলতে আরম্ভ করে বলল, 'লিভারের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, খিদে তোর কখনো পায় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাই।

হেরম্বকে ওরা এত ভয় করে কেন বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওরাও কেমন হতাশ হয়ে গেছে মনে হল শেষের দিকে।'

'আগাগোড়া শুধু ছ্যাবলামি করলি, ওদের দোষ কি? হেরম্বকে কেন এত ভয় করে সেটা তো ওদের কথাবার্ত্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।'

'আমি তো পারলাম না বুঝতে।'

'হেরম্ব ধার্ম্মিক বলে তাকে ওরা ঘাঁটাতে চায় না।'

'হেরম্ব ধার্ম্মিক নাকি?'

'অতবড় একজন তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য, নাম করতে লোকের গা ছমছম করে। নিজেও নাকি সাধন টাধন করে, অমাবস্যার রাত্রিগুলি মড়ার বুকে আসন পিঁড়ি হয়ে কাটিয়ে দেয়। ওদের কাছে সে ভয়ঙ্কর ধার্ম্মিক।'

কৃষ্ণেন্দু থমকে দাঁড়াল। ডাইনে পথের ধারে মাইলের সংখ্যা লেখা মাটিতে পোঁতা শিলের মত পাথরটিতে কে যেন তেলসিঁদুর মাখিয়েছে। একটু দূরে পুকুরের ধারে ছোট একটি মন্দির,—পুরোণো, ভাঙ্গা এবং বটগাছে ধরা।

'তাই হবে। ঠিক!'

হীরেনের অনুমানে সায় দিয়ে হিংস্র চোখে কৃষ্ণেন্দু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে নিতে হীরেনের হাতে বার বার সিগারেটটা কেঁপে কেঁপে যায়।

'আমি পারলাম না, তুই ধরতে পারলি কেন কথাটা এত সহজে?'

'তুই ওদের সঙ্গে কথা বলছিলি, আমি ওদের কথা শুনছিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হীরেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'দেশ সম্বন্ধে কতগুলি কথা তুই ভুলে থাকিস ভাই। ধর্ম্ম আর সংস্কার যে এদেশের মন কি ভাবে গ্রাস করে আছে খেয়াল থাকলে

কেন ওকে সকলে এত ভয় আর খাতির করে তুইও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম্ম ছাড়া কথা নেই। চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাস সর্ব্বদা। ধর্ম্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার স্তরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই। এটা তোরা ভুলে থাকিস্। ধর্ম্ম আর সংস্কারের কথা শুনলে অবশ্য তোরা বাস্তবপন্থীরা অসন্তুষ্ট হোস, কিন্তু যা আছে তা আছে।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'অসন্তুষ্ট হই কিন্তু ভুলে থাকি না। উপেক্ষা করি। আমরা বলি, অন্নহীন, পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম্ম নেই। আমরা বলি, সমস্ত সংস্কার ভাঙ্গতে হবে।'

হীরেন বলল, 'কেন বলিস? ভাষা শুধু বকবক করার জন্য সৃষ্টি হয় নি, বোঝারও কাজে লাগে। নিজের মন যা বলে শুধু সেই কথা না বলে, যাদের জন্য বলা তারা যা জানে বোঝে আর মানে সে কথা বললেই হয়! শ্রোতার ভাষা না জেনে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি? অন্নহীন পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম্ম নেই বললে যখন কেউ কাণে তোলে না তখন বললেই হয় ওরকম হয়ে থাকা অধর্ম্ম, মহাপাপ—বললেই হয় অন্নাভাব, পরাধীনতা, অত্যাচারের প্রতিবাদ আর প্রতিকারই ধর্ম্ম।'

'তফাৎ কি হল?'

'যারা ধর্ম্ম-খ্যাপা তারা বুঝতে পারে, সাড়া দেয়। এদেশে ধর্ম্ম আর সংস্কারের সর্ব্বব্যাপী প্রভাব যখন অস্বীকার করা যায় না, সে সত্যটাকে মেনে নিয়ে কাজে লাগানোই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কিন্তু তোদের কথা আলাদা। ওসব কাজে লাগাতে তোদের সঙ্কোচ হয়। পাছে তার মানে দাঁড়ায় যে তোরাও মেনে নিয়েছিস,

প্রশ্রয় দিয়েছিস। স্বর্গে যেতে হবে, কিন্তু ফ্যাশেনেবল পথটি ছাড়া অন্তপথে তোরা চলতে রাজী নোস্।'

কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল। নীরবে কিছুক্ষণ পথ চলে বিনা ভূমিকায় হঠাৎ বলল, 'দূরে দূরে না থেকে কাজে নেমে যা না হীরেন? আমার চেয়ে তুই ভাল কাজ করতে পারবি। আমার শুধু সখ, তোর দরদ আছে, ওদের তুই আমার চেয়ে ভাল বুঝিস।'

'আমার সত্যি খিদে পেয়েছে ইন্দু।'

নিঃশব্দে বাকী পথ অতিক্রম করে বাড়ীর সামনে পৌছে দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন একই তাগিদে।

'কাজে নামার ইচ্ছে তোর আছে। আমি জানি।'

'তা আছে।'

'তবে?'

'ইচ্ছে থাকলেই কি হয়? আমার সংযম নেই, সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য্য নেই। কাজে নামতে ভয় করে ভাই।'

'আজ পর্য্যন্ত বার দশেক প্রশ্ন করেছি। আজ তবু একটা জবাব দিলি।' বলে হীরেনকে ফেলে কৃষ্ণেন্দু হন হন করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

মাথায় কাপড় তুলে দিগম্বরী বলল, 'চান করবেন না ঠাকুরপো? তবে খেতে বসুন।'

শশাঙ্ক আমতা আমতা করে বলে, 'হাতে একটি পয়সা নেই, খাবার দাবারের ভাল ব্যবস্থা করতে পারিনি ভাই।'

হীরেন টাকা বার করলে শশাঙ্ক হাত বাড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা চাইতে তার লজ্জা করে নি, টাকা চেয়ে হাত পেতে নিতে সত্যি তার লজ্জা করছে। চাইতে তো হয়নি কোনবার। হীরেন টাকা বার করলে বরাবর সে বিস্মিত হয়ে গেছে, টাকা নিয়ে অনুযোগ দিয়ে বলেছে, 'কি দরকার ছিল বলত?'

দুপুরে ঝুমুরিয়ার কয়েকটি ছেলে দেখা করতে এল। তাদের সঙ্গে দেখা গেল নরেশকে। এপর্য্যন্ত নরেশের কোন পাত্তা মেলেনি, কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছে সেই জানে। অচেনা গাঁয়ের সমবয়সী অচেনা ছেলেদের দলেই বা সে কি করে ভিড়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না। সকলের সঙ্গে ভাবটাও যেন বেশ জমিয়ে নিয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে।

কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে ছেলেরা একটা শোভাযাত্রা করতে চায়। এখান থেকে শোভাযাত্রা সুরু করে সমস্ত গ্রাম ঘুরে তাদের লাইব্রেরীতে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে সভা করে ছেলেরা তাকে অভিনন্দন দেবে।

'এই দুপুর রোদে?'

'আজ্ঞে না। বিকেলে।'

'তোমাদের লাইব্রেরীতে কত বই আছে?'

'একাত্তরখানা হবে। দু'টো ম্যাগাজিন নিই।'

হীরেনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দুর মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল।

'আজ নয় ভাই, কাল শোভাযাত্রা করব। দুপুরবেলা। শোভাযাত্রা করে একেবারে নতুন রাস্তায় গিয়ে হাজির হব।'

ঘরের অন্যপ্রান্তে হীরেন তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে উঠে বসল।

'তাই তবে ঠিক করলি?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে আপোষের কথাবার্ত্তাও বলে দেখবি না?'

'না। তাতে কোন লাভ হবে না জানি। ওরা পেয়ে বসবে, এরা আরও ঝিমিয়ে পড়বে।'

'কে জানে!'

হীরেন আর কথা কইল না। ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল, হঠাৎ যেন বিপাকে পড়ে গেছে। দু'টি ছেলে কৃষ্ণেন্দুর মুখ চেনা,

কিছুদূর পড়া শোনা করে বাড়ীতে বসে আছে। দলের হয়ে তারাই এতক্ষণ কথা বলছিল। অনাথ নামে পাঞ্জাবী গায়ে ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে খানিক পরামর্শ করে দু'পা সামনে এগিয়ে এল।

'এরা আপনার কাছে একটা কথা জানতে চায় কেষ্টদা। আপনি কোন দলে?'

'দল? কিসের দল?'

'আপনি যদি মোহনলালের দলে হন, এরা কালকের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারবে না বলছে। আপনাকে নিয়ে আমরা তাহলে বরং আরেকদিন মিটিং করব।' কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টি দেখে অনাথ আর দলের প্রতিনিধির উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা বজায় রাখতে পারল না, একটা ঢোঁক গিলে ছেলেমানুষ সে ছেলেমানুষেরই মতই আব্দারের ভঙ্গিতে যোগ দিল, 'আজ বিকেলেই চলুন না আমাদের ওখানে?'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বোসো দিকি সবাই। তোমরা কারা জেনে নি। একটা পাটি বিছিয়ে দে তো নরেশ।'

নরেশ সকলের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পাটি আনতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে দিগম্বরী নিজেই একটা পাটি এনে বিছিয়ে দিল। একগাল হেসে বলল, 'বোস বাবারা, বোস। কেষ্টবাবুর কথা শোন।'

হীরেন থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। খাওয়ার সময় দিগম্বরী ঘোমটা দিয়ে নীরবে পরিবেশন করেছিল, তাকে এখন বাড়ীর বুড়ী গিন্নীর ভাষা সুর ও ভঙ্গিতে কথা কইতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার আগে হীরেনের দিকে চেয়ে বুড়োমানুষের মতই নিঃসঙ্কোচে দিগম্বরী বলল, 'বড় মানুষ, নামকরা মানুষ কেউ গাঁয়ে এলে ছেলেরা বড় খুসী হয়। পোড়া গাঁয়ে কেউ তো আসে না সাত জন্মে!'

কৃষ্ণেন্দু ছেলেদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দল কোনটা?'

'এই এটা। আরও কয়েকজন আছে, তারা আসতে পারে নি।'

গাঁয়ের পনের ষোলটি কিশোর ও তরুণকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার সে এক বিচিত্র ও গৌরবময় কাহিনী। অনাথ আর সহদেবেরই গৌরব, তারাই দলটা গড়েছে। আগে কিছুই ছিল না ঝুমুরিয়ায়। নমো নমো করে একটিমাত্র বারোয়ারী পূজো হত, সভাসমিতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, নাইটস্কুল, কিছুই ছিল না। এরা সব কিছু গড়ে তুলেছে। বছরে এখন পাঁচ ছ'টি পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে উৎসব হয়, দুর্গাপূজায় এত সমারোহ হয় যে আশেপাশের সব গ্রাম হার মেনেছে। সদর থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আনিয়ে মাঝে মাঝে গাঁয়ে এরা সভা করায়। হেরম্বের কাছ থেকে একটি খেলার মাঠ আদায় করেছে, তাদের টিম এবারে সদরে কাপ খেলায় প্রথম রাউণ্ডে জিতেছিল। পালা করে এরা পাহারা দেওয়ায় গাঁয়ে এখন আর চুরি হয় না। নাইট স্কুলে চাষাভূষাদের পড়ায়। অসুখ বিসুখে সেবা করতে যায়। জঙ্গল সাফ করে, মশা নষ্ট করে, আরও কত কি যে তারা করে হিসাব হয় না।

'আগে কিছুই ছিল না কৃষ্ণেন্দু বাবু। সব আমরা করেছি।'

দুঃখের বিষয়, মোহনলালও একটা দল করেছে, চাষাভূষো ছেলেদের নিয়ে। কাজ তারা কিছুই করে না, অনাথদের দলের সঙ্গে শুধু শত্রুতা করে আর তাদের টিটকারী দেয়।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'এই ব্যাপার? তা, তোমাদের ভিলেজ পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই ভাই। হেরম্ববাবু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করছেন, তার একটা বিহিত করতে আমি এসেছি। আমি কোন দলে নই। তোমাদের দলেও নয়, মোহনলালের দলেও নয়। কাল কোন দলের প্রশেসন হবে না, গাঁয়ের লোকের প্রতিবাদের প্রশেসন হবে।

এতে দলাদলির কোন কথাই নেই। আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসবে। তোমরাও এসো।'

'আমাদের একটু অসুবিধা আছে।'

'কিসের অসুবিধা ?'

'আমরা—আমাদের মতবাদ অন্যরকম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'মতবাদ ? এর মধ্যে আবার মতবাদের কথা আসে কোত্থেকে ? একটা লোক যাচ্ছেতাই অত্যাচার করছে, ধরে বেঁধে সকলকে দিয়ে মজুরের কাজ করাচ্ছে, জমি কেড়ে নিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে, মাটি তুলে নিচ্ছে, এসবের যাতে প্রতিকার হয় আমরা সে চেষ্টা করব। তাতে মতবাদের কি আছে ?'

'আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামের উন্নতির জন্য ভাল রাস্তাঘাটের দরকার আছে। রাস্তাটি তৈরী হলে আমাদেরই উপকার হবে।'

কৃষ্ণেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'রাস্তা তৈরী করতে আমরা বাধা দেব না। আমরা অত্যাচারের প্রতিবাদ করব।'

সহদেব রোগা ছিপছিপে ভারি সুদর্শন ছেলে। মুখখানা দেখলেই ভাল বলতে ইচ্ছা করে। সে বলল, 'ও একই কথা। রাস্তা তৈরীতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল বলেই হেরম্ববাবুকে একটু আধটু অত্যাচার করতে হয়েছে। আর বিনা মজুরিতে তিনি তো কাউকে খাটাচ্ছেন না, প্রত্যেককে মজুরি দিচ্ছেন। অবশ্য যারা গোলমাল করে তাদের বেলা—'

অনাথ বলল, 'আপনাকে সত্যি কথা বলি কৃষ্ণেন্দুবাবু, হেরম্ব চক্রবর্ত্তীকে আমরাও পছন্দ করি না। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পলিসি হচ্ছে, চুপ করে থাকা। রাস্তাটা হচ্ছে, হয়ে যাক। অন্য ব্যাপারে হলে হেরম্ববাবুর অত্যাচার আমরাও সহ্য করতাম না, অনেক আগে আমরাই একটা বিহিত করতাম। আমরা রাস্তা চাই। বর্ষাকালে

তিন চার মাস এখানকার রাস্তায় সাইকেল পর্য্যন্ত চালান যায় না।'

'কি হবে সাইকেল চালিয়ে? রাস্তা দিয়ে? গরু ছাগলের চলতে ফিরতে সাইকেল লাগে না, ভাল রাস্তারও দরকার হয় না।'

ছেলেরা চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু মনে মনে নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এদের মেজাজ দেখিয়ে, কড়া কথা শুনিয়ে লাভ কি?

আবার সে বলে, 'এই সোজা কথাটা কি তোমরা বুঝতে পার না? রাস্তাঘাটের উন্নতি, লাইব্রেরী, নাইটস্কুল, পূজাপার্ব্বন এ সবের কোন মানে হয় না, গাঁয়ের লোক যদি মানুষ না হয়, যদি শুধু মুখ বুঁজে অত্যাচার সহ্য করে যায়? রাস্তাটা কি হেরম্ব তৈরী করে দিচ্ছে? ঘরের পয়সা খরচ করে? না, গাঁয়ের লোকের সুবিধার জন্য তৈরী হচ্ছে? ওদের সুবিধার কথা কর্ত্তারা ভাবলে অনেক আগেই রাস্তা তৈরী হয়ে যেত। রাস্তা হচ্ছে ভালই। কিন্তু ওটা হেরম্বের অনুগ্রহ বা দান ভাবছ কেন? হেরম্ব তো কণ্ট্রাক্টে মোটা টাকা লাভ করবে। রাস্তার জন্যে সকলের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় হবে। এতকাল যে রাস্তাটা হয়নি সেটাই তো হয়েছে ওদের মস্ত অন্যায়। আজ রাস্তা তৈরীর নামে কড়া জুলুম চলবে আর তোমরা মুখ বুজে থাকবে? দলাদলি বড় হবে তোমাদের? যে গাঁয়ে—' একমুহূর্ত্ত থেমে সে যোগ দেয়, 'যে গাঁয়ে অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে জালালুদ্দিন প্রাণ দিল, বীরেশ্বর প্রাণ দিল, ক'জন জেলে গেল?'

ছেলেরা মুখ ভার করে চলে গেল। নরেশ গেল না, যেখানে বসে ছিল সেইখানে বসে পাটি খুঁটতে লাগল। কেউ কথা কয় না। দিগম্বরী এসে মুখ খুলতে গিয়ে কিছু না বলেই আবার চুপচাপ চলে যায়।

'গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে এরা। বড় হয়ে এরা ভদ্রলোক হবে!'

'ওরা তো খারাপ ছেলে নয় ?' দিগম্বরী বলে।

হীরেন বলে, 'সবাই ওরকম ভদ্রলোক হবে না ইন্দু। সূর্য্যও এ গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে।'

'সূর্য্য ? সূর্য্য এদের দলে থাকত না—মোহনলালের চাষা-ভূষোর দলে যেত।'

চারিদিক দুপুরের মাটিফাটা চড়া রোদ। বাইরে তাকালে দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে তাপ ওপরে উঠছে, দূরত্ব দুলে দুলে চোখে লাগিয়ে দিচ্ছে ধাঁধাঁ। এই দুপুরবেলা কৃষ্ণেন্দু শোভাযাত্রা করবে, গাঁ শুদ্ধ লোককে দু'মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে হেরম্বের রাস্তায়, গরুছাগলও যখন গাছের নীচে আর ঘরের কাণাচে ছায়া খুঁজে নিয়ে ধুঁকতে থাকে। প্রকৃতিকে হিসাবে ধরতে কৃষ্ণেন্দুর চিরদিন ভুল হয়ে যায়। গরমে ঘেমে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে আর বসন্তে হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়েও সে যেন স্রেফ ভুলে থাকে সূর্য্য এক যায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

'আঁ ? রোদ ? হোক রোদ। রোদে সকলের তেজ বাড়বে।'

'সেরেছে !' বলে হীরেন নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে, মিট মিট করে তাকায় বন্ধুর দিকে।

'বীরেশ্বর দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিল, তুই বুঝি দাঙ্গা বাধাতে চাস ?'

'বীরেশ্বরের পথটা নেওয়া কি ভাল নয় ? সহিদ হতে পারব—বীরেশ্বরের কাজটাও হবে।' কৃষ্ণেন্দু পাল্টা প্রশ্ন করল তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে হঠাৎ হীরেনের মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠল। কিছুদিনের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদেই তার দেহমনের স্বাস্থ্য এই শোচনীয় কৌতুক সুরু করেছে তার সঙ্গে, হৃদয়মন

একটু গভীরভাবে নাড়া খেলেই মাথার মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে, 'এদের তুই জানিস না, বুঝিস না। এরা কি ভাবে, কেন ভাবে, কি চায়, কেন চায়,—কিছু না জেনেই তুই এদের নেতা হতে চাস। নিজের খেয়াল মত যা তা একটা কাণ্ড করে এদের সর্ব্বনাশ করে বসবি ?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'পাগল হয়েছিস ? আমি ইচ্ছে করে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে চাইব ? ওটা কথার কথা বলছিলাম—যদি কোন কারণে হাঙ্গামা একটা হয়ে যায়, আমি যদি সামলাতে না পারি। আমার উদ্দেশ্য হল, সকলকে একত্র করে জোরালো আন্দোলন সৃষ্টি করা। মিটিং আর প্রসেসনটা যদি সফল হয়, একদিকে হেরম্ব ভয় পেয়ে যাবে, অন্যদিকে এদের ভরসা বাড়বে, জোর বাড়বে। ক্ষেপে আছে অনেকে, কিন্তু তারা আছে ছড়িয়ে—বীরেশ্বর ওদের একসঙ্গে আনতে পারেনি। মানুষটা রগচটা—দশজনের দাঙ্গা করার চেয়ে যে একশো জনের ধমকের জোর বেশী তা ও জানত না। এই কথাটাই মিটিং-এ ভাল করে বুঝিয়ে দেব, কোনরকম হাঙ্গামা না করেও হেরম্বকে অনায়াসে কাবু করা যায়। আমি কি আশা করছি জানিস ? যারা চুপ করে আছে, যারা ভয়ে রাস্তায় খাটছে, পরশু তারা আমাদের দলে আসবে।'

'কিন্তু হেরম্ব যদি দাঙ্গা বাধায় ? প্রসেসনে কি বীরেশ্বরের মত রগচটা কেউ থাকবে না ?'

'সে ভয় তো আছেই।'

হীরেন ভরসা পায় না। সে জানে, কৃষ্ণেন্দু আদর্শবাদী। নতুন যুগের পুরাণো আদর্শবাদী। তার মত মানুষের এরকম মনোভাব জাগলে ফলাফলটা ভাল হয় না। আদর্শবাদীর নিজেকে আঘাত না করতে পারলে স্বস্তি জোটে না কিছুতেই। কৃষ্ণেন্দু তাই করবে।

ঝুমুরিয়ার লোকেদের কি উপকার হবে সেটা এখন জানেন ভগবান, কৃষ্ণেন্দু ভয়ানক একটা কিছু করবেই। এমন একটা আঘাত সে হেরম্বকে দেবে যার প্রতিঘাত অন্য কাউকে স্পর্শ করুক বা না করুক তার গায়ে এসে লাগবেই।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দাঙ্গা। পুলিশকে বলে দিতে হবে না কার জন্য দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গাটাও কৃষ্ণেন্দু ভালভাবেই বাধাতে চায়। দুপুরের রোদকে পর্য্যন্ত সে লোকের মাথা গরম করার কাজে লাগাবে!

'ব্যাপার কি ভয়ানক দাঁড়াতে পারে ভেবেছিস?'

'ভেবেছি বৈকি। ওই ভয়ে তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না?'

'দশ বিশটা খুন হতে পারে।'

'তা হতে পারে। নাও হতে পারে।'

ঘরের ঠিক বাইরে টুপ করে একটা আম খসে পড়ার শব্দ কানে এল। সিগারেট টানতে টানতে দু'বার কথা বলতে গিয়ে হীরেন চুপ করে গেল। সেও বাইরে থেকে এসেছে, দাঙ্গাকারীদের নেতা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। অন্ততঃ আগামী দশটা বছর হাজতবাস না করে তার আর বোধ হয় উপায় নেই। মুখ থেকে সিগারেট নামাতে গিয়ে হাতটা থর থর করে কাঁপছে দেখে হীরেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণও হল। এত বেশী ভয় তো সে পায় নি! অথবা মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলছে তাকেই ভয় বলে?

এমন সময় নরেশের সঙ্গে এল রম্ভা। হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু ঠিক কি ঠিক করেছে জানবার জন্য সে উতলা হয়ে উঠেছে, বেলা পড়ার জন্য ঘরে বসে অপেক্ষা করতে পারে নি। কদিনে তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, সেই মুখ রোদের ঝাঁঝে লাল হওয়ায় লাবণ্যের এমন ক্ষতি হয়েছে যে দেখলে আপশোষ জাগে। রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে

আছে। গায়ে জামা দেয় নি, আঁচলটাও জড়িয়েছে অসতর্কভাবে। রম্ভার এমন মূর্তি হীরেন কখনো দেখেনি। হঠাৎ সে মদের পিপাসা অনুভব করে, যে পিপাসা আজকাল মন নাড়া খাবার সঙ্গে এমনি হঠাৎ ক্ষীণভাবে জাগে আর মিনিটে মিনিটে জোরালো হতে হতে একেবারে অদম্য হয়ে দাঁড়ায়, অকথ্য যন্ত্রণায় কেবলি সাধ হতে থাকে মদের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবার। এক মুহূর্তে হীরেনের মুখ পাংশুটে হয়ে যায়, স্নায়ুগুলি শির শির করে ওঠে। কাল যদি তার কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে যেতে হয়, মদ সে পাবে কোথায়! মদ না খেলে তার চলবে না। আজ তার সব খেয়াল আছে, কালও হয়তো কিছু কিছু থাকবে, কিন্তু পিপাসা বাড়তে বাড়তে পরশু তো তার কাছে আত্মীয় বা বন্ধু বলে কিছু থাকবে না, সমাজ সংসার শূন্যে মিলিয়ে যাবে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে থেকে সে নিজের সাময়িক অসহ্য যন্ত্রণা সারায়, মদ তার ওষুধ, চিকিৎসা। মদ না পেলে সে যে পাগল হয়ে যাবে একেবারে!

'শোভাযাত্রা করে কি করবেন কেষ্টবাবু?' রম্ভা জিজ্ঞেস করল।

'দেখি কি করি।'

'দশজনে মিলে চেঁচিয়ে গাঁয়ে পাক দিয়ে এলে ও লোকটার কি হবে! মোর বাপের মরণের আসল বিহিত কিছু করুন কেষ্টবাবু, পায়ে ধরি আপনার।'

'আসল বিহিত? আসল বিহিত মানে কি রম্ভা?'

'ওকে—ওকে—, ওর নাক কাণ কেটে দিন, দু'চোখ কাণা করে ফেলুন, সবার সামনে খোঁটায় বেঁধে চাবকে দিন। দু'রাত ঘুমোইনি কেষ্টবাবু, ও লোকটার কথা ভাবলে মাথায় আগুণ ধরে যায়।'

রম্ভার দু'চোখ জ্বল জ্বল করে, সত্যই যেন চোখের আড়ালে মাথার মধ্যে তার আগুণ ধরে গেছে। মুখপোড়া ভগবান তাকে

মেয়েমানুষ করেছে, তার ভাইগুলোকে করেছে মেয়েমানুষের বাড়া, নইলে কুকুর বেড়ালের মত তার বাপকে মেরে হেরম্ব কি আজও বাহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পারে বুক ফুলিয়ে! রম্ভা তাকে দেখে নিত। একচোট দেখে নিত রম্ভা তাকে। ঠোঁটে চেপে চেপে, দাঁতে কেটে কেটে রম্ভা বলে আর তার সেই তেজের প্রকাশ দেখে হীরেন মুগ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে রম্ভার শুধু ছিল শোক আর বাপের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাধারণ স্বাভাবিক বিদ্বেষ, সুর করে মড়াকান্নার সঙ্গে কতগুলি ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিতে দিতেই যার জ্বালা কমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রম্ভার জ্বালা যেন হীরেনের মদের পিপাসার মতই ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দিবারাত্রি এই এক চিন্তা তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়ায়, হেরম্বকে শাস্তি দেওয়া। আর কিছু সে ভাবে না, ভাবতে পারে না।

হীরেন বলতে যায়: 'কিন্তু হেরম্ব যে তোমার বাপকে মেরেছে রম্ভা—'

'কে মেরেছে তবে? কে মেরেছে?'

তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় রম্ভা যেন আর্ত্তনাদ করে ওঠে। তার চীৎকার শুনে দিগম্বরী ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায়। রম্ভা গ্রাহ্যও করে না, গলা একটু নামিয়ে বলতে থাকে, 'আপনারা পুরুষ মানুষ, প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যেতে সরম লাগে না? সিধে কথা বলুন না, পরের জন্য কেন বিপদ ঘাড়ে করবেন!'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আহা, মাথা গরম কর কেন? তোমার মনের মত ব্যবস্থা করব।'

'কি ব্যবস্থা?'

'বোসো। বলছি। মাথা ঠাণ্ডা কর আগে।'

দিগম্বরী মুচকে হেসে সরে গেল। সরে গেল বাড়ীর একবোঝে

অপর প্রান্তে, সেখান থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে প্রতিবেশিনী কার সঙ্গে কথা বলে গলার আওয়াজ কৃষ্ণেন্দুর কাণে পৌঁছে দিল, তারপর নিঃশব্দ দ্রুতপদে ফিরে এল এঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাণ খাড়া করে শুধু বোঝা গেল কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে, কথা-গুলি শোনা গেল না। হাসিমুখে ঘাড় কাত করে সে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গলা কৃষ্ণেন্দুর চড়ল না। মুখে হাসি নিয়েই দিগম্বরী তখন শোবার ঘরে ফিরে গেল, শশাঙ্ককে বলল, 'ঠাকুরপো কি যেন মতলব আঁটছে। আমরা না বিপদে পড়ি।'

কৃষ্ণেন্দুর কথা শেষ হলে রম্ভা হতাশ ভাবে বলে, 'কিন্তু হেরম্বের কি শাস্তি হবে কেষ্টবাবু? ও নয় আর অত্যাচার না করল, সবাইকে ক্ষতিপূরণ দিল, ওতে ওর কি হবে? মোর বাপকে মেরে ওতো টেক্কা মেরে বেঁচে থাকবে, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।'

'আঁচড় লাগবে রম্ভা। বুকে আঁচড় লাগবে। কেটে কেটে লঙ্কা বাটা লাগিয়ে দেয়ার চেয়ে বেশী জ্বলবে ওর বুকটা—নিজের বুকটা—নিজের জ্বালায় নিজে পুড়ে মরবে। তুমি বুঝতে পার না, এ অঞ্চলে আর কোনদিন ও জুলুম চালাতে পারবে না, মাথা তুলতে পারবে না। কেউ আর ওকে ভয় করবে না। শুধু হেরম্ব নয়, আর যে কেউ অত্যাচার করতে আসবে, এখানকার লোকেরা জানবে কি করে এক হয়ে তার সঙ্গে লড়ে তাকে হারাতে হয়? হেরম্বকে মারলে তো একটা হেরম্ব মরবে, আর এ ভাবে আমরা সব হেরম্বকে ধ্বংস করার কাজ সুরু করতে পারব। বীরেশ্বরের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে।'

আরও কিছুক্ষণ রম্ভাকে বুঝিয়ে কৃষ্ণেন্দু বাইরে যায়। কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ক্ষোভে ও হতাশায় রম্ভাকে নিঝুম হয়ে যেতে দেখে হীরেন বলে, 'নরেশ, তুই একটু বাইরে যা দিকি।'

কুরিয়ে কুরিয়ে তার দিকে চেয়ে নরেশ চলে গেলে হীরেন বলে, 'কেন তুমি ভাবছ রম্ভা? হেরম্বের ব্যবস্থা কেষ্ট করবে। ওর মতলব আছে। সব কথা কি ফাঁস করা চলে? তোমায় তাই বাজে কথা বুঝিয়ে গেল। কাল দেখো কি হয়।'

রম্ভাকে যেন বিদ্যুৎ ছোঁয়। চোখ দুটি তার জ্বলে ওঠে।—'কি হবে ছোটবাবু কাল?'

'দেখো। কেষ্টর মতলব ঠিক আছে।'

'কি মতলব? বলুন মোকে। পায়ে ধরি বলুন।'

একটু ইতস্তত: করে হীরেন তার আশঙ্কার কথা এমন ভাবে বলে রম্ভাকে যে তার মানে দাঁড়ায় এই: দাঙ্গা বাধিয়ে হেরম্বকে বীরেশ্বরের মতই কৌশলে মেরে ফেলবার আশাতেই শোভাযাত্রাটা কৃষ্ণেন্দু বার করছে। কৃষ্ণেন্দুকে চেনে না রম্ভা? হেরম্বকে শেষ না করে সে কলকাতায় ফিরে যাবে?

কৃষ্ণেন্দুর দাঙ্গার পরিকল্পনার কথা শুনে রম্ভার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। নাক কাণ কাটা নয়, চোখ কাণা করা নয়, একেবারে খুন হয়ে যাবে হেরম্ব!

'দাঙ্গা যদি না বাধে ছোটবাবু?'

'বাধবে। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে তালিম দিয়ে নিয়ে যাবে। আরও কি সব আয়োজন করেছে, আমি সব জানি না।'

সুতরাং খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু ফিরে এলে সভয় ভক্তিতে গদগদ হয়ে রম্ভা গলায় আঁচল জড়িয়ে তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

'আপনি সত্যিকারের মানুষ। আপনাকে গড় করি কেষ্টবাবু।'

কৃষ্ণেন্দু খুসী হয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছ তো আমার কথা? আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে রম্ভা।'

বিদায় নিয়ে রম্ভা বারান্দায় গেছে, হীরেন উঠে গিয়ে বলল, 'এসব কথা কাউকে বোলো না রম্ভা।'

'তাই কি বলি ছোট বাবু!'

খুসীতে উত্তেজনায় জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে রম্ভা উঠানে নেমে গেছে, কৃষ্ণেন্দু বেরিয়ে এসে তাকে ডেকে বলল, 'মোহনকে একবার পাঠিয়ে দিও রম্ভা।'

থমকে দাঁড়িয়ে রম্ভা কাছে সরে এল।

'আমার ভাই মোহন?'

'হ্যাঁ, একটু দরকার আছে।'

এ দরকার যে কি দরকার অনুমান করা শক্ত নয়। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে ক্ষেপিয়ে কৃষ্ণেন্দু দাঙ্গা বাধাবে। রম্ভার ভাই মোহনলালের মাথাটা যথেষ্ট গরম, তাকে দিয়ে ভালভাবেই কাজ চলবে কৃষ্ণেন্দুর। বিবর্ণ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'একাই আসতে বোলো।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ওর দলের কোন ছেলেটা কেমন আমি তো জানি না।'

রম্ভা বলে, 'ওতো একদম ছেলেমানুষ কেষ্টবাবু?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'তোমার অন্য ভাইগুলি সত্যি মেয়েমানুষেরও অধম রম্ভা। মোহন সেরকম নয়। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিষ আছে।'

রম্ভার ভীত সন্ত্রস্ত করুণ মুখভঙ্গি দেখে হীরেন মনে মনে কৌতুক বোধ করে। গোড়ায় রম্ভার উদ্ধত ঝাঁঝালো তিরস্কারের অপমানে মনটা বেশ জ্বালাই করেছিল তখন। পরের জন্য সে বিপদ ঘাড়ে করতে চায় না, পুরুষ বলে প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

করে, তার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে রম্ভা! রম্ভার ধারণা মিথ্যা নয় বলে, বিপদ সে সত্যই এড়িয়ে যেতে চায় বলে, রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে বলে, রম্ভার কথা ভুলে গেলেও জ্বালাটা আত্ম-গ্লানি হয়ে জ্বলছিল। এখন রম্ভাকে কাবু হতে দেখে হীরেন একটু আরাম পায়। ভাইকে রেহাই দেবার জন্য রম্ভা এবার নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুর হাতে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা সুরু করে দেবে। আড় চোখে রম্ভার ভাবভঙ্গি দেখতে দেখতে হীরেন তার ভেঙ্গে পড়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে।

রম্ভা তিনবার ঢোঁক গিলে বলে, 'গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বন্ধুর দৃষ্টি দেখে কৃষ্ণেন্দু ভাবে সে বুঝি রম্ভার অপূর্ব্ব দেহসম্পদ দেখছে। ভেবে কৃষ্ণেন্দু একটু বিরক্ত হয়।

তারপর প্রথম সুযোগে হীরেনকে একা পেয়ে দিগম্বরী হাসিমুখে সামনে গিয়ে ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমায় এত অবিশ্বাস করেন ঠাকুরপো? ও বাড়ীর রম্ভাকে যেটুকু বিশ্বাস করেন, আমায় সেটুকু বিশ্বাসও করেন না!'

'তা কেন বৌঠান, তা নয়।'

'তাই ঠাকুরপো, তাই। কেন ঢাকছেন? কোনদিন আপনার কাছে কোন অবিশ্বাসের কাজ তো করিনি ঠাকুরপো আমি!'

মুখে অল্প অল্প হাসি দিগম্বরীর লেগেই রইল, চোখের জল গাল বেয়ে নেমে এল সেই হাসিতে। হীরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার মুখে হাসিকান্নার এই অদ্ভুত সমাবেশের দিকে। মাথা চুলকে বোকার মত একটু হাসল। দিগম্বরী সোজাসুজি কেঁদে ফেললে সে এমন বিব্রত বোধ করত না।

'কি জানেন বৌঠান, শুনুন বলি। রম্ভাকে যা বললাম সে ব্যাপারে

ও জড়িয়ে আছে, ওসব কথার সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই। আপনাকে অবিশ্বাস করি বলে গোপন করিনি।'

'বিশ্বাস করেন আমাকে ?'

'করি বৈকি, নিশ্চয় করি ।'

'তবে বলুন। রম্ভাকে বলবেন, আমাকে বলবেন না, সে হবে না ঠাকুরপো। হিংসায় আমি মরে যাব দম ফেটে।' দিগম্বরী আঁচলে চোখ মুছল।

'কি হবে ওসব শুনে ?'

'ওমা! এই বুঝি বিশ্বাস করেন আমাকে ? এই বসলাম আমি এখানে, না শুনে উঠছি না।'

হীরেনের সামনে সে জেঁকে জোড়াসন হয়ে বসে পড়ল।—'নিন্ বলুন এবার চট করে। বৌঠানের কাছে কথা লুকানো, কেমনধারা ঠাকুরপো আপনি ?'

হীরেনের যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়। দিগম্বরী আর প্রৌঢ়া গিন্নীর মত কথা বলছে না, ছেলেমানুষী করছে আহ্লাদী কচি খুকীর মত। কথা, সুর, ভঙ্গী সব তার নিখুঁত। এই দিগম্বরীকে যে আবার গিন্নিবান্নী মনে করা কখনো সম্ভব হয়েছিল তা যেন এখন আর কল্পনাও করা যায় না।

'আপনি তো সবাইকে বলে বেড়াবেন।'

'না। সত্যি কাউকে বলব না। মা কালীর দিব্যি।'

হীরেন তখন খুব সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি ব্যাপারটা শুনিয়ে দিল। শোভাযাত্রা করে গিয়ে হেরম্বের দলের সঙ্গে তারা মারামারি করবে। দিগম্বরীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে সে ভাবল।

'রম্ভার বাপ বেচারাও তাই করতে গিয়েছিল, ঠাকুরপো।'

'জানি।'

'এটা কি ঠিক হবে? আবার একজন গুলি খেয়ে মরবে, ধড়-পাকড় চলবে—'

হীরেন একটু হাসল।—'এইজন্য আপনাকে কিছু বলতে চাইনি বৌঠান।'

এতক্ষণে দিগম্বরীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তার ব্যাকুলতা দেখে হীরেনের মনের একটা শুকনো দিক একটু ভিজে গেল। পরের জন্য মেয়েদের এমন দরদ খুব কম দেখা যায়। তাকে একটু শান্ত করার চেষ্টায় হীরেন হাল্কা সুরে বলল, 'আমাদের জন্য ভাববেন না, গুলি খেয়ে মরলেও আমরা মরব না।'

'ওর যদি কোন বিপদ হয়? ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করে?'

দিগম্বরী শশাঙ্কের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তার স্বামীর জন্য! তারা মরুক, গাঁয়ের সকলকে ধরে পাকড়ে নিয়ে যাক, সেজন্য দিগম্বরীর অত ভাবনা নেই। শশাঙ্কর কিছু না হয়। হীরেনের মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। দিগম্বরী কলকাতার বাড়ীতে তাকে অনেক বিস্ময় দিয়েছে, কিন্তু সে সব যেন ছেলেখেলার ম্যাজিক দেখিয়ে ছোট ছেলেকে অবাক করা। এইবার একেবারে তার আঁতে ঘা দিয়ে তাকে সে থ বানিয়ে ছেড়েছে।

সে বলে, 'শশাঙ্কদার বিপদ হবে কেন? ওর সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

দিগম্বরী বলে, 'পুলিশ কি তা শুনবে!'

হীরেন সায় দিয়ে বলে, 'তা শুনবে না! আমরা দু'টি নেতা যখন এ বাড়ীতে আছি—

'ওগো মা, কি হবে!' দিগম্বরী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এবার হীরেন যায় চটে। মনটা তার এমনিই সুস্থ ছিল না।

'দেখুন বৌঠান, ন্যাকামি করবেন না। আমরা এদিকে দশ বিশ

বছরের জন্য জেলে চলেছি, হয়তো প্রাণটাও যাবে, শশাঙ্কদার কি হবে না হবে তাই ভেবে এখন থেকে আপনি মূর্চ্ছা যেতে বসলেন। শশাঙ্কদা শোভাযাত্রায় থাকবে না, যেতে চাইলেও ওকে আমরা নেব না, আপনার ভয় নেই। তবু যদি ওকে পুলিশে ধরে, ধরবে। বাড়ী বসে বসে একেবারে অপদার্থ অমানুষ হয়ে গেছে, কিছুদিন জেল থেকে ঘুরে এলে হয়তো একটু মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে।'

'মুখ সামলে কথা কইবেন ঠাকুরপো!'

দিগম্বরী ফোঁস করে ওঠে। অসহ্য ক্রোধে কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে হীরেনের দিকে চেয়ে থেকে যোগ দেয়, 'আপনাদের তুলনায় উনি দেবতা, তা জানবেন।'

'গাঁজাখোর ভিক্ষুক দেবতা।'

'দুশ্চরিত্র তো নন্? বাজারে আর কুলিবস্তিতে মেয়ে চেখে বেড়ানোর চেয়ে গাঁজা খাওয়া ভিক্ষে করা ভাল।' দিগম্বরী গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফিরে এসে বলে দিয়ে যায়, 'গাঁজা উনি ছেড়ে দিয়েছেন, ভিক্ষেও আর বেশীদিন চাইবেন না আপনাদের কাছে।

তার তেজ দেখে হীরেন বলে, 'বাপ্স্!'

হীরেন আর কৃষ্ণেন্দু চা খাচ্ছে, শশাঙ্ক একটু লজ্জিতভাবে কাছে এল।

'আমাকে একবার সহরে যেতে হচ্ছে ভাই। কটা জিনিষ না আনলেই নয়।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বেশ তো।'

হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরছেন?'

'কাল রাতেই ফিরব, নয়তো পরশু সকালে। কদিন পরে যাব বললাম, তা উনি জোর করে আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। চা ফুরিয়ে

গেছে। আর সব পরে আনলে চলত, চা পরশুর মধ্যে চাই।' ভাল চা আবার ধারেকাছে পাওয়া যায় না।'

হীরেনের সঙ্গে মস্ত এক প্যাকেট দামী চা ছিল, কিন্তু সে চুপ করে রইল। সহর থেকে তাদের কিছু আনবার দরকার আছে কি না জিজ্ঞেস করে, হীরেনের কাছে কটা টাকা আদায় করে শশাঙ্ক চলে গেল।

'সত্যি সত্যি স্বামীকে তাহলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে!' হীরেন বলল।

'সরিয়ে দিচ্ছে মানে?'

'কাল যদি কোন হাঙ্গামা হয়, উনি যদি বিপদে পড়েন। স্বামীর জন্য এতটা মাথাব্যথা কখনো দেখিনি।'

'তুই যার স্বামী তার?'

'কখনো দেখিনি।'

হীরেন কথাটা বলে নীরবে কয়েকবার মাথা নাড়ল।

'দেখবার চোখ নেই, ইচ্ছা নেই, তাই দেখতে পাওনি। এরকম নাটুকে স্বামীভক্তি ছাড়া আর কিছু তো পছন্দ হয় না।'

'মমতার নাটুকে স্বামী অভক্তির চেয়ে বোধ হয় এটা ভাল।'

ঘনিয়ে আসা সাঁজের ছায়া, গাঢ় হয়ে আসা গুমোট। ধোয়া বারান্দা থেকে পাটি ভেদ করে যেন ভাপসা গরম উঠছে, অঙ্গন থেকে ঝাঁঝ সিধে উঠে যাচ্ছে উপরে খোলা আকাশের দিকে। জীবন আজ গুরুগম্ভীর—দু'জনের কাছে। হীরেণের কাছে গুরুভারও বটে।

'মমতার কথা নিয়ে তোর সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনি। কেন জানিস? হয় তুই ভাববি ওর হয়ে ওকালতি করছি, নয় ভাববি আপোষ করিয়ে তোদের সুখী করার ইচ্ছায় যা মনে আসে বানিয়ে

বলছি৷ আরেকটা কারণ ছিল। মমতা নিজেই ও ভারটা নিয়েছে। তোকে ও মানুষ করবে, তোকে সুখী করবে, নিজে সুখী হবে।'

'মানুষ করবে? ও আমায় মানুষ ভাবে না জানি। এটা জানিয়ে জানিয়েই তো আমায় মদ ধরিয়েছে, একধাপ এগিয়ে দিয়েছে মানুষ হবার পথে।'

'এটা তুই ভুল করছিস হীরেন। তোর এই দিগম্বরী বৌদির মত ভক্তিভরে পদসেবা করে না বলে তোর অভিমান জাগে, করলে কিন্তু খুসী হবার বদলে ওকেই তুই অশ্রদ্ধা করতিস। মানুষ তুই চিনিস না। তোর মূল্যজ্ঞান নাই। এর স্বামীভক্তি দেখে ধাঁধাঁ লেগে গেল? এতো অন্ধ আবেগ মাত্র! ধাক্কা খেলে, অন্য পথ পেলে সেইদিকে চলতে আরম্ভ করবে। মমতা দেশকে ভালবেসে, সর্ব্বহারাদের ভালবেসে, তবে তোকে ভালবেসেছে। ওর কোন কোন বুঝবার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে ফাঁকি নেই, ও অনেষ্ট। তোর সঙ্গে সংঘাতটাই তার কতবড় প্রমাণ বুঝতে পারিস না? ভুল বুঝতে পারলে ও সংশোধন করে নেয়, জোড়াতালি দিয়ে চালায় না। ওর মত জেদি একগুঁয়ে তেজী মেয়ে আজ কি ভাবে নিজেকে বদলে ফেলেছে বল্‌তো? তুই যতটুকু অধিকার দিয়েছিস ততটুকু বাইরের কাজ করে খুসী আছে—চব্বিশঘণ্টা যে কাজে ও মেতে থাকতে চায়। বাকী সময় তুই যেমন চাস তেমনি হয়ে চলছে—'

'চলছে বৈকি। ধীর স্থির শান্তশিষ্ট হাসিখুসী উদার—আমার মাতলামির জন্য পর্য্যন্ত ক্ষোভ নেই, ক্ষমা করে চুকিয়ে দেয়।'

'হীরেন তুই মিথ্যুক। নরক থেকে তোকে তুলে নিয়ে যাবার পর আমার সামনে মমু কেঁদে ফেলেছে—তুইও দেখেছিস।'

'সে তো গায়ের জ্বালার কান্না। আমায় মানুষ করতে পারছে না বলে।'

কৃষ্ণেন্দু নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার বিশ্বাস ছিল মমতা পারবে। আজ খটকা লাগছে। মানুষকেই মানুষ করা যায়, তোর মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গেছে হীরেন।' একটু থেমে বলে, 'মমুর জীবনটাও না নষ্ট হয় তোর জন্যে।'

'কেন? ওর কুলিমজুর আছে, দুদিন বাদে আরিফ ছাড়া পাবে। আমি তো ওকে বলে দিয়েছি দিনরাত যত খুসী কাজ করুক, আমি কিছু বলব না। বৌদির মত বৌ পেলে খুসী হতাম, তাই বলে আমি শশাঙ্কদা নই।'

কৃষ্ণেন্দু নানা কথা ভাবছিল, আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ ভেবে সে বলল, 'স্ত্রী কাছে না থাক, তোর বন্ধু আছে। তুইও শশাঙ্করদা'র সঙ্গে চলে যা হীরেন।'

'বটে?'

মনে মনে হীরেনও কথাটা ভাবতে আরম্ভ করেছিল। জেলে যাবার সখটা তার বড়ই কম।

কৃষ্ণেন্দু আবার বলল, 'তুই থেকে আর কি করবি? হাঙ্গামা হলে জড়িয়ে পড়বি শুধু। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।'

'সবাই বলবে ভয়ে পালিয়ে গেল।'

'কেউ তা বলবে না। এ ব্যাপারে তোর সংশ্রব কি?'

'দেখি ভেবে।'

এটা ছলনা। চলে যাবে ঠিক করেই হীরেন ভাবতে আরম্ভ করেছিল চলে যাবে কি না।

নিজেকে অপরাধী মনে করবার কোন কারণ নেই জেনেও মনটা হীরেনের খুঁত খুঁত করতে থাকে। শশাঙ্ককে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী, স্নেহমমতার গরজে, হয়তো বা ভালবাসারই তাগিদে। তার সঙ্গে সেও যদি সরে যায়, সে যাবে নিজের গরজে, নিজেকে

বাঁচাতে। সোজা ভাষায়, বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে নিজে সে পিটটান দেবে। অথচ কথাটা আসলে তা নয়। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার এমন কোন বোঝাপড়া ছিল না, মৌখিক অথবা মানসিক যে রম্ভার বাপের খুন হওয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণেন্দু যাই করুক তাতে তার যোগ দিতে হবে। সে শুধু সঙ্গে এসেছে, তার নিজের খেয়ালে, বেড়াবার জন্য। টাকা দরকার হবে বলে কৃষ্ণেন্দু টাকা চেয়েছিল, সে টাকা দিয়েছে। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওইটুকুই তার সম্পর্ক। সঙ্গে এসেছে বলেই যে মারামারিতেও তার যোগ দিতে হবে এমন প্রত্যাশা কৃষ্ণেন্দুর মনেও নিশ্চয় জাগে নি। তাছাড়া হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দুর এই ব্যবস্থায় তার সমর্থনও নেই। সুতরাং চলে যাওয়াতে তার অন্যায় কি আছে? তাতে ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হবে কেন, হীনতার পরিচয়?

এই সময় মোহনকে সঙ্গে নিয়ে রম্ভা আবার এল। হীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবে, আজ অথবা কাল সকালে। মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর পরামর্শ শুনবার ইচ্ছা তার নেই। ওদের শান্ত নির্বিকার আলাপ শুনলে মনটা তার বিষিয়ে যাবে। শশাঙ্ক চলে গেছে কিনা কে জানে! আজ তার একটু মদ চাই, অল্প একটু। শশাঙ্ক নেশাখোর মানুষ, হয় তো বলতে পারবে কোথায় মদ পাওয়া যায় এই ঝুমুরিয়া গ্রামে। আজ একটু মদ খেয়ে কাল কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। তারপর বেশী করে খাবে মদ।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে দিগম্বরী গা খানিকটা উদলা করে পাখার বাতাস খাচ্ছিল, আনমনে ঠোঁট কামড়ে প্রাচীর-ঘেঁষা পেঁপে গাছের দিকে চেয়ে। লণ্ঠনের আলোয় তাকে দেখে হীরেন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। দিগম্বরীর দেহটি তো সুন্দর! এতবার দেখেও এটা তার কল্পনাতে আসে নি। মমতার বাপের বাড়ীতে মমতা একদিন বলেছিল, "আমার চেয়ে আমার ঝি ঢের বেশী সুন্দর, শুধু রঙ একটু ময়লা।

দেখবে ?' সে ঝিকে হীরেন কতবার দেখেছিল তার হিসাব হয় না, কিন্তু সে বুড়ী না যুবতী তাও তার কোনদিন খেয়াল হয় নি। পরদিন একটু কৌশল করে মমতা ঝির নিরাবরণ দেহটি দেখিয়ে দিয়েছিল। সে এক রূপ-ধরা শিল্পীর কল্পনা, অবিশ্বাস্য। অথচ মমতা দেখিয়ে না দিলে সে রূপ তার চোখে পড়ত কি না সন্দেহ। তারপর কাস্তে-পেড়ে শাড়ী জড়ান সেই ঝির দেহটি তার সুন্দর মনে হয় নি, ভাল করে চেয়ে দেখে গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ভাল করে ঢাকা সে বেচারীকে তার মনে হয়েছে একটু অশ্লীল। মমতার মত সাজপোষাকে তাকে কি রূপসী মনে হত ? সাজ না থাকলে ভিন্ন কথা, কিন্তু একটা বিশেষ ফ্যাসনে শাড়ী জামা গায়ে না জড়ালে মেয়েদের রূপ কি তার কাছে চাপা পড়ে যায় ?

উঠানে ঘাস, পায়ের শব্দ হয় না। হীরেনের আবির্ভাব টের পেয়ে শশব্যস্তে দিগম্বরা বলল, 'আসুন ঠাকুরপো, বসুন। চেয়ার এনে দেব ? ভাঙ্গা চেয়ার কিন্তু। কেউ দেশে আসেন না, আসবাবপত্তর কিনে দেন না। উনি একবার লিখেছিলেন একটা টেবিল আর কটা চেয়ারের জন্য, জবাব পেলেন, মাদুর আর পাটি হলেই হবে। খুব চটে গেছেন, না ? অতটা মেজাজ দেখানো আমার উচিত হয় নি।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'বেশ করেছেন। স্বামীর বিপদে স্ত্রীর মাথা গরম হওয়া দোষের নয়। শশাঙ্কদা চলে গেছেন নাকি ?'

'আপনাদের বলেই তো গেলেন ?'

'এত আগে গেলেন ? গাড়ী তো শুনলাম রাত নটায় ?'

'দিনে দিনে ষ্টেশনে পৌছে যাবেন। গরমকালে রাস্তায় সাপের ভয়।'

হীরেনের মনে হল, কোনরকমে শশাঙ্ক যদি মরে যেত আর সে যদি দিগম্বরীর শোকটা দেখবার সুযোগ পেত! এই অদ্ভুত সাধের জন্য নিজের কাছেই হীরেন লজ্জা বোধ করল। কতগুলি অদ্ভুত প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে আসছে, দিগম্বরীর স্বামীর ঘর করা সম্পর্কে কতগুলি

প্রশ্ন, দিগম্বরীকে যা জিজ্ঞাসা করা যায় না। জবাবও হয়ত সে জানে না। কোন দিন ভেবেও দেখে নি। জীবনকে যাচাই আর বিশ্লেষণ করে দেখবার শিক্ষা সে পায়নি, প্রচলিত প্রথায় জীবনকে গ্রহণ করে সুখী হওয়াই তার স্বভাব। তবু দু'একটা প্রশ্ন না করে হীরেন পারল না।

একটু তফাতে দাওয়াতে সে বসতে যাবে, দিগম্বরী ব্যস্ত হয়ে বারণ করে আসন এনে পেতে দিল।

'আপনি কতদূর পড়েছেন বৌদি ?'

'আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ ঠাকুরপো। বাংলা বইটই একটু যা পড়তে পারি।'

'কি বই পড়েন ?'

'এই রামায়ণ মহাভারত। নাটক্ নভেল যদি কখনো পাই তো পড়ি।

'নাটক নভেল কি পড়েছেন দু'একখানার নাম করুন না বৌদি ?'

'অত কি মনে থাকে ঠাকুরপো ? দাঁড়ান, সেদিন একটা বই পড়েছি বটে, ত্রিলোচনবাবুর 'সতীর জয়'। পড়েছেন ? সুন্দর বই, পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। এক চরিত্রহীন লম্পটের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হল, বিনা দোষে সন্দেহ করে স্বামী তাকে ত্যাগ করল। তারপর কত দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করে শেষে মেয়েটি আবার সব ফিরে পেল। স্বামীর বসন্ত হয়েছিল, সবাই তাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটি খবর পেয়ে একা যমের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। ওর স্বামী আবার ওকে গ্রহণ করল, সেই থেকে তার চরিত্রও শুধরে গেল। বইখানা পড়ে দেখবেন ঠাকুরপো।'

'কিন্তু সংসারে কত অসতী মেয়েও তো কখনো দুঃখ কষ্ট না পেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দেয়।'

'ছাই দেয়। আর দিলেই বা, এ জীবনটাই তো সব নয়, পরজন্মও তো আছে।'

'পরজন্মের কথা ভেবে বুঝি মেয়েরা সতী হয়?'

দিগম্বরী হেসে ফেলল। দিগম্বরীর হাসিটিও বেশ, পানে রাঙ্গা দাঁতগুলির জন্য বড় মোলায়েম আর মিষ্টি। হাসিমুখেই সে বলল, 'সতীত্ব হল মেয়েদের ধর্ম্ম। এমনিই তারা সতী হয়, ভেবে চিন্তে হয় না ঠাকুরপো।'

হীরেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দিগম্বরী একটু ব্যাকুলতার সঙ্গেই বলল, 'উঠছেন কেন, বসুন না একটু? আপ'ন বড়লোক মানুষ, গরীবের বাড়ী এসে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ঠাকুরপো?'

হীরেন আবার বসে জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে কে বলল আপনাকে?'

'একি বলে দিতে হয় ঠাকুরপো! পাড়াগাঁয়ে থাকা তো অভ্যাস নেই আপনাদের। না পাওয়া যায় একটা জিনিষ না পাওয়া যায় কিছু। ওখানে আপনার কতগণ্ডা চাকর বাকর, এখানে আমি গেঁয়ো মানুষ—'

'আপনি যা আদর যত্ন করছেন বৌদি—'

দিগম্বরী খুসী হয়ে বলল, 'যান! বাড়াবেন না ঠাকুরপো। আপনার স্ত্রী নাকি কটা পাশ দিয়েছেন? তাই শুধোচ্ছিলেন, আমি কদ্দূর লেখাপড়া করেছি! আমার মত মুখ্যু মেয়েমানুষ দেখে আপনার নিশ্চয় ঘেন্না হয়।'

এমনি আলাপে দিগম্বরী অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিল। তার কথা আর সুরে বরাবর একটা চাপা সম্ভ্রম আর ঈর্ষার ভাব হীরেনকে খুসী করে তুলেছিল। অতি সহজেই সে নিজেকে দিগম্বরীর ঘরোয়া সীমাবদ্ধ মানসিক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুলল। হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বাঁ হাতের ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে দিগম্বরীর বসবার ভঙ্গী, ঠোঁটে

পানের রসের শুকনো দাগ, কানের মাকড়ি, চোখের নম্রতা, চুল বাঁধার কায়দা এই সব লক্ষণ কখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কখনো মিলিতভাবে তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল, এই মেয়েটি সাধারণ, কিন্তু এ জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই ওকে স্পর্শ করে। একগ্লাস জল চাইতে দিগম্বরী তাকে সরবৎ এনে দিল, তারপর আচমকা বলে বসল, 'একটা কথা বলব ঠাকুরপো ? ওঁর একটা চাকরী বাকরী করে দিন না ? কত চাকরি আপনার গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়ে যাবে।'

হীরেনের প্রথম মনে হল, কোনদিন কোন অবস্থাতেই দিগম্বরী বোধ হয় শশাঙ্কের কথা ভুলতে পারে না। এতক্ষণ যে তার সঙ্গে আলাপ করেছে তাও স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে করেছে। এক মুহূর্তে চিন্তার ভান করে হীরেন বলল, 'শশাঙ্কদার যদি চাকরি করে দিই, দেড়শ' দুশো টাকার চাকরি হয়, আপনিও কলকাতায় গিয়ে থাকবেন তো ?'

দিগম্বরীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তনের মানেটা হীরেনের এমন অদ্ভুত রকম স্পষ্ট মনে হল !

'আমাকে কেন ?'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—মেলামেশার একটা লোক পাবে।' কৈফিয়তটা বড়ই খাপছাড়া শোনাল। কলকাতা সহরে তার স্ত্রীর মেলামেশার লোকের কি এতই অভাব যে মেলামেশার জন্য ঝুমুরিয়া থেকে তাকে লোক নিয়ে যেতে হবে। হীরেণের কিন্তু খেয়ালও ছিল না, সে নিজের চিন্তাতেই মসগুল। দিগম্বরী একবার হীরেনের মুখের দিকে চায় আর মুখ নামিয়ে নেয়, গালে রঙ এসে আবার বিবর্ণ হয়ে যায়, যদিও রঙ তার তেমন ফর্সা নয় বলে সেটা তেমন স্পষ্ট হয় না।

'তা উনি কলকাতায় চাকরি করলে আমিও সেখানে থাকব বৈকি। চাকরি দেবেন ঠাকুরপো ?'

হীরেন একটু হেসে বলল, 'আপনার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে চাকরি করে দিতে পারব কি না ?'

'ওমা, আপনি চাকরি করে দিতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ !' দিগম্বরীও এবার একটু হাসল।

হীরেন বলল, 'চাকরী খালি না থাকে আমার আপিসে চাকরি তৈরী করে দেব। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি আপনাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে রাখব'খন। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতেও তো থাকতে পারেন গিয়ে ? আমার স্ত্রী তাহলে সব সময় আপনার সঙ্গ পাবেন ?'

'আপনার স্ত্রীর কি কোন অসুখ ?'

'মনের অসুখ।'

'ও, বুঝেছি।'

তাদের উপকার করতে হীরেণের আগ্রহের কারণটা এতক্ষণে যেন দিগম্বরী ধরতে পেরেছে মনে হল। শশাঙ্ককে চাকরি দিয়ে তাকে হীরেন বিনা মাইনেতে আরেকটা চাকরী করিয়ে নেবে। কিন্তু হীরেণের স্ত্রীর কোন অসুখের কথা তো কৃষ্ণেন্দু বলে নি ? একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

হীরেণ গম্ভীরমুখে ভাবছিল, নিজের মনে মাথা নেড়ে সে বলল, 'না, আমাদের বাড়ীতে থাকাটা ঠিক হবে না। একটা ভাড়াটে বাড়ীই ঠিক করে রাখব আপনাদের জন্যে।'

দিগম্বরীকে ধাঁধায় ফেলে হীরেণ চলে গেল। একটু ভয় ভয় করতে লাগল দিগম্বরীর। হীরেণের পাতলা পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে গিয়েছিল। অতি মৃদু, অতি অদ্ভুত একটা সুগন্ধ দিগম্বরীর নাকে লাগছিল, আতর কি এসেন্স কে জানে! বড়লোকের ছেলে, এমন সুপুরুষ, সে কেন এলোমেলো কথা বলে ? তবে চাকরিটা সে নিশ্চয়

করে দেবে—ছু'শো টাকার চাকরি! এতদিনে কি তার লক্ষ্মীপূজার ফল ফলল, মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন? নিজের হাতের দিকে চেয়ে দিগম্বরীর চোখে জল আসে। শুধু সরু ছু'গাছি চুরি। আর কানে ছুটি মাকড়ি। আর কিছুই তার নেই—একে একে সব গেছে। হাতে টাকা হলেই আগে সে চুড়ি গড়িয়ে নেবে, তিনগাছি করে।. তারপর হার। বিছে হারই তাকে ভাল মানায়।

মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর আলোচনা তখনো শেষ হয় নি। মোহন কয়েকটা বাস্তব প্রশ্ন তুলেছে, কৃষ্ণেন্দু তার জবাব দিচ্ছে।

রম্ভা একমনে শুনছে, ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে তার ভায়ের দিকে। এবারও নরেশ রম্ভার সঙ্গে এসেছে। সে কিছু শুনছে কিনা সন্দেহ। অদ্ভুত বিহ্বল দৃষ্টি, বদ্ধ পাগলের যেন এসেছে আবেশের বিহ্বলতা। রম্ভাকে ছ্যাখে অনেকেই, হীরেণও কতবার দেখেছে। নরেশের দেখাটাতে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি আছে। আগেও নরেশকে সে এ ভাবে রম্ভার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। হয় তো ঠিক এভাবে নয়, এই রকম একাগ্রতার সঙ্গে সকাতর হিংস্র দৃষ্টিতে। আজ তার চোখে যেন উঁকি মারছে হাজার হাজার চাঁদে পাওয়া কিশোর লম্পট।

জামা গায়ে দিয়ে জুতো পরতে পরতে হীরেণের মনে পড়ল টেঁপির ব্যাপারটা। টেঁপিকে নিয়ে নরেশ পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিলন ঘটিয়ে দিতে চাইলে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তার এলোমেলো পাগলামির মানেটা খানিক অনুমান করেছিল শুধু হীরেণ। এতো সংসারে হরদম ঘটে। একজন জ্বালায় আর জ্বালাতন করে, আরেকজনকে তাই দরকার হয়। কৃষ্ণেন্দু নরেশকে ভয়ানক মেরেছিল বলে হীরেণের বড় রাগ হয়েছিল, এ যেন ধাক্কা খেয়ে একজন আছাড় খেয়েছে বলে তাকে শাসন করা। মার খেয়েও কৃষ্ণেন্দুর

প্রতি নরেশের টান আর ভালবাসা দেখে হীরেণ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, একটুও ঈর্ষাও তার হয়েছিল বৈকি! আজ জুতোয় পা ঢোকাবার কয়েক মুহূর্তে তার যেন একটা নতুন জ্ঞান জন্মে গেল। নরেশের কৃষ্ণেন্দু-ভক্তির মূল নেই, মূল্যও নেই। কৃষ্ণেন্দুর প্রতি রম্ভার ভক্তিটাই নরেশ অনুভব করে। রম্ভা তাকে ভক্তি করায়।

'কিরে নরেশ!'

নরেশ বোকার মত একটু হাসল।

'রম্ভা যে চুপ চাপ?'

রম্ভা ভুরু কুঁচকেই বলল, 'আপনি নাকি পালাচ্ছেন? পালান— পালান, প্রাণ নিয়ে শীগগির পালান।'

হীরেণ রাগ করল না। সহজ ভাবেই বলল, 'পালাচ্ছি না রম্ভা। ফিরে যাচ্ছি।'

'ছুদিন পরেই নয় যেতেন! না, ডর লাগছে থাকতে?'

'ডর লাগছে রম্ভা। আমি ভীষণ ভীরু মানুষ।'

রম্ভা একটু ভড়কে গিয়ে চুপ করে রইল। এতক্ষণ বোধ হয় তার খেয়াল হ'ল, সহরে কতখানি সম্মান করে সে হীরেনের সঙ্গে কথা কইত আর কাল থেকে কি স্পর্দ্ধা সে দেখাচ্ছে তার কাছে। তার বাপ খুন হয়ে গেছে বলে সে যেন রাণী মহারাণী হয়ে গেছে, সকলকে ধমক দিতে আর বাধা নেই।

হীরেণের পিছু পিছু বেরিয়ে গিয়ে সদরের কাছে তাকে সে পাকড়াও করল।

'কিছু মনে করবেন না, হীরেণ বাবু। মাথা টাথা ঠিক নেই মোর।'

'কিছু মনে করিনি রম্ভা।'

'রাগ করেন নি?'

রম্ভার বেয়াদবির বদলে এই অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা হীরেণকে চটিয়ে দিল। বাড়ীর ঝি অথবা কারখানার মেয়ে মজুরের সঙ্গে কথা বলার মত গম্ভীর মুখে কড়া গলায় সংক্ষেপে বলল, 'না।'

রম্ভা গ্রাহ্যও করল না।—'কখন যাবেন আপনি ?'

'কাল সকালে যাব।'

'একটা কাজ তবে করুন হীরেন বাবু। নরেশ ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে যান। এখানে থেকে ও কি করবে ?'

'ও যায় তো চলুক।' হীরেন বলল, উদাসীনভাবে।

রম্ভা মিনতি করে বলল, 'ধমক ধামক দিয়ে নিয়ে যান হীরেন বাবু। বড্ড জ্বালাতন করছে আমাকে। এইটুকু বয়সে শয়তানের ধাড়ী হয়ে উঠেছে ছেলেটা।'

গাছের একটা পাকা সিঁদুরে আমে চোখ রেখে আরও উদাসীন ভাবে হীরেন বলল, 'তুমি প্রশ্রয় দাও কেন ?'

'ওমা! সে কি কথা ? কত গাল দিইছি, ঝাঁটাপেটা করব বলেছি—'নরেশকে আসতে দেখে সে থেমে গেল। তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে খানিক তফাৎ দিয়ে কি উদ্দেশ্যে নরেশ কোথায় চলেছিল বলা যায় না, রম্ভা তাকে ডাকল, 'নরেশ শোন, ইদিক আয়। হীরেন বাবুর সাথে তুই কাল কলকাতা ফিরে যাবি, বুঝলি ?'

নরেশ কিছু বলার আগেই হীরেন বেরিয়ে গেলে। নরেশ কলকাতা যেতে অস্বীকার করলে তার সামনেই হয় তো রম্ভা তাকে ঝাঁটাপেটা করতে চাইবে, সেটা সহ্য করার মত মনের অবস্থা হীরেনের ছিল না।

আবছা অন্ধকারে ঝুমুরিয়ার কুৎসিৎ গ্রাম্য চেহারা ঢাকা পড়েছে। সকলে বলে তাই হীরেন চিরকাল সায় দিয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে কোনদিন খুঁজে পায়নি ঘর বাড়ী বন জঙ্গল মাঠ ঘাট পথের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে গ্রামের সেই বিখ্যাত শ্রী। খড় টিন বাঁশ

কাঠ মাটি দিয়ে গড়া বাড়ীগুলি আদিম স্থাপত্য শিল্পেরও কুৎসিৎ ব্যঙ্গ। বদরঙ্গা একটু তলানি জলের দীঘি, ভাঙ্গা ইটের পুরাণো শ্রীহীন ঘাট, আগাছা ভরা পচা মাটির গর্ত্তে পচা ডোবা-পুকুর, এবড়ো খেবড়ো কর্কশ বর্ণহীন মাঠ। আর কি বিশ্রী পোষাক আর চেহারা মানুষগুলির, কি দৃষ্টিকটু সব গরু বাছুর। এখন ওসব চোখের আড়ালে। হীরেণ আরাম পেল।

ধুলোয় ভরা কাঁচা উঁচু পথ দিয়ে চলতে চলতে এক মোড়ে এসে হীরেন দাঁড়াল। গামছা কাঁধে গরু তাড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল কার্ত্তিক। মাঝবয়সী জোয়ান মানুষ, বুকে পিঠে ছড়ানো দাদ। বাঁদিকের গালেও একটু দাদ হয়েছে, বেশী না ছড়ালেও বেশ জমকালো।

'মদের দুকান? বলতি পারতাম বাবু। ওই যে বুড়ো বটগাছ দেখতিছেন, ওনার গায়ে হাট। হাটের পিছে মাগিদের ঘর—দু'রশি তফাতে চরণ সা'র দুকান।'

হীরেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। অতি প্রাচীন এক বটগাছের কাছে কতগুলি শূন্য চালা। আজ হাটবাজার নয়। পূর্বে একটু তফাতেই গায়ে গায়ে লাগান ছোট আট দশখানা টিনের ঘর, অল্প খানিকটা জমির মধ্যে জমাট করা ঘরগুলির মধ্যে দু'হাত চওড়া গলিও আছে। বাইরে দু'তিনটি স্ত্রীলোক দেখা গেল। দেখলেই বোঝা যায় তারা দেহের ব্যবসা করে, অতি গরীব এবং ছোট জাতের মেয়ে। খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজেছে, পান খেয়ে কাল ঠোঁট রাঙ্গিয়েছে, সেমিজ ছাড়াই সস্তা তাঁতের শাড়ী পরেছে, আর দাঁড়িয়েছে ভঙ্গি করে, যে ভঙ্গি এদের অভ্যাস হয়ে যায়।

কিছু দূরেই বাগ্দি পাড়া। দেখলেই চেনা যায়। বিশ্ব যাদের বর্জ্জন করেছে, চারিদিকে অনেক খালি জমি পড়ে থাকতেও যারা একটুখানি জমিতে ছোট ছোট ভাঙ্গাচোরা কুঁড়ে তুলে গড়ে তোলে

নিজেদের পাড়া, কত সঙ্কেত আর চিহ্নই যে থাকে তাদের সেই সীমাবদ্ধ জগতের! মানুষ-সমান উঁচু পচা-খড়ের পুরাণো কুঁড়ের লেপামোছা তকতকে একটুখানি মাটির দাওয়া, সেখানে সোনারঙের চেরা বাঁশের শিল্প।

এটা ঝুমুরিয়ার এক প্রান্ত। পূবদিকে পথটা খানিক সোজা গিয়ে বেঁকতে বেঁকতে ষ্টেশন থেকে ঝুমুরিয়ায় ঢুকবার পথে মিশেছে। কতগুলি আলো দেখে ও লোকের কলরব শুনে হীরেন এগিয়ে গেল। চরণ সা'র মদের দোকান দেখে সে গেল ভড়কে। টিনের চাল আর মাটির দেয়ালের একটা ঘর, দেয়ালের গায়ে একটা ফোকর দিয়ে মদ বিক্রী হচ্ছে। এদিকে একটা চালার নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে ক্রেতারা সেই মদ খাচ্ছে। লোক মন্দ হয়নি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা হয় দেরীতে, সাড়ে আটটায় মদ বিক্রি বন্ধ। দিনের আলো শেষ হবার আগেই তাই অনেকে রাতের নেশার জোগাড়ে ছুটে আসে। কারো গায়ে সার্ট ফতুয়া, করো শুধু ধুতি বা লুঙ্গি, কারো শুধু গামছার মত ছোট আর ছেঁড়া কিছু কোমরে জড়ান। গেলাস, বাটি, টিনের মগে কেউ মদ নিয়েছে, কারো পাত্রটি মাটির, কেউ বা তৃষ্ণা মেটাচ্ছে সোজা বোতল থেকে। বোতলওয়ালাদের সংখ্যা খুব কম। বোতলের জন্য পয়সা জমা রাখতে হয়।

দেয়ালের ফোকর ঘিরে লোক ছিল, হীরেনকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে পথ ছেড়ে দিল। ফোকরের ওপাশের লোকটির ঘামে ভেজা ভূঁড়িটি শুধু দেখা যায়।

'বিলিতি আছে?'

'নাঃ। এক নম্বর আর দু'নম্বর পাবেন।'

'কোনটা ভাল?'

'এক নম্বর।'

একটা এক নম্বর পাঁইট কিনে হীরেন সরে এল। সবাই তাকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। তার মত ভদ্রলোক নিজে এখানে মদ কিনতে আসে না, লোক পাঠিয়ে দেয়। তার চেয়ে অনেক কম দামী জুতো জামা পরা ভদ্রলোক যদি বা কেউ আসে, বোতল কিনেই সে এখান থেকে সরে পড়ে। হীরেণ এখানে বসেই খাবে সন্দেহ করে সকলে গভীর বিস্ময় আর অস্বস্তিকর কৌতূহলের সঙ্গে তার চালচলন লক্ষ্য করতে লাগল। এখনো সকলের নেশা জমে নি। ঘণ্টাখানেক পরে হলে হয়ত বেশীর ভাগ লোক তার দিকে চেয়েও দেখত না। দু'চারজন একটু মুচকে হাসত, কেউ পাশেই চাটাই ঝেড়ে বসতে ডেকে তাকে দেখাতে চাইত ভদ্রলোকের খাতির সে জানে।

অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হীরেন আবিষ্কার করল রামপালকে। রামপাল গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল, হীরেন নাম ধরে ডাকাতে অপরাধীর মত কাছে এল।

'ও রামপাল, এ যে বড় মুস্কিলে পড়লাম। বিলিতি কিছু পাওয়া গেল না।'

'আজ্ঞে এখানে—'

'তুমি এটা খেয়েছো, এক নম্বর না কি?'

'আজ্ঞে আমি—'

হীরেন অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'ওসব রাখো রামপাল। এটা খাওয়া যাবে কিনা তাই বলো।'

রামপাল সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে জিনিষটা মন্দ নয়, তবে বিলিতির মত কি আর হবে!'

বিক্রীর সময়েই বোতল খুলে দিয়েছিল। আর একবার শুঁকে দেখে হীরেন বলল 'কিন্তু গন্ধটা একেবারে বিশ্রী। একি খেতে পারব?'

খানিকটা মদ মুখে ঢেলে গিলে ফেলেই হীরেন বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রামপাল তৎক্ষণাৎ সেটা কুড়িয়ে আনল।

হীরেন উদাসভাবে বলল, 'তুমি খাবে রামপাল? খাও। লজ্জা কি, খাও।'

একটু তফাতে সরে হীরেণের দিকে পিছন ফিরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রামপাল বোতলটা খালি করে দিল। অর্দ্ধেক মদ পড়ে গিয়েছিল, নয় তো পাঁচমিনিটে এক পাঁইট মদ গিলবার ক্ষমতা রামপাল অর্জ্জন করেনি। ফোকরে গিয়ে বোতল ফিরিয়ে দিয়ে পয়সাও সে নিয়ে এল।

হীরেন করুণ সুরে বলল, 'কিন্তু আমার কি হবে রামপাল? বিলিতি কোথায় পাব? বিলিতি নইলে তো আমার চলবে না।'

রামপাল আপশোষ করে বলল, 'এ লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ে বিলিতি কোথায় পাবেন বাবু। কে আর ওসব খায়, অত দামী জিনিষ? এক ওই হেরম্ব বাবু খায়, সদর থেকে ওর বাক্স বোঝাই মদ আসে।'

দুঃসহ অনিবার্য্য বিপদের মত রাত্রি বাড়তে থাকে। মাথার মধ্যে আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে। আগে জানলে সে সদরে চলে যেত। এখন তাও সম্ভব নয়। কি বোকার মতই সে ভেবেছিল শ্যাম্পেন হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি না হোক, দেশী মদ খেয়েই আজ নেশা করবে—তার দরকারী নেশা, অপরিহার্য্য নেশা। দেশী মদ যে খাওয়াই যায় না সে কি তা জানত!

আরেকবার চেষ্টা করবে?

রামপাল আরেক পাঁইট মদ নিয়ে এল। একটা টুলও কি করে যেন যোগাড় করল। চালার খানিক দূরে টুলে বসে অতি কষ্টে জল মিশিয়ে কিছু মদ হীরেন পেটে চালান করে দিল। তখন মনে হল খেতে কষ্ট যেন আর বেশী হচ্ছে না। ইচ্ছা করলে এইখানে টুলে বসে বোতলের পর বোতল এই দেশী মদ সে চালিয়ে যেতে পারে। আতঙ্ক

কমে গিয়ে একটু স্বস্তি সে বোধ করল কিন্তু বিলিতি মদের তৃষ্ণাটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

হেরম্বের কাছে বিলিতি মদ আছে।

হেরম্বের কাছে বাক্স ভরা মদ আসে। হেরম্ব যদি বন্ধু হ'ত তাদের! একটু যদি ভাব থাকত তার হেরম্বের সঙ্গে!

চালার নীচে, সাফ করা অঙ্গনে কোলাহল বাড়ছে। ভিড় বেড়েছে এখন। কোথা থেকে এত লোক এল? ঝুমুরিয়া কি খালি হয়ে গেছে, ঘরে ঘরে শুধু নারী আর শিশু? এত লোক মদ খায় কেন, এত গরীব লোক?

'গরীবরা তাড়ি খায়।'

'এরা সব বড়লোক বুঝি?'

'বড়লোক নয় বটে, দু'চার গণ্ডা পয়সা না নিয়ে হেথায় কে আসবে! কিন্তু এসবের চাইতে তাড়ি ভাল বাবু, খাঁটি পচাই ভাল। দেহ ভাল রাখে, গায়ে জোর করে। দিনভর যারা খাটে, খেতে পায় তারা? তাড়ি খেয়ে, পচাই খেয়ে তারা বেঁচে থাকে।' রামপালের বেশ নেশা হয়েছে, বকতে ভাল লাগছে। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে সে বলতে থাকে, 'বাবুরা আবার মিটিং করে উপদেশ ঝাড়ে, মদ খেও না, তাড়ি খেও না, পয়সা নষ্ট কোরো না। বলি ওরে ছুঁচো পাজী হারামজাদা, তবে খেতে দে—পচাই খাবনা তো পেট ভরে খেতে দে, ওষুধ দে—'

'ওষুধ—?'

'মদ খেলে রোগ বালাই কম হয় বাবু। তেজী জিনিষ তো। পটলদা বলে—'

'পটলদা কে?'

'মোর স্যাঙাৎ। হেরম্ববাবুর বেয়ারা। পটলদা বলে, পচাই খা,

তাড়ি খা, খবর্দ্দার নম্বুরী মাল ছুঁসনি রাম—ওতে ওষুধ মেশাল দেয়। নেশা জমে কিন্তু দেহের দফা শেষ।'

বিক্রী বন্ধ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফোকরের কাছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। কয়েকজন চলে গেছে, নতুন কয়েকজন এসেছে। চারিদিকের গোলমালে কাণ পাতা যায় না। সবাই কথা বলছে, হট্টগোলে নিজের কথা নিজের কাণে পৌছে দিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে—বন্ধু বান্ধব চেনা অচেনার মধ্যে সে এক প্রচণ্ড কলরব তুলে আলাপ করা।

দু'চারজন শুধু একেবারে চুপচাপ। অতি দুর্ব্বল অক্ষম রুগ্ন তাদের দেহ, মুখে মৃত্যুর অসম্পূর্ণ ছাপ, একটু একটু মদ খাচ্ছে আর ঢুলছে। কোন নেশাই আর এ জীবনে তাদের কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও উত্তেজিত, জীবন্ত করে দিতে পারবে না।

'দশটা পয়সা দাও বাবু। বাবুগো, দশটা পয়সা দাও।'

বছর চল্লিশ বয়সের একটি স্ত্রীলোক, ময়লা আটহাতি একখানা কাপড় পরা, মুখ বুক আমসির মত শুকনো।

রামপাল ধমক দিল, 'ভাগ।'

চালার নীচে থেকে মাটি আর সুরকির ছাপ মারা ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট পরা একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে উঠে দাঁড়াবার টাল সামলে স্ত্রীলোকটির সামনে এগিয়ে এল।

'ফের তুই হেথা এইছিস মাসী?'

'তুই যে এইছিস বড়?'

'তুই আর আমি সমান? তুই পুরুষ? তোর মত বজ্জাতি করতে আসি আমি? যা বলছি এখান থেকে, না যাবি তো তোকে আজ—'

'একটু কিনে দে তবে। ও গোপাল, সোনা মাণিকটি আমার, দে বাবা একটু কিনে।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বোনপোর অশ্রাব্য গালগুলির প্রত্যেকটি কাণ দিয়ে ঢুকে মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে পরিণত হয়ে যায়। তারপর কোথা থেকে উঠে আসে লুঙ্গি পরা জোয়ান এক মরদ। এক ধাক্কায় বোনপোটিকে পাঁচ হাত তফাতে সরিয়ে দিয়ে সে মাসীকে বলে, 'চল যাই।'

'আগে কিনে দে।'

কোমরে গোঁজা পয়সা বার করে লোকটি দু'তিনবার গোণে। পয়সা আছে মোটে তিন গণ্ডা। একটু সে ইতস্ততঃ করে। একবার চোখ বুলিয়ে নেয় স্ত্রীলোকটির সর্ব্বাঙ্গে। তার মনের দ্বন্দ্ব যেন হীরেনের চোখের সামনে ঘটনা হয়ে ঘটতে থাকে, দুই ঘেয়ো কুকুরের মারামারির মত, দুই বেগের দরদস্তুরের মত। আরও মদ, না এই বুড়ী?—এ সমস্যা যেন দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে লোকটার মুখ। তীব্র অসহ্য কৌতূহলে হীরেন প্রতীক্ষা করে থাকে।

লোকটি ফোকরের কাছে গিয়ে টিনের মগে মদ এনে বলে, 'এক চুমুক খাই?'

স্ত্রীলোকটি বলে, 'আগে আমায় দে।'

মগটা হাতে পেয়েই একচুমুকে সে সবটা মদ গিলে ফেলে, মুখ তুলে মগটা খানিকক্ষণ ধরে থাকে যাতে এক ফোঁটাও না নষ্ট হয়। লোকটি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম করে স্ত্রীলোকটি সামলে নেয়, বারকয়েক মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটির সঙ্গে মিশে যায় চারিদিকের আলোছায়া অন্ধকারে।

হীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে কিছু হবে না রামপাল। ও কিস্সু জানে না। এক নম্বরের বোকা।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'এবার যাওয়া যাক।' হীরেন উঠে দাঁড়াল।

রামপাল নিরাশ হয়ে বলল. 'আর খাবেন না ?'

'ও, হ্যাঁ। ঠিক। তিনচারটে বোতল কিনে রাখা যাক।'

বগলে এক একটি বোতল নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কাছে দূরে দু'টি একটি আলো মিট মিট করছে। চাঁদ উঠেছে আধখানা। মৃদু জ্যোৎস্নায় জীবনের রূপ ঢাকা পড়ে নি। হাটের পাশে টিনের চালের অনেকগুলি ঘরে আলো। একটা সস্তা হারমোনিয়ামের চেরা চেরা আওয়াজ কাণে আসছে। কোথায় তারা যাবে কিছু ঠিক নেই। রামপাল কি ওই ঘরগুলির দিকে এসেছে ? রম্ভার স্বামী রামপাল ? চলুক যেখানে খুসী। ওটাও তো মানুষের আস্তানা।

কৃষ্ণেন্দুকে বিপদের মুখে ফেলে যাবার সঙ্কোচ আর হীরেনের নেই। মন হাল্কা হয়ে গেছে। লাখপতি বাবার ছেলে আর লাখপতি শ্বশুরের জামাই হীরেন আজ কোথায় এই ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে জীবন দেখে বেড়াচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র, এক হয়ে মিশে গেছে বঞ্চিত নিষ্পেষিত বিকৃত মানুষের সঙ্গে ! কৃষ্ণেন্দু নিজেই তো স্বীকার করেছে সে যত সহজে গেঁয়ো অশিক্ষিত মানুষকে বুঝতে পারে, সে তা পারে না। কৃষ্ণেন্দু চুলোয় যাক, তার ভুল পথ, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। সে নিজে এবার কাজে নামবে, নিজের সময় দেবে, অর্থ দেবে আর দরকার হলে কৃষ্ণেন্দুর মত জেলে যেতে বা প্রাণ দিতে রাজী থাকবে,—কৃষ্ণেন্দুর মত মাথা গরম করে নয়, যাতে সত্যই কিছু কাজ হয় দেশের। কৃষ্ণেন্দুকে ফেলে সে পালাবে না, সে চলে যাবে কাজ করতে !

বহুদিন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এসে এখন ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে ধূলোভরা কাঁচা রাস্তায় মৃদু জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হীরেন নিষ্প্রভ তারা-বসানো আকাশের দিকে মুখ তুলল। পথ খুঁজে পাবে বলে কি সেই

অদৃশ্য শক্তি তাকে ঝুমুরিয়ায় আসবার প্রেরণা দিয়েছিল? ভবিষ্যৎ জীবনটা তার যাতে সার্থক হয়, দেশের মানুষকে মানুষ করার চেষ্টায়, নীচে যারা পৃষ্ট হচ্ছে তাদের উপরে তুলে আর উপরে যারা অভিশাপের মত চেপে আছে তাদের নীচে নামিয়ে আনার সাধনায়?

মদ খাওয়া সে ছেড়ে দেবে। কলকাতায় ফিরে ডাক্তারের চিকিৎসায় নিজের এই পাগলামিকে জয় করবে। ওষুধের পর ওষুধ খাবে, ইন্জেক্শনের পর ইন্জেক্শন নেবে, কিন্তু মদ আর ছোঁবে না। জীবনে এই তার শেষ মদ খাওয়া।

মমতা খুসী হবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, ভালবাসবে। কাজে নামতে চাইলে মমতাকেও সে সঙ্গে নেবে। চিয়াং-কাই-শেক দুজনের মত তারা স্বামী-স্ত্রী—

যাক। এসব ভবিষ্যতের কথা। অনেক দূর ভবিষ্যৎ। রামপাল তাকে টিনের ঘরগুলির কাছে এনে ফেলেছে।

'না, রামপাল। এখানে ঢুকতে পারব না।'

'তবে কোথায় বসে খাবেন?'

হীরেন এ কথার জবাব দিল না। বলল, 'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'তোমার সেই সাঙাৎ পটলকে দিয়ে কিছু বিলিতি যোগাড় হয় না? যত টাকা চায় দেব। দশ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় কিনব।'

'বলে দেখা যায়। আপনি বসবেন কোথায়? যেতে আসতে সময় নেবে।'

'আমিও সঙ্গে যাব চল। বোতল চারটে কারো ঘরে রেখে এস। বিলিতি না পেলে এখানে আসব।'

রামপাল দু'হাত চওড়া গলির একটাতে ঢুকে দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। হেরম্বের আস্তানা প্রায় দু'মাইল দূরে। হীরেনের

নেশা হয় নি, রামপালের নেশা কেটে গেছে। তুজনে প্রায় নিঃশব্দে সমস্ত পথটা হেঁটে গেল। কার একটা ছোট একতালা বাড়ী হেরম্ব ভাড়া করেছে, বাড়ীটা নতুন। এখানকার কেউ বিদেশে গিয়ে বড় লোক হয়ে সখ করে বাড়ী তৈরী করেছিল, নিজে বিদেশেই থাকে, সখ চাপলে দেশের বাড়ীতে তু'চারদিন এসে সখের বাস করে যায়। বাড়ীর কাছে তিনটে তাঁবুও পড়েছে হেরম্বের। কাছেই একটা লরী, খানিক তফাতে অনেকগুলি গরুর গাড়ী। ছোট আমবাগানের ধারে কতগুলি পাতার ঘরের কাছে মশাল জ্বালিয়ে কুড়ি বাইশটি স্ত্রীপুরুষ আড্ডা দিচ্ছে। চার পাঁচটা চুল্লীতে হচ্ছে রান্না।

হীরেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। রামপাল গেল তার সাঙাৎ পটলকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পরেই আরও তু'জন লোককে সঙ্গে করে সে ফিরে এল। একজনের হাতে লণ্ঠন, চাকর-বাকর কেউ হবে। আরেকজন মোটসোটা ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে নিরীহ চেহারার বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পায়ে চটি, গায়ে হাফসার্ট। হাফসার্টটি এইমাত্র গায়ে চড়িয়েছেন বোঝা যায়, হীরেনের সামনে এসে তৃতীয় বোতামটি লাগানো শেষ করলেন।

রামপাল কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ইনি হেরম্ববাবু।'

হীরেনের মনে হল রামপাল তামাসা করছে। আলোচনা শুনে শুনে কল্পনায় তাকে সে ভেবে রেখেছিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ একগুঁয়ে বদরাগী একটা মানুষ হিসাবে, যে হাণ্টার হাতে ঘুরে বেড়ায় আর মদ খেয়ে যুবতী কুলি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে যায়, পুলিশ যাকে খাতির করে, গ্রামশুদ্ধ লোক যার ভয়ে কাঁপে—তার এমন মাঝবয়সী মুদী দোকানের মালিকের মত নিরীহ গোবেচারী চেহারা!

'হীরেনবাবু তো? আমার নাম শ্রীহেরম্ব চক্রবর্ত্তী। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আপনার চাকরের কাছে শুনলাম, মশায় নাকি বড্ড মুস্কিলে পড়ে গেছেন। তা সেটা আশ্চর্য্য কি! অমনি হয় মশায়। থাকলে দু'ঢোঁক খেলাম তো খেলাম, না খেলাম তো না খেলাম। কিন্তু না থাকলে তখন আলবৎ চাই! কি বলেন? হা! হা।'

জোরালো কিন্তু ক্ষণিকের হাসি।

'তা দয়া করে যদি এলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন, পায়ের ধুলো দিন গরীবের বাড়ীতে।'

হীরেন আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ভাবছিলাম একটা কি দুটো বোতল কিনে—অবশ্য আপনার যদি বাড়তি থাকে—'

হেরম্ব হাত জোড় করল।

'আমায় লজ্জা দেবেন না হীরেনবাবু। আপনার কাছে দাম নেবো! নেহাৎ যদি এসে বসে গরীবের সঙ্গে খেতে না চান আধ ডজন নিয়ে যান। দামের কথা বলবেন না।'

লোকটা কি ব্যঙ্গ করছে? বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবার মতলব করেছে? কৃষ্ণেন্দু আর সে যে তাকে জব্দ করতে ঝুমুরিয়া এসেছে, এ খবরটা হয় তো ও জানে। এতটুকু গ্রামে এ সব কথা চাপা থাকে না। হেরম্বের বুকটা একটু টিপ্ টিপ্ করতে লাগল।

বারান্দার কাছে গিয়ে দেখা গেল, ফর্সা তোয়ালে ঢাকা ছোট একটি টেবিলে মদের বোতল গ্লাস আর ডিস সাজানো রয়েছে। দুদিকে দুটি চেয়ার।

হেরম্ব বলল, 'যাবার সময় যত খুসী নিয়ে যাবেন, কিন্তু অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে বসে একটু খেয়ে আমায় কেতার্থ করতে হবে মশায়। লোকনাথবাবুর ছেলেকে একটু এণ্টারটেন করবার ভাগ্য যদি হল আমার, বঞ্চিত করতে পারবেন না দাদা।'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন?'

'তাঁকে কে না চেনে? মহাশয় ব্যক্তি—অতি মহাশয় ব্যক্তি। ধুলোমুঠো ধরে সোণা করছেন, আমরা কি তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য।'

লোকটি ব্রাহ্মণ। ধার্ম্মিক অর্থাৎ সাধন-টাধন কি সব করে বলে গাঁয়ের লোকে ভয়ের সঙ্গে একটু ভক্তিও নাকি করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটার মুখে এতবার তার আর তার বাবার পায়ের ধুলোর উল্লেখ শুনে হীরেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। চেয়ারে বসে, রঙীন পানীয় ভরা বোতলটির দিকে একনজর তাকিয়েই সে খুসী হয়ে উঠেছিল। যেখানে যার কাছে যে অবস্থাতেই পাওয়া যাক, সে ত্রাণ পেয়েছে। এত কষ্ট যে তার হচ্ছিল মদের জন্য এতক্ষণ যেন ভাল করে বুঝতেই পারে নি।

দ্বিতীয় গেলাস শেষ করে এনে সে বলল, 'আপনি যে এত ভাল লোক তা জানতাম না হেরম্ববাবু। কলকাতা গেলে—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেকথা বলতে! শীগগির একবার কলকাতা গিয়ে আপনার পিতাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসব। একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয় দেব। বাবা খুব খুসী হবেন। আপনাকে একটু এণ্টারটেন করার সুযোগও আমি পাব।'

টেবিলে একসঙ্গে মদ খেতে বসলে অল্পসময়েই হৃদ্যতা জমাট বেঁধে যায়। আলাপ আলোচনা সহজ হয়ে আসে। ভদ্রতা ও অমায়িকতার সীমা কোন পক্ষেই থাকে না।

'হঠাৎ ঝুমুরিয়া বেড়াতে এলেন ভাই?'

'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। ঝুমুরিয়ায় তার বাড়ী।

'হাঁ হাঁ, তাই বটে। দু'জন নতুন ভদ্রলোক গাঁয়ে এসেছেন শুনছিলাম বটে। বন্ধুকে নিয়ে এলেন না?'

'সে এসব খায় টায় না।'

হেরম্ব হাসল দেখে হীরেনও হাসল। তার হাসি গল্প কমে এল রাত এগারটার সময়। ভেতরে তার একটা উদ্বেগ জেগেছে। নেশা চড়াতে চড়াতে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ঠিক নেই। আরও মদ তাকে খেতে হবে, এ পর্য্যন্ত খেয়ে সে কোনদিন থামতে পারে নি। কিন্তু এখানে তো আর এগোনো যায় না। এবার তার বিদায় নেওয়াই ভাল। কথা বলতেও আর ভাল লাগছে না। চুপচাপ মমতার কথা ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতা সতী না অসতী ভেবে ভেবে তার বার করা চাই—আজ রাত্রেই বার করা চাই। চুলচেরা হিসাব করতে হবে সব ঘটনার, মমতার কথাবার্ত্তা আর চালচলনের। কৃষ্ণেন্দু কি যেন সব বলেছে মমতার সম্বন্ধে? কথাগুলি তলিয়ে বুঝতে হবে। মমতা হয়তো ধোঁকা দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে। যা চালাক মেয়ে মমতা! আর কৃষ্ণেন্দুর মত বোকা তো জগতে নেই।

বিদায় নেবার পালা শেষ হতে সময় লাগল। হীরেনকে বড় ভাল লেগেছে হেরম্বের, আরেকটু বসে যাবে না হীরেন, আরেকটু খাবে না? মদ চেয়ে নিতে হীরেনের বড়ই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, হেরম্ব নিজেই কাগজ মোড়া দুটি বোতল রামপালের জিম্মা করে দিল। পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আপশোষ করে বলল, 'কাল সকালেই যাবেন ভাই? আরেকটা দিন থেকে যান না?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'তবে আর কি বলব! দু'চার দিনের মধ্যে আমিও যাচ্ছি কলকাতা। আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দেবেন।'

ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের কোণে ডুবু ডুবু চাঁদ। কই, কষ্ট তো হীরেনের কমে নি! কড়া আঁচে আবেগের ভিয়ান চড়েছে,

আঠার মত যেন ব্যথার তাপে মন জ্বলে গেল। মমতার কথা ভেবে লাভ নেই, চুলচেরা হিসাবে ফল হবে না। মমতা ভাল হোক খারাপ হোক, কিছু তাতে এসে যায় না। সে জানে। তার মন জানে। মমতা তাকে ভালবাসে না, জগতের অন্য সব মেয়ে তাদের স্বামীদের যেমন ভালবাসে। দিগম্বরী যেমন পূজা করে তার স্বামীকে, স্বামী জ্ঞান স্বামী ধ্যান স্বামী সর্ব্বস্ব করে জীবন কাটায়। কি অসহায়, বঞ্চিত জীবন হীরেনের, কি অকথ্য অদ্ভুত তার ভাগ্য! কোন অভাব তার নেই, শুধু সেই জিনিষটি সে পেল না, সকলে যা আপনা থেকে পায়, বিয়ে করা স্ত্রীর শ্রদ্ধা ভালবাসা। শশাঙ্কের মত মানুষ যা পেয়েছে, তার কাছে সেই সুলভ সাধারণ জিনিষ আকাশের ওই ডুবু ডুবু চাঁদটির মত অপ্রাপ্য!

না, আরও অনেক মদ খেতে হবে। খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হবে। কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হবে, কিন্তু বাধা দেবে না। কৃষ্ণেন্দু তার ভীষণ যন্ত্রণার কথা জানে। যদিও সে মাঝে মাঝে বলে, এটা তার মাথার একটা দোষ, একটা অসুখ, চিকিৎসা করালে সেরে যাবে, কিন্তু ওসব কৃষ্ণেন্দুর মুখের কথা। মনে মনে কৃষ্ণেন্দু সব বোঝে। কৃষ্ণেন্দুর মত বন্ধু তার নেই।

'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'হেরম্ববাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম এ কথাটা গোপন রেখো।'

'আজ্ঞে, তা আর বলতে! ও কথা কি প্রকাশ করা যায়!'

বড় দীঘিটার কাছে পৌছে হীরেন রামপালকে একটা বেতল দিয়ে বিদায় করে দিল।

'বাড়ী তক্ পৌছে দি' না বাবু?'

'না, তুমি বাড়ী যাও। এটুকু যেতে পারব।'

দিগম্বরী আজ একলা শুয়েছে। হয়ত তার ঘুম আসছে না। শশাঙ্কের কথা ভাবছে। শশাঙ্ককে সে চাকরীটা দেবে। লোকটা অপদার্থ, কোন কাজে লাগবে না, পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশী ওর মাইনে হওয়া উচিত নয়। তবু দিগম্বরীর জন্য ওকে সে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখবে। মমতার সঙ্গে সর্ব্বদা দিগম্বরীর মেলামেশার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে হীরেনের আর উৎসাহ ছিল না। এই উদ্ভট কল্পনাকে কি করে প্রশ্রয় দিয়েছিল ভেবে এখন সে বরং আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে। মমতা বদলাবে না। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই মমতাকে যা বদলাতে পারে। অন্যকে দেখে কেউ স্বামীভক্তি শিখতে পারে?

শুধু দিগম্বরীর জন্য সে শশাঙ্ককে চাকরীটা দেবে। দিগম্বরী স্বামীকে ভালবাসে বলে, ভক্তি করে বলে—তার অপদার্থ নেশাখোর স্বামী তার জীবন-দেবতা বলে।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিতে দিতে হীরেনের মেজাজ চড়ে গেল, কেউ দরজা খুলল না। তখন সে জুতো পায়ে দরজায় লাথি দিতে আরম্ভ করল। খানিক পরে বোঝা গেল আলো নিয়ে কেউ উঠান পার হয়ে আসছে।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে ভীত স্বরে দিগম্বরী শুধোল, 'কে?'

'আমি। হীরেন।'

দিগম্বরী দরজা খুলতেই সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি, সবাই কি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন?'

দিগম্বরী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিলাম, শুনতে পাইনি। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরপো, কেষ্ট ঠাকুরপোকে ধরে নিয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার একটু পরেই পুলিশ এসেছিল। কৃষ্ণেন্দুর স্যুটকেশ খুলে,

বিছানাপত্র ঘেঁটে, এদিক ওদিক একটু খোঁজাখুজি করে তাকে নিয়ে চলে গেছে। যাবার সময় নাকি মোহনকেও ধরে নিয়ে গেছে।

'কি সর্ব্বনাশ হল ঠাকুরপো।'

'এ সর্ব্বনাশ তো হতই বৌঠান। এ বরং কম সর্ব্বনাশ হল। কিন্তু পুলিশ খবর পেল কি করে?'

'মোহন একটা দল করেছে না, পুলিশ ওকে নাকি ধরব ধরব করছিল।'

'কিন্তু কৃষ্ণেন্দু? ওকে ধরল কেন?'

'তাতো জানি না ঠাকুরপো।'

কৃষ্ণেন্দুকে আগেও দু'বার পুলিশে ধরেছে, কিছুদিন করে জেলও খাটিয়েছে। এত রাত্রে তার ধরা পড়ার ব্যাপার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। হীরেন দরজা বন্ধ করতে গেল।

দিগম্বরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠাকুরপো, এ বাড়ীতে আপনি কেমন করে থাকবেন?'

'কেন?'

'আমি যে একলাটি আছি ঠাকুরপো? পঞ্চুর মাকে আজ রাতে আমার কাছে শুতে বলেছিলাম, সে আসেনি। পুলিশের হাঙ্গামায় ভয় পেয়েছে বোধ হয়।'

'আমি কি তবে এত রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?'

'একটু যদি সকাল সকাল ফিরতেন ঠাকুরপো।'

'সে কথা ভেবে তো এখন লাভ নেই।'

'লোকে যে নিন্দে করবে ঠাকুরপো, যা তা বলবে।'

হীরেন চটে বলল, 'একটা মাদুর টাদুর দিন, আমি ওই গাছতলায় ঘুমোইগে।'

দিগম্বরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রাগ করলেন ঠাকুরপো? আপনাকে কখনো গাছতলায় ঘুমোতে দিতে পারি! দিন, দরজাটা বন্ধ করে দিন। লোকে দুকথা বলে তো বলবে। আমরা তো বেশীদিন থাকছি না এখানে, দু'দিন বাদেই কলকাতা চলে যাব।'

সদরের দরজা বন্ধ করে উঠানে নেমে দিগম্বরী কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, 'সব শুনলে উনিও রাগ করবেন না।'

'ওনার রাগ করবার কি আছে?'

'ওমা! আপনি যেন ছেলেমানুষের মত কথা বলেন ঠাকুরপো। খালি বাড়ীতে একলাটি পর-পুরুষের সঙ্গে বৌ রাত কাটালে স্বামী কিছু ভাববে না, একটু চটবে না? তবে আপনার কথা ভিন্ন। আপনি তো পর নন্।'

কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন দু'জনের বিছানাই ওলট পালট হয়ে আছে। দুটি স্যুটকেশ খোলা, জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। দিগম্বরী হীরেনের বিছানা ঠিক করে দিল।

'আপনার খাবারটা এনে দি? রান্না কিছু হয় নি, যা হাঙ্গামা গেল। শুধু ভাজা আর মাছের ঝোল। দুধটুধ দিয়ে কোনরকমে খেয়ে নিন।'

'আমি খাব না বৌঠান। খেয়ে এসেছি।'

'ওমা, কোথায় খেলেন?'

'খেয়েছি এক জাগায়।'

মদের বোতলটার দিকে দিগম্বরী বার বার তাকাচ্ছিল। তারপর চেয়ে দেখছিল হীরেনের মুখ। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি মদ খান ঠাকুরপো?'

হীরেন জবাব দিল না। একি বোকার মত প্রশ্ন?

'মদের বোতল নয় ওটা?'

হীরেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওটা মদের বোতল। মদ খেয়েছি, আরও খাব। আপনার কিছু ক্ষতি আছে?'

'খেয়েছেন!' দিগম্বরী যেন চমকে গেল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। না ঠাকুরপো, আমার কোন ক্ষতি নেই। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তবে আমি যাই।'

দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় দিগম্বরী দাঁড়িয়ে রইল।

'যাই, ঠাকুরপো?'

'দাঁড়ান একটু। এক মিনিট।'

সন্দিগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টিতে হীরেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খালি বাড়ীতে তাকে মাতাল জেনে ভয় পেয়েও দিগম্বরী পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল এঁটে দিল না, এত সম্মান তার, এত খাতির! হাত ধরে সে তাকে টানতে পারে এই ভয়কে চাপা দিয়েও তাকে অখুসী না করার প্রয়োজনটা এত বড় দিগম্বরীর কাছে! তবে, এও হতে পারে যে ভয় হয় তো সে বেশী পায় নি। তাকে হয় তো সে বিশ্বাস করে।

'কি ঠাকুরপো? কি বলছেন?'

'বসুন না একটু? একলা থাকতে ভাল লাগছে না।'

'বসব?'

'একটু বসুন। কথাবার্ত্তা বলি।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন ঘুমোইগে। আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন ঠাকুরপো।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'পাঁচমিনিট বসুন।'

দিগম্বরী ধীরে ধীরে গিয়ে কৃষ্ণেন্দুর এলোমেলো বিছানায় বসল। মুখের ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। বারবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসছে, তুলে তুলে নামিয়ে নিচ্ছে মুখ।

হীরেনের মনে পড়ল, ঝোঁক এলে সে যাদের ঘরে মদ খেতে যায়, তারা এরকম করে না। তবে দিগম্বরী তাদের মত নয়, দিগম্বরীর অভ্যাস নেই। শশাঙ্ক ছাড়া দিগম্বরী কোন পুরুষকে জানে না, চেনে না, তার জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কেউ নেই। তাই সে এরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটু কাঁপছে। তবু তার ডাকে দিগম্বরী ঘরে এসে বসেছে। শশাঙ্ককে সে চাকরি দেবে বলে। মাসে মাসে শশাঙ্কের মাইনের টাকাটা সে ভোগ করবে বলে,—অবশ্য শশাঙ্কের সঙ্গে ভোগ করবে বলে।

এখনো কি তার উপর বিশ্বাস আছে দিগম্বরীর? এখনো সে কি আশা করছে, সত্যি সত্যি সে তাকে কথা বলবার জন্য ঘরে ডেকে বসিয়েছে? আরেকটু এগোনো যাক। আরও স্পষ্ট, আরও নির্ভুল মীমাংসা হয়ে যাক। তারপর এ যন্ত্রণা থেকে সে ও বেচারীকে মুক্তি দেবে। আর পীড়ন করবে না।

'অত দূরে বসলেন কেন? এখানে এসে বসুন।'

দিগম্বরী সাড়াও দিল না, উঠবার চেষ্টাও করল না।

হীরেন একটা সিগারেট ধরাল। মদের বোতলের কথা তার মনেও ছিল না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে এতক্ষণে সে টের পেল তার হাতও থর থর করে কাঁপছে।

'আমি ভাবছিলাম কি জানেন? সামনের বুধবার মাসের পয়লা তারিখ, একেবারে বুধবার না হোক, সামনের সপ্তাহের মধ্যে যদি শশাঙ্কবাবু কাজে লাগেন মাসের পুরো মাইনেটা পাবেন।'

'সামনের সপ্তাহেই যাবেন,—সোম মঙ্গলবার।'

'সেই ভাল। এখানে এসে বসুন না?'

ওঠবার চেষ্টা দিগম্বরী করে। ওঠে না। হীরেন সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতা দিয়ে পিষতে থাকে। তারপর জুতো খুলে বিছানায়

পা তুলে বসে। তারপর দিগম্বরী উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে হীরেনের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটু বাকী, তারপর হীরেন ওকে মুক্তি দেবে। হাতটি শুধু ধরবে একবার। হাত ধরলে দিগম্বরী কি করে দেখে সে হাসিমুখে সহজভাবে বলবে 'আচ্ছা, আপনি এবার যান।'

লণ্ঠনের কাছে আসায় দিগম্বরীকে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। হঠাৎ তার হাত ধরতে হীরেনের সাহস হল না। তার খেয়াল খেলার সীমানা পার হয়ে যেন এতক্ষণে দিগম্বরী রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। হীরেন কোনদিন ভাবতেও পারে নি মানুষ এমন রূপসী হতে পারে! ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে আছে—চারিদিকের সমগ্র ঝুমুরিয়া। এতবড় বাড়ীর একটী ঘরে জেগে আছে শুধু সে আর এই মানবী। এত কাছাকাছি জেগে আছে!

দিগম্বরীর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরার পর হীরেনের খেয়াল হল সে তার হাত ধরেছে।

'বোসো।'

'না।'

'বসবে না?'

'না। আমি যাই।'

হীরেন তার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বলল, 'আচ্ছা, যান। আমি ভোরে উঠেই চলে যাব।'

দিগম্বরী গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল!

'শশাঙ্কদা গেলেই চাকরী পাবেন।'

দিগম্বরী তার পাশে বসল। দু'হাতের মুঠোয় তার হাত ধরে বলল, 'রাগ করলেন?'

তারপর দিগম্বরীই হাত বাড়িয়ে টেবিলের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

বাইরের ডাকাডাকিতে ভোরে আগে ঘুম ভাঙ্গল দিগম্বরীর। হীরেনকে তুলে দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেল কিনা কে জানে। সকলের আগে হীরেনের চোখে পড়ল টেবিলের উপর মদের বোতলটার দিকে। বোতলটা খোলাও হয়নি। তার মদ খাওয়ার ইতিহাসে এটা ঘটল এই প্রথম। মদ না ছুঁয়েও তার বেশ দিন কাটে, কিন্তু যখন আরম্ভ করে তখন বেহুঁস না হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতা তার হয় না।

বাইরে সমানে ডাকাডাকি চলছিল। হীরেন গিয়ে সদর দরজা খুলেই দেখল, পুলিশ। বুকটা তার ধড়াস্ করে উঠল।

তার জন্তই পুলিশ এসেছে। তবে তাকে ধরে নিয়ে যেতে নয়। কিছু খোঁজখবর নিয়ে, কৃষ্ণেন্দু সম্পর্কে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করে, পুলিশ বিদায় নিল। সার্ট গায়ে ধুতিপরা যে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করল, তার কাছেই জানা গেল যে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনকে কোন নির্দিষ্ট আইনে গ্রেপ্তার করা হয় নি। আদালতে তাদের বিচার হবে না, জেলও হবে না। কোথাও শুধু আটক রাখা হবে, আর কিছু নয়। ব্যাপার খুব সামান্ত।

'কৃষ্ণেন্দু এখানে এসেছে আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

সে শুধু একটু হেসেছিল।

হীরেন একেবারে স্নান করে ফেলল। সমস্ত জগৎ কেমন যেন শান্ত, সহনশীল হয়ে গেছে। গভীর সন্তোষ যেন শুধু মন নয় দেহেরও সম্পদ। নতুন দিনের নতুন রোদ, সুন্দর সোণালী রোদ, পৃথিবীর কোথাও ক্ষোভের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না, জীবনের সীমাহীন প্রান্তর কচি ঘাসে ছেয়ে গেছে। ফাঁকি নেই, নালিশ নেই, সন্দেহ নেই, বিচার নেই— সরল হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।

দিগম্বরী চা করে দিল। নির্ব্বাক, উদভ্রান্ত, চিন্তাময়ী দিগম্বরী—নতুন বৌটির মত লজ্জার ভারে সকাতরা, সুখ-বিহ্বলা দিগম্বরী।

হীরেন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আরে এ কি! ওসব কিছু নয়, বৌঠান।'

শুনে দিগম্বরী একেবারে কেঁদে ফেলে নালিশ জানাল, 'আপনার কাছে কিছু নয়।'

'আহা, আপনি বোঝেন না কিছু। ওসব মানুষের জীবনে ঘটে যায়। আমাদের দুজনেরি এটুকু স্বাধীনতা, একটু অধিকার আছে। আপনি খারাপ ছিলেন না, খারাপ হয়েও যান নি।'

'আমার যে স্বামী আছে ঠাকুরপো?'

'আমারও তো স্ত্রী আছে।'

'আপনার কথা আলাদা। আপনি পুরুষ মানুষ।'

'আপনিও পুরুষ না হন—মানুষ।'

দিগম্বরীও এক কাপ চা খেল। চোখের জল শুকিয়ে গেল চোখেই। উদভ্রান্ত ভাব কেটে গিয়ে এল থম থমে ভাব। কোনরকম অন্যমনস্কতা তার দেখা গেল না। কিন্তু মনে হল একটা কথাই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে ভাবছে।

'আজকেই চলে যাবেন তো?'

'তাই ভাবছি। থেকে আর কি করব!'

দিগম্বরীর চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

'না থেকে আর কি করবেন!'

হীরেন সিগারেট ধরাচ্ছিল, প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত হলে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে নীচুগলায় আপনজনকে মনের কথা শোনানোর মত সরলতার সঙ্গে বলল, 'কি জানেন, বৌটার জন্য বড্ড মন কেমন করছে। মনটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল, অনেকদিন বৌটার সঙ্গে ভাল

ব্যবহার করি নি। সেজন্যও আরও তাড়াতাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনার বৌ খুব সুন্দরী, না ঠাকুরপো?'

'সে তো দেখতেই পাবেন।'

দিগম্বরী রান্না করতে গেল। সকালের গাড়ী আর ধরা যাবে না, একটার গাড়ী ধরতে হলে খেয়ে দেয়ে এগারটার মধ্যে হীরেণের রওনা হওয়া দরকার। গরুর গাড়ী ঠকর ঠকর করে চলবে। একটার গাড়ীতে গেলেও আজ রাত্রে মমতার সঙ্গে দেখা হবে, তার বাড়ী অথবা বাপের বাড়ী যেখানেই সে থাক। দিনে দেখা হওয়ার চেয়ে একান্তে সমস্ত রাত্রির জন্য দেখা হওয়াই ভাল। তবু দীর্ঘ দিনটা কাটাবার চিন্তায় হীরেন একটু অসহিষ্ণুতা বোধ করে। তার শান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শুধু এই একটি অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

যাবার আগে রম্ভার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। রম্ভার মনে নিশ্চয় খুব আঘাত লেগেছে। বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল। সে ব্যবস্থা তো ভেস্তে গেলই, বেচারার ভাইটিকে পর্য্যন্ত পুলিশে ধরে নিয়ে গেল।

জামা গায়ে দিয়ে হীরেন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, দিগম্বরী এসে বলল, 'ঠাকুরপো, ওঁকে তো একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয় আজকেই ফিরে আসবার জন্যে?'

'তা হয় বৈকি।'

দিগম্বরী সাগ্রহে বলল, 'তবে একটা টেলিগ্রাম লিখে পাঠিয়ে দিন ঠাকুরপো। ওঁর স্বভাব কি জানেন, বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারেন না, নেশাটেশা আরম্ভ করে দেন। বড্ড ভাবনা হচ্ছে আমার।'

'ঠিকানা জানেন তো? ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন, যাবার সময় ষ্টেসনে টেলিগ্রাম করে দেব।'

দিগম্বরী মাথা নেড়ে বলল, 'সে বড় দেরী হয়ে যাবে। হয় তো আজকে ফেরবার গাড়ী পাবেন না। এখুনি পাঠিয়ে দিন। ও বাড়ীর শম্ভুর সাইকেল আছে, ক'গণ্ডা পয়সা দিলেই যাবে।'

সদরে দিগম্বরীর এক পিসীর বাড়ীতে শশাঙ্ক উঠেছে। শশাঙ্ককে আজকেই ফিরে আসবার জন্য দিগম্বরীর জোরালো তাগিদ জানানোর বার্ত্তা ও ঠিকানা প্রভৃতি একটা কাগজে লিখে হীরেন বলল, 'আমি তো শম্ভুর বাড়ী চিনি না।'

'কাছেই বাড়ী। সদর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন।'

'শম্ভু ইংরেজী জানে তো বৌঠান? ফর্ম্মে সব ঠিকমত লিখতে পারবে তো?'

'দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, ইংরেজী জানেনা! ওনার মত, আপনার মত অবিশ্যি জানে না, তবে মন্দ জানে না।'

শম্ভুকে দেখেই হীরেনের মনটা খুসী খুসী হয়ে উঠল। বছর কুড়ি বয়সের সুশ্রী সবল তরুণ, সুগঠিত সুন্দর দেহ। সোজা মুখের দিকে তাকায়, নির্লজ্জের মত কথা বলে, কাচুমাচু করে না।

'আপনার টেলিগ্রাম হলে একটাকা লাগবে, দিগুদি'র হলে ছ'আনা।'

'আমি কি অপরাধ করলাম?'

'আপনি বড়লোক। আপনাকে কনসেশন দেব কেন?'

'বেশ, আমি তা'হলে দু'টাকা দিচ্ছি।'

শম্ভু মাথা নেড়ে বলল, 'এক টাকা। কাজ করে পয়সা নেব, ভিক্ষে তো নিচ্ছিনা আপনার কাছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এক টাকা নিও। অত মেজাজ করো না ভাই। ভাল মানুষ কথনো মিছিমিছি মেজাজ গরম করে না।'

শম্ভু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল।—'মেজাজ করিনি। আপনার

কাছে সবাই মিন মিন করে কথা কয়, কেউ সোজা স্পষ্ট কথা বললে আপনার মনে হয় মেজাজ দেখাচ্ছে।'

'বিনয় মান না? ভদ্রতা?'

'বিনয় মানে তো নেকামি? একেবারে নেতিয়ে পড়া? ওসব বিনয় আর ভদ্রতার ধার ধারি না মশায়। বেশী বিনয় করতে গিয়েই তো আমরা গেলাম, কেবল সেলাম ঠুকতে ইচ্ছে হয়।'

হীরেন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শম্ভুর সাথে আলাপ করল। শম্ভুর বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। মা মাসী ভাই বোন ভাগ্‌নে ভাগ্নিরা আছে। আর আছে কিছু জমি। শম্ভু জমি চাষ করায় আর তার সাইকেল চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করে, তারপর একদিন সদরে গিয়ে সব কিনে আনে।

হীরেন মনে মনে ভেবে রাখল, কিছুদিন পরে একবার এই ছেলেটির খবর নিতে হবে।

তারপর খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে আর খানিকটা কর্ত্তব্যবোধে হীরেন দেখা দিতে গেল রম্ভাকে। একটু সহানুভূতি জানাবে। টাকা পয়সার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবে।

নিজের ভাবেই সে মসগুল। জীবনটা ভাল লাগছে। এক রাত্রে ফুৎকারে উড়ে গিয়েছে সব ক্ষোভ। মন পাক খাচ্ছে বিরহিণী মমতাকে কেন্দ্র করে। মমতা অবাক হবে, চমকে যাবে, খুসীতে নেতিয়ে পড়বে তার বুকে, হাসি মুখে আর ছল ছল চোখে। আনমনে সে পথ চলে। গাঁয়ের চাপা উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, একক মানুষের মুখে, ঘরের দাওয়ায়, ফকিরের মুদি দোকানের সামনে, রামঘোষের বাড়ীর দক্ষিণে বটগাছ তলায় দু'চার দশজনের জমায়েৎ হয়ে আলাপ করার ভঙ্গিতে, কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু সে তার দিকে চাউনির রকমে—এসব কিছুই তার চোখে পড়ে না।

বাইরে ছিল জীবনলাল। রম্ভাকে ডেকে দিতে বলায় সে ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনিই বরং ভেতরে আসুন বাবু। ওর মেজাজটা ভাল নেই। মোরা কথা কইতে গেলে কামড়ে দিতে আসে।'

রম্ভাকে দেখাল থমথমে। দাওয়ায় উঠবার সিঁড়িতে পা রেখে সে বসেছিল, হীরেনকে দেখে নড়ল না, কথাও বলল না। মুখ বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে কোণাচে চোখে চেয়ে রইল একটি কলাগাছের আধলুকানো মোচাটির দিকে। দাওয়ার কোণে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে নরেশ নতুন একটি খড় চিবোচ্ছিল। এখানে এসে নতুন খড়ের বিচিত্র স্বাদে তার মন ভুলেছে। যখন তখন খড় মুখে পুরে চিবোতে থাকে।

'আমি তো আজ যাচ্ছি রম্ভা।'

রম্ভা সাড়া দিল না।

'ভারি দুঃখের ব্যাপার হল রম্ভা। এমন হবে কে ভাবতে পেরেছিল বল। পুলিশ এমন আচমকা ওদের ধরে নিয়ে যাবে—'

রম্ভা একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হীরেন দরদ বোধ করল অসীম। রম্ভার দুঃখের সত্যই তুলনা নেই। ও যে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়বে তা আর আশ্চর্য্য কি। সান্ত্বনা দেবারও কিইবা আছে ওকে!

'মন খারাপ কোরো না রম্ভা। সব অবস্থাতে শক্ত থাকবে এই তো চাই আমরা তোমার কাছে। আমার যা করার আছে তা আমি করব। কেষ্ট আর তোমার ভায়ের জন্য যত টাকা লাগে খরচ করব। তুমি বরং কিছু টাকা রেখে দাও—দরকার হতে পারে।'

এবার রম্ভা ফেটে গেল।

'আপনার টাকায় আমি মুতে দি। লজ্জা করে না? বেহায়া, বজ্জাত কোথাকার। মাতাল, বিশ্বাসঘাতক!'

হীরেনের দুটি কাণ দুটি ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝন ঝন করে বাজে।

মানসিক ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে তার আত্মতৃপ্তির বিরাট মহল। মাতাল! বিশ্বাসঘাতক! রামপাল রম্ভার স্বামী। কাল সে রামপালকে সঙ্গী করে মদ খেতে গিয়েছিল হেরম্বের বাড়ী। সে মাতাল, সে বিশ্বাসঘাতক!

কি বিশ্বাসঘাতক রামপাল! একসঙ্গে তারা মদ খেয়েছে তবু রামপাল প্রকাশ করে দিয়েছে তার গত রাত্রির উন্মত্ততার কথা। কিম্বা অন্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে? হেরম্বের চাকর হয়তো গল্প করেছে। গাঁয়ের কেউ হয়তো দেখেছে। গাঁয়ের সবাই হয়তো জানে তার অপকীর্ত্তির কথা—হেরম্বের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর বন্ধুর দহরম মহরমের কাহিনী হয়তো ছড়িয়ে গিয়েছে দিগদিগন্তে!

'চুপি চুপি ছুরি মারলেই হত কেষ্টবাবুর পিঠে? বজ্রাঘাত হয় না আপনার মত লোকের মাথায়? সাপে কামড়ায় না আপনাদের? কুষ্ঠ হয় না?'

হীরেন প্রায় কাতর ভাবেই প্রতিবাদ জানায়, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ রম্ভা। আমি মাতাল হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক নই।'

রম্ভা ব্যঙ্গ করে বলে, 'নন্? শত্তুরের সঙ্গে চুপি চুপি ভাব করে বন্ধুকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া কেন বিশ্বাসঘাতকতা হবে! ও খুব ভাল কাজ।'

হীরেনের মনে কথা জাগে: 'আমার জন্য কেষ্টর এতটুকু ক্ষতি হয় নি রম্ভা। আমি শুধু হেরম্বের সঙ্গে মদ খেয়েছি' কিন্তু মুখে তার শব্দগুলি উচ্চারিত হয় না। মনের মধ্যেই সে যেন রম্ভার ঝাঁঝাঁলো জবাব শুনতে পায়: 'তা বৈকি। বন্ধুর শত্তুরের সঙ্গে, খুনের সঙ্গে বসেই তো লোকে মদ খায়! বন্ধু যাকে শাস্তি দেবে পরদিন, তার সঙ্গে রাত্তির বেলা চুপি চুপি আড্ডা দিতে যায়।'

হীরেন ধীরে ধীরে চলে যায়, রম্ভা তাকে শুনিয়ে বলে, 'যান্ যান্।

কোথায় পালাবেন ? সবাইকে বলব আপনার কীর্ত্তির কথা। কলকাতা গিয়ে চাদ্দিকে রটাব, সবাইকে চিনিয়ে দেব আপনি কেমন ধারা লোক, যে যেখানে আছে।'

কত কল্পনা নিয়ে আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল হীরেনের। কি তেজ সঞ্চার হয়েছিল তার রক্তে, কি উৎসাহ জেগেছিল মনে, সব বাধা সরিয়ে কিভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল নিজের মধ্যে। ফিরে পেয়েছিল বিশ্বাস, পথ খুঁজে পেয়েছিল অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিতে। সব এখন ভেস্তে গেছে, ফেঁসে গেছে, চুপ্‌সে গেছে, উপে গেছে।

মমতা শুনবে তার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা। আরো বেশী তাকে ঘৃণা করবে মমতা।

না শুনলেই বা কি। তার মত অপদার্থ, অসংযত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষকে এমনিই ঘৃণা করবে মমতা। ঘৃণা সে করছে—চিরদিন করবে। ঘৃণাটা মনের জোরে চেপে রেখেছে এখন, তার এই কাণ্ডের কথা শুনলে সেটা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে, জন্মের মত তাকে সে ছেড়ে যাবে।

হীরেন বুঝতে পারে যে এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে মমতা কত উঁচুতে আর সে কত নীচুতে, মমতার কাছে সে কত হীন, কি স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য তাদের মধ্যে। অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কি তার পাওয়া সম্ভব মমতার কাছে ?

হীরেন দুঃখ পায়, তার অনুতাপ হয়। হতাশায় বিষাদে ঝিমিয়ে পড়ে। রাগে অভিমানে ফুঁসে ওঠে। হিংসায় জ্বলে যায়। তাই যদি হয়, এমন যদি সে অমানুষ, দেবতা কৃষ্ণেন্দু কেন এল তার জীবনে, কেন বন্ধু করল তাকে ? কেন দেবী মমতা তাকে বরণ করল স্বামীর পদে ? কি দরকার ছিল ওদের তাকে এভাবে কষ্ট দেবার, তার জীবনটা নষ্ট

করবার ? খারাপ লোক সে, খারাপ হয়েই থাকত। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশে, খারাপ কাজ করে, মনের ফূর্ত্তিতে জীবন কাটিয়ে দিত হেসে খেলে।

সবাই ষড়যন্ত্র করেছে তাকে অসুখী করতে। বিশ্বসংসার তার বিরুদ্ধে। সে একা, তার কেউ নেই। হায়, কেন সে বেঁচে আছে!

বাড়ীর কাছাকাছি সাঁ সাঁ করে সাইকেল এসে তার নাগাল ধরে ব্রেক কষে থেমে যায়। শম্ভু টেলিগ্রামের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'আজ যেতে পারলাম না হীরেন বাবু, মাপ করবেন। জরুরী কাজ পড়েছে।'

দিগম্বরীর টেলিগ্রামের সঙ্গে হীরেন নিজেও একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চেয়েছিল মমতার নামে, সে যাচ্ছে এই খবর দিয়ে। কাগজ দুটি সে ছিঁড়ে ফেলে।

শম্ভু বলে, 'আপনি তো বুঝতেই পারছেন। চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমি জানতাম না, এইমাত্র খবর পেলাম। অরাজকতা সত্যি আর সয় না হীরেন বাবু। বিনা পথ্যে, অযত্নে, অচিকিৎসায় সূর্য্যদা মারা গেল। মহীউদ্দীনের বাবা মরল জেলে। মোহনের বাবা খুন হল। তারপর কাল রাতে কেষ্টবাবু আর মোহনকে অ্যারেষ্ট করা হল। ওরা কি খেলা পেয়েছে ? আমরা আর সইব না। আমি মোহনের দলের মেম্বার। মহীউদ্দিন আমাদের সেক্রেটারী। ও আমায় গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে বারণ করেছে।'

শম্ভু দম নিয়ে যোগ দেয়, 'আপনিও থেকে যান না হীরেন বাবু? এ সময় চলে যাবেন ?'

'দেখি ভেবে।'

ভেবে দেখবার কিছু ছিল না। কৃষ্ণেন্দু আর মোহনের গ্রেপ্তারে গ্রামে যদি উত্তেজনার সঞ্চার হয়ে থাকে, প্রতিহিংসা নিতে রম্ভা তার

বিশ্বাসঘাতকতার গল্প প্রচার করার আগেই তার চলে যাওয়া ভাল গ্রাম ছেড়ে। মিথ্যা হলেও রম্ভার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

গরুর গাড়ীর কিচ ক্যাঁচ শব্দ করে ছি ছ্যা, ট্রেণের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয় পালান, পালান! ইউরোপীয় স্বামী স্ত্রী দুটি শ্লথ সংক্ষিপ্ত ভাষায় গল্প করছে, ঠিক কোন দেশের লোক তারা অনুমান করা যায় না। পাঁচ ছ'বছরের ছেলেটি জানালায় কনুই পেতে দু'হাতের তালুতে মুখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের চলমান জগতের দিকে। বেশ একটু ঝুঁকেই আছে। ভয় করে না ওর বাপমার? হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

সরে গিয়ে কাছে বসাটা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। তারপর ছেলেটাকে আরেকটু উঁচু করে চোখের পলকে বাইরে ঠেলে দেওয়া, চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে চেন টেনে গাড়ী থামানো। কত সহজ, কত সংক্ষিপ্ত! স্বামী প্রায় চোখ বুজে কথা বলছে, মুখে পাইপ ঝুলছে শিথিল ভাবে, স্ত্রী তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে। কত নিরাপদ, কত স্বাভাবিক ছেলেটাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া!

কিন্তু অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।

মনে দাঁড়িপাল্লা খাড়া করে হীরেন ছেলেটিকে এক পাল্লায় আর হেরম্বকে অন্য পাল্লায় চাপায়। কোন দিকে পাল্লা নামে না—নির্ম্মল নিষ্পাপ একটি কচি ছেলে আর অত্যাচারী খুনে হেরম্বের সমান ওজনের টানে দাঁড়িপাল্লা থর থর করে কাঁপে; নিরপেক্ষ মৃত্যুকে জীবনের হিংসা ও প্রেমের আপেক্ষিক বাজী খেলায় হীরেন যোগ দেওয়াতে পারে না।

খড়্গপুরে নেমে মেল ধরেছে। চেন টেনে ট্রেণ থামিয়ে হীরেন ডাইনিং কারে যায়। জরিমানা দিয়ে মদ খাবে। হেরম্বের দেওয়া বোতল দিগম্বরীর বাড়ীতেই রয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। নইলে

কি এই অ্যাডভেঞ্চার তার জুটত—মদ খাবার জন্য গাড়ী থামিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা।

হাওড়ায় নেমে হোটেলে যায়। আরও মদ খেয়ে চেনা মেয়েটার ঘরে যাবে। রাত নটায় তার খেয়াল বদলে যায়। মমতার জন্য মায়া জাগে। মমতার ঝাপসা মুখ বুক কাঁধ পিঠ কোমর নিতম্ব উরু বড় কাম্য, বড় কমনীয় মনে হয়। নিজের বোকামির কথা ভেবে তার হাসি পায়। কি ছেলেমানুষীই সে করেছে সারাদিন—সংসার-অনভিজ্ঞ ভাবপ্রবণ কিশোর প্রেম-পাগলার মত। পুরুষ হয়ে একটা মেয়েমানুষকে, নিজের বিয়ে করা বৌকে, বশ করার কৌশল যদি না জানে তবে সে কিসের পুরুষ! অন্যের কাছে মমতার শুনবার অপেক্ষায় তার থাকবার দরকার? নিজেই সে মমতার কাছে সব খুলে বলবে। বলবে, মমু, তোমার জন্য আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মমু। তোমার জন্য আমি মদ ধরেছি, তোমার জন্য দিগম্বরীর মত স্ত্রীলোককে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি ডুবে যাচ্ছি মমু, আমায় বাঁচাও।

শুনে মমতা নিশ্চয় গলে যাবে।

আরিফ মোটে ক'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাবার আগে তার সারা গায়ে অনেকগুলি ছোট বড় ফোঁড়া উঠেছিল। কতগুলি বসে গিয়েছে, কতগুলি পেকে ফেটে গিয়েছে, দু'একটা যা আছে সেগুলি বসে যাবে না পাকবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফোঁড়ার জন্য নিজেকে আরিফের সব সময় কেমন নোংরা মনে হয়, দিনে সে তিন চার বার স্নান করে। মাঝখানে একটু জ্বর হয়েছিল, তখনও বাদ দেয়নি।

সকালে সবে সে স্নান করে উঠেছে, মমতা এল। কয়েকটি ফোঁড়ার ঘা তখনো ভাল করে শুকোয় নি। মমতাই গরম জলে ধুয়ে ঘায়ে আর ফোঁড়ায় মলম লাগিয়ে দিল।

'আমি মুসলমান হতে পারি না আরিফ ?'

'না। মুসলমানী হতে পার।'

'কত শীগগির হতে পারি ?'

'যত শীগগির তোমার খুসী।'

'তাহলে চট্‌পট্‌ আমাকে মুসলমান করে নাও। তারপর চলো আমরা একবার ঝুমুরিয়া যাই।'

জেলে আরিফ গোঁপ রেখেছিল সখ করে। গোঁপের জন্য তার মুখের চেহারা আশ্চর্য্যরকম বদলে গেছে। যাবার সময় আঙ্গুল বুলিয়ে তার গোঁপটা পরীক্ষা করে মমতা বলে, 'কাল গোঁপটা কামিয়ে ফেলো।'

কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলালের গ্রেপ্তারের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল। সকলের মধ্যেই কম বেশী তীব্র প্রতিবাদ গুমরে উঠল, একি অন্যায়! একি অবৈধ, বেআইনী আচরণ পুলিশের, হেরম্বের। দেশভক্ত ত্যাগী একজন নেতা এলেন তাদের গাঁয়ে তাদের ভালর জন্য, বিনা কারণে চুপি চুপি তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া তাদের মধ্য থেকে। কোন হাঙ্গামা হয় নি; কোন বেআইনী ব্যাপার ঘটে নি, একটা সভা পর্য্যন্ত করা হয় নি। কেন তবে গ্রেপ্তার হবে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলাল, আটক থাকবে বিনা বিচারে ? কেন চলবে হেরম্বের এ কারসাজি ? সরকার কি হেরম্বের হাতের পুতুল ? কৃষ্ণেন্দু আগে একবার এসে লড়াই করে গিয়েছিল চাষীদের জন্য। মোহনলাল চাষীদের মধ্যে কাজ করছিল। দু'জনে ধরা পড়ায় চাষীদের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা দেখা দিল। জালালুদ্দীন মারা গিয়েছিল নিমুনিয়ায়। কিন্তু জেলে মারা যাওয়ায় সকলের মনে সে শহীদের স্থান পেয়েছে। এ মনোভাব সকলের মনে আরও স্পষ্ট হয়েছে বীরেশ্বরের কারামুক্তির দিন সূর্য্যের নেতৃত্বে জালালুদ্দীনের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে যে শোভাযাত্রা

ও সভা হয়েছিল তার ফলে। সূর্য্যও আজ বেঁচে নেই। শোভাযাত্রার সামনে ছিল জালালুদ্দীনের ভাই মহীউদ্দীন। মোহনলালের দল তাকে নেতা করে কোমর বেঁধে লেগে গেছে সকলের অসন্তোষকে আরও গভীর, আরও তীব্র করে তুলবার কাজে।

বীরেশ্বরের অপমৃত্যুতেও চারিদিকে এমন সাড়া জাগে নি। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু এমন উত্তেজনা দেখা দেয় নি। ও যেন খানিকটা ছিল হেরম্ব ও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত কলহের ব্যাপার। হেরম্ব অত্যাচার করছিল সত্য, বীরেশ্বর একা নিজের জন্য লড়তে যায় নি তাও সত্য, কিন্তু তবু হাঙ্গামাটা হয়েছিল বীরেশ্বরের জন্যই। হেরম্বের মত অত্যাচারীকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য্য উৎপাতের মত মেনে নেবার সংস্কার আজও লোকের কেটে যায় নি। জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে আজও তো লড়াই একরকম হয়নি দেশের লোকের, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও যোগান নি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেই-ই, বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস। তারপর ছিল এই যুক্তি যে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম সেদিন সত্যই হয়েছিল এবং বীরেশ্বরের মৃত্যু ছিল রহস্যজনক, ঠিক কে তাকে মেরেছিল নিঃসন্দেহে জানা যায় নি। বীরেশ্বরের মৃত্যু নিয়ে তাই হৈ চৈ হয়েছিল কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। নেপথ্যে ছিল।

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু নেতা। মোহনলাল প্রিয় এবং একটি জনপ্রিয় দলের নেতা।

অনাথের দলের কয়েকজন ছেলে মোহনলালের দলে এসে যোগ দিয়েছে। হেরম্বের কাছে খেলার মাঠের জন্য টাকা নেওয়া আর

ভবিষ্যতে এটা ওটার জন্য আরও টাকা পাবার ভরসা পাওয়া তারা পছন্দ করে নি। টাকা নেওয়ার ব্যাপারেও অনাথ ও সহদেব কেমন যেন রহস্যময়, হিসাবের ব্যাপারে শিথিল। কৃষ্ণেন্দুর আগমনে এরা ক'জন ছাড়াও দলের আরও অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, যোগ দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। নেহাৎ দলপতিদের খাতিরে পেরে ওঠেনি। কৃষ্ণেন্দুর গ্রেপ্তারের খবর পেয়েই এরা ক'জন মহীউদ্দীনের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তারা এদলে আসতে চায়। তারপর একে দু'য়ে আরও কয়েকজন আসতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে ক্রমে খবর ছড়ায়, বেলা বাড়ার সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ে। প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবে, ছোট ছোট জমায়েতে।

দু'জনের গাড়ী পাশ কাটাবার সময় কার্ত্তিক বলে পাঁচুকে, 'খবর জানিস পাঁচু?'

'হাঁ। শুনলাম খবর। কাজে যেতে মানা করেছে।'

'কে মানা করেছে?'

'কানাই বাবু। সিদে কথা বলে দিয়েছে, রাস্তায় খাটতে যাসনি পাঁচু, খবর্দ্দার।'

'বটে? তবে তো কাণ্ড হবে আজ!'

গাড়ী থামিয়ে দু'জনে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করে। কল্কেয় তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়া তাল পাকিয়ে আগুণ করে তামাক খায়। ভদ্রলোক যেতে দেখলে সবিনয়ে সাগ্রহে জানতে চায় ঘটনা কি আর স্বদেশী বাবুরা কি করবে আজ, জানা কথা আরেকবার মন দিয়ে শোনে, ঠিক কি ঘটবে জানতে না পারায় কল্পনা করে বীরেশ্বর যেমন সুরু করেছিল তেমনি একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা, নয়তো ক'বছর আগে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে দেবার মত কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা!

জগৎ দাসের ছেলে শিশু, বীরেশ্বরের হাঙ্গামার দিন সর্দ্দি জ্বরের জন্য বাড়ী থেকে বার না হলেও যে ধরা পড়ে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল, হঠাৎ সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে জগৎ ডেকে বলে, 'কোথা যাস্ ? এই শিশু ! কোথা যাস্ তুই ?'

'দেখে আসি কি ব্যাপার।'

'না, তোর যেতে হবে না। ওসব ব্যাপারে তোর গিয়ে কাজ নেই। বাড়ীতে বসে থাক। ছাপ মারা হয়ে আছিস, খেয়াল নেই ? কিছু হলে পুলিশ সবার আগে তোকে ধরবে।'

'সে তো বাড়ী বসে থাকলেও ধরবে।'

শিশু উধাও হয়ে যয়ে। বাপের প্রাণের শঙ্কা নিয়ে জগৎ যতক্ষণ দেখা যায় তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামনে দাঁড়ানো কারো প্রস্তাবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে, যাকগে। এমনিও যা, ওমনিও তাই। যাকগে। সেই থেকে ক্ষেপে আছে ছেলেটা এই যা ভাবনা। যাকগে।

খানিক ভেবে আবার বলে, আমিও যাই তবে। দেখে আসি। ধরে তো আমায়ও নয় ধরবে।

সুদেবের দাওয়ায় বলাইচরণ, রামপদ, নিখিল, অবিনাশেরা প্রতিদিন জড়ো হয় ভোরে, সূর্য্য কয়েক হাত উপরে উঠে ভালো করে আলো হলেই তাদের আড্ডা ভাঙ্গে, যে যার বাড়ী যায় দোকানে সওদা কেনার দরকার থাকলে কিনে নিয়ে। রামপদ, নিখিল আর অবিনাশ মধ্য ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার, অঙ্ক ইংরাজী আর বাংলার। উপার্জ্জন তাদের যথাক্রমে তেইশ, সাড়ে চব্বিশ আর উনিশ। তিনজনকেই অবশ্য কাগজে কলমে লিখতে হয় বেশী, স্কুলের গ্রাণ্ট

বজায় রাখার জন্য। ভদ্রতা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে প্রাণ তিন-জনের বেরিয়ে গেছে। আজ তাদের আড্ডা ভাঙ্গতে অনেক দেরী হয়। রামধনের চালা ডিঙ্গিয়ে দাওয়ায় রোদ এসে পড়ার অনেক পরেও তারা ওঠে না। আবদুলের বাইশ বছরের ছেলে রহমান খবর ছড়ানোর কাজে বেরিয়ে আবেদন জানিয়ে গেছে, স্কুলটা বন্ধ রাখার চেষ্টা যেন মাষ্টার মশায়রা করেন। স্কুলে যেন তাঁরা না যান আর বটতলার সভায় উপস্থিত থাকেন। স্কুল বন্ধ রাখার, এমন কি স্কুলে না যাবার ক্ষমতা রামপদ, নিখিল আর অবিনাশের নেই, হেরম্বের শ্বশুরের সে স্কুল। কিন্তু মনে মনে তাঁরা টের পান, তাঁদের কিছুই করতে হবে না, স্কুল আপনা থেকেই বন্ধ থাকবে। সে দিনকাল তো আর নেই। স্কুলের আট বছরের ছেলে পর্য্যন্ত আজ দল বেঁধে স্কুল বন্ধ করার কায়দা জানে।

'যাক বাবা, আজ তাহলে ছুটি।' রামপদ বলেন।

'তারকবাবু না খালি স্কুলে আটকে রাখেন চারটে পর্য্যন্ত।' বলেন অবিনাশ।

'তারকবাবু স্কুলে ঢুকতে পারেন কি ছাখো আগে।' নিখিল বলেন।

সুদেব কম্পাউণ্ডার ডাক্তার, হাতযশ মন্দ নয়। কোন গোলমালে সে কখনো যায় না, কিন্তু নিজের ঘরে আর রোগীর বাড়ীতে সে খানিকটা স্বাধীনচেতা আর স্পষ্টবাদী। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে খাতির করে কথা কয় না।

'তোমরা দেখছি ছুটি পেয়েই খুসী। ছুটিটাই তোমাদের বড় হল, অ্যাঁ?'

'নিশ্চয়! হেরম্ব ব্যাটা অপঘাতে মরলে ওর অনারে কবে ছুটি পাব দিন গুণছি।'

'তোমরাই তো সায় দিয়েছিলে স্কুলে ধর্ম্মঘট করার জন্যে ভূদেবকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে।'

'সায় দিই নি। চুপ করে ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, ওরে শালা তারকবাবু, কবে তোর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাব।'

'সভা করবে বলেছে। সভা করে কি হবে?' স্কুলের কেরাণী বলাইচরণ বলে, তার শীর্ণ মুখখানি হতাশায় বাঁকা করে।

'সভাতেই কাজ হয়। সবাই একত্র হয়। আজ কি ভাবছ সেরকম সভা হবে, শুধু দুটো বক্তৃতা আর হাততালি? তৈরী হয়ে আসবে সবাই। ছোঁড়াগুলো কেমন পাগলের মত ছুটাছুটি করছে দেখছ না? সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, তৈরী করছে।'

'তৈরী সবাই হয়েই আছে।'

এদের বুদ্ধিমানের মত প্রাণহীন কথায় আজ প্রাণের স্বাদ এসেছে। চোখের চাউনি একটু উজ্জ্বল, চোখের পাতা একটু চঞ্চল। থেমে থাকার বদলে বুকটা আজ টিক্ টিক্ করছে। সুদেবের রোগী আসে, নতুন খবর দেয়, ওষুধ নিয়ে চলে যায়। গাঁয়ের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপ যেন এই শীতল আসরকে আরেকটু গরম করে দেয়। বুড়ো শ্রীধর প্রায় সিধে হয়ে আশ্চর্য্যরকম দ্রুতপদে চলছিল পা টেনে টেনে, কাছে এসে শ্বাস টেনে টেনে বলে, 'বীরেশ্বরের মেয়েটা বেরিয়েছে। এলো চুল, চোখ রাঙা, আঁচল উড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। একেবারে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। পেটটা যেন উঁচু ঠেকল!'

স্কুলে হাজির হতে হলে এবার ওঠা চাই। নেয়ে খেয়ে যাবার দরকার হবে না, জামাটা গায়ে দিয়ে যাবার পথে বীরেশ্বরের মেয়েটাকে একবার দেখে যাওয়া চলবে। স্কুল যে আজ বসছে না তাতে আর কারো সন্দেহ নেই।

ঘনশ্যামের চাল ডাল তেল নুনের দোকানের সামনে জড়ো হয় চাষী মেয়ে পুরুষ। সওদা কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করে।

লোমশ বুকে হাত বুলাতে বুলাতে মদন বলে, 'মতলব আছে, আরও মতলব আছে। নয়তো কি এমনি ধরিয়ে দিল ওনাদের? শত্তুর সরাবে সব কটাকে এক এক করে, তদ্দিনে রাস্তা শেষ, তারপর মেয়ে চালান দেবে। রাধা আর বিন্তিকে বেচে লাভ করেছে হাজার হাজার টাকা। করে নি? তবে কি! হঁাঃ।'

মাতু বলে, 'ভরত না বিয়ে করেছে রাধাকে?'

রাধার মায়ের দূর সম্পর্কের কুটুম হীরু ঘোষ ঝাঁঝাঁলো হাসি হেসে বলে, 'মাসীর যেমন মাথা খারাপ। চাকরের সাথে বিয়ে দিতে ও ব্যাটা মেয়ে চুরি করে, না? সব ফাঁকি, চালবাজী—কেউ না নালিশ করতে পারে। মেয়ে চুরির মামলা কর, ভরত বলবে আমার বিয়ে করা বৌ, দশটা লোক সাক্ষী দেবে, হাঁ বিয়ে হয়েছে ঠিক, মন্তর পড়া বিয়ে! নইলে দিতাম না নালিশ ঠুকে রাধার মা যখন কেঁদে এসে পড়লো? দেখে নিতাম না কত বড় বামুনের ছেলে?'

'বামুনের ছেলে এমন হয়, মাগো!'

'হয় না? রাবণ কি ছিল? কুম্ভকর্ণ?'

'আর সয় না বলছি মাইতি মামা, মাইরি। রেত বিরেতে একলাটি পেলে দিতাম মাথায় লাঠি বসিয়ে, যা থাকে অদেষ্টে।'

নাটু গোঁসাই বিজ্ঞের মত বলে, 'আরো নাঃ, মেয়ে চুরি নয়। মেয়ে তো ফের দেখতে ভাল হওয়া চাই, হেথা হোথা দু'চারটে পেল তো নিল, নয় তো নয়। রাস্তা করবে আরেকটা—গাঁয়ের বুক দিয়ে। এ রাস্তা থেকে বার করে সিধে টেনে নিয়ে যাবে সা'পুরের রাস্তায়। সড়ক ছোঁবে না, ফসল জমি বসত বাড়ীর ওপর দিয়ে রাস্তা চালাবে। জলের দামে কিনবে সব, দলিল তৈরী হচ্ছে খপর জানি।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। শঙ্কায় ছোট হয়ে যায় চোখ। এতো অসম্ভব নয়, এই রাস্তা তৈরীর মধ্যেই তার অনেক প্রমাণ মিলেছে।

ইয়াকুব বলে, 'শুধু রাস্তার পেটে জমি ঘরদোর যাবে। দু'পাশের ক্ষেত থেকে, ঘরের উঠোন থেকে মাটি তুলবে। মোর ক্ষেতের কি করেছে ছাখোনি? মাটি তুলবি এক যাগা থেকে তোল, তা না, হেথায় হোথায় খাবলে তুলেছে। জমির দিকে চাইলে চোখে জল আসে।' বলতে বলতে ইয়াকুব কেঁদে ফেলে হু হু করে।

নাটু গোঁসাই আবার বলে, 'আর ট্যাক্‌সো তো আছে। তিনগুণ ট্যাক্‌সো করবে। পুলিশ তাই এখন খাতির করছে ওকে। এ সুযোগ কি ও ছাড়ে—এই সুযোগে সব বাগিয়ে নেবে।'

এই আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে দুটি ছেলে, বলে, 'দোকান বন্ধ কর ঘনশ্যাম। আজ হরতাল। বটতলার মাঠে সভা হবে ওবেলা, সবাই যাবে। বাঁচতে যদি চাও, দল বেঁধে সভায় হাজির থেকো। বাঁচতে যদি চাও, উঠে পড়ে লাগো এবার, নইলে সবাই মরবে। তোমাদের বাঁচাতে যারা লড়ছিল, তারা নেই, এবার তোমাদের লড়তে হবে···'

আবদুল হাই বলে, 'না কাদের, হিঁদু মোছলমানের বাত এতে উঠবে না। ঢের মোছলমান মার খেয়েছে। জালালুদ্দীন মিঞার ব্যাপারে মোরা চুপচাপ রইলাম, তাতে একটু বিগড়ে আছে সবাই। এবার জবরদস্তি চলবে না, বারণ ভি করা হবে না। যার খুসী যাক।'

হাফিজ আলি সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত। হাঙ্গামা হবে তো উপায় কি!'

আবদুল হাই-এর স্নিগ্ধ মোলায়েম মুখের দিকে চেয়ে কাদেরের বুক একটু কেঁপে যায়। জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দেয় নি সত্য, বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে দিয়েছিল। কিন্তু লোকের মনে যেভাবে এক সাথে

মিলে গিয়েছে বীরেশ্বর আর জালালুদ্দীনের নাম, ও পার্থক্যটা কি খেয়াল থাকবে কারো? ধনা ও মনার সঙ্গে কেউ তার তফাৎ করবে না, তার স্বধর্ম্মীরাও নয়। গাঁয়ের মোছলমানরা যদি তার বিপক্ষে যায়, আবদুল হাই কি আর তার পক্ষ নেবে! কাদের বাড়ী যায়। বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয় সদরের উদ্দেশে।

শম্ভু এসে রম্ভাকে বলে, 'এমন করে বসে কেন তুমি? কাজের সময় মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতে বুঝি শিখিয়েছিল সূর্য্যদা?'

'আমি কি করব শম্ভু?'

'তুমি কি করবে! কোমর বেঁধে গাঁয়ে এলে বিহিত করতে, এখন কাজের সময় বলছ তুমি কি করবে! সভায় যেতে হবে তোমায়— কোমর বাঁধো।'

'সভা?'

'কেন, কেষ্টবাবু আর মোহন না থাকলে বুঝি সভা হয় না? দেশে আর লোক নেই? ছোট একটা দল বেরোচ্ছে গাঁ ঘুরতে, আসবে তো চলে এসো। ওবেলা সভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে কি ভাবে তোমার বাপ মরেছে, গাঁয়ের সেটা কতবড় কলঙ্ক। বলতে বলতে কেঁদে ফেললে চলবে না কিন্তু।'

সিধে হয়ে বসে দু'হাতে মুখ থেকে এলোমেলো চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রম্ভা বলে, 'গাঁয়ের লোক কি আসবে? যা ভীরু সব ছাগল ভেড়ার মত!'

শম্ভু হেসে বলে, 'ওরাই কেমন সিংহ হয়ে ওঠে দেখো। না, সিংহ নয়, বাঘ। সূর্য্যদা বলত মনে নেই, বাংলার গাঁয়ে বাঘ থাকে?'

'চলো যাই।' বলে সেই বেশে শম্ভুর সঙ্গে যাবার জন্য রম্ভা উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের মধ্যে চৌকীতে বসে ম্লান বিরস মুখে রামপাল রম্ভার দিকে চেয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এসে করুণ সুরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার তা দিয়ে দরকার?' রম্ভা বলে পাক দিয়ে তার দিকে ঘুরে, 'তুমি যাও না, মদের পেসাদ পাওগে হেরম্বের।'

রামপাল কাতর হয়ে বলে, 'কেন ওকথা বলছ একশোবার? আমি কি যেচে গিয়েছি? হীরেনবাবু জোর করে নিয়ে গেল তো আমি কি করব।'

'তুমি কি করবে! তোমার জোর নেই? চেহারাটি তো গুণ্ডার মত।'

'নেশার মাথায় আছি, হীরেনবাবু জোর করলেন—'

রম্ভা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। রামপালের মুখে তার হৃদয় মনের ছাপ রম্ভার চেনা, লজ্জায় অনুতাপে তার মনটা জ্বলছে স্পষ্টই টের পাওয়া যায়।

'এসো মোদের সাথে। রাস্তায় চেঁচাতে হবে. হেরম্ব নিপাত যাক, হেরম্ব নিপাত যাক। হেরম্ব বন্দুক নিয়ে আসুক, পুলিশ এসে ধরে নিক, থামতে পারবে নি। আসবে? বুকের পাটা আছে?'

রামপাল চুপ করে থাকে। কাল রাত্রের দেশী বিলাতীর প্রতিক্রিয়ায় এখনো তার মাথা অনেকটা ভোঁতা হয়ে আছে। রম্ভা কি ক্ষেপে গেছে? এ গাঁয়ে সে বিদেশী, এ গাঁয়ের সে জামাই, পথে পথে সে হল্লা করবে মাতালের মত, হাঙ্গামা বাধাবে, পুলিশের হাতে পড়বে!

রম্ভা ধিক্কার দিয়ে বলে, 'যাও তুমি, কলকাতা ফিরে যাও। কাঠ চেরোগে আর তাঁবেদারি করগে হীরেনবাবুর।'

বলে শশুর সঙ্গে রম্ভা গট গট করে চলে যায়।

জীবনলাল ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়।

'তুমি যেন কেমন ধারা লোক বাবু। কি বলে যেতে দিলে ওকে?'

'ওকি আমার কথা শোনে যে আটকাব?'

জীবনলাল আপশোষ করে বলে, 'পুরুষ মানুষ, বৌকে শাসন করতে পার না? চুলে ধরে মারতে পার না দু'গালে তিন চড়? মোদের ডুবিয়ে ছাড়বে এবার। এই কাণ্ড চলছে চাদ্দিকে, রাস্তায় উনি হৈচৈ করতে গেলেন।'

রামপাল জানতে চায় ব্যাপার কি। এ পর্য্যন্ত সে ঘর থেকে বার হয়নি, রম্ভার কাছে শুধু শুনেছিল কৃষ্ণেন্দু ও মোহনলালের গ্রেপ্তারের কথা। গাঁয়ের উদ্ধত উপদ্রব অশান্তির লক্ষণগুলির বিবরণ জীবনলাল তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। তাদের বাড়ীর কাছে রাঘব মহান্তি গোড়ায় দোকান বন্ধ করতে না চাওয়ায় ঝাঁপ নামিয়ে তাকে সুদ্ধ বাইরে থেকে দোকান বন্ধ করার কাজে উপস্থিত খদ্দেরদের, চির-দিনের শান্তপ্রকৃতি বয়স্ক লোকদের পর্য্যন্ত, ছেলে ক'জনের সঙ্গে যোগ দিতে দেখে জীবনলাল রীতিমত ভড়কে গিয়েছে।

'এর মধ্যে ওকে তুমি যেতে দিলে, ছেলাপিলা হবে মেয়েটার? এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নেই?' জীবনলাল ঝাঁঝের সঙ্গে মন্তব্য করে।

রামপাল ভড়কে গিয়ে বলে, 'বটে নাকি! অ্যাঁ?'

দশবারজনের ছোট একটি দল রম্ভাকে সামনে নিয়ে বার হয়, ঝুমুরিয়া ঘুরে পাঁচনিখের দিকে যাবে। মহীউদ্দীনও সঙ্গে থাকে। সকলের সঙ্গে গলা মিশিয়ে রম্ভা চেঁচায় 'অত্যাচারীরা ধ্বংস হোক!' 'হেরম্বেরা নিপাত যাক!' 'চাষী মজুরের জয় হোক!' সভার কথাও ঘোষণা করা হয়। রম্ভার গলা সবচেয়ে বেশী খোলে 'হেরম্বরা নিপাত

যাক’ বলে চেঁচাতে। রুক্ষ চুল তার এলোমেলো হয়ে আছে, রোদের ঝাঁঝে মুখ হয়েছে ঝামা রঙ, কপালে সিন্দুরের টিপ ঘামে গলে হয়েছে সিঁদুরের ফোঁটা, ডান হাতে সে মুঠো করে ধরে আছে আঁচলের প্রান্ত। গ্রামের লোক সভয় বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, রক্তে অনুভব করে হঠাৎ জাগা চাঞ্চল্য। নতুন লোক জুটে জুটে ছোট দলটি ক্রমাগত বড় হয়ে পড়বার উপক্রম ঘটে, মহীউদ্দীন তাদের সরিয়ে দেয়, বলে, ‘আমাদের সঙ্গে নয়—সভায় আসবেন, সভায়। অন্যদিকে যান—দশজনকে খবর দিন।’

দলটি উত্তরপাড়া ঘোরা শেষ করেছে রামপাল এসে দলে মিশল। রম্ভার পাশে চলতে চলতে বলল, ‘আর না, এবারে ফিরে চল। তোমার তোমার শরীর ভাল না—’

রম্ভা ভ্রূকুটি করে তাকাল, কথা কইল না।

রামপাল আর কিছু বলতে ভরসা পায় না, নানা কথা ভাবতে ভাবতে দলের সঙ্গে চলতে থাকে। হঠাৎ সে বজ্রনাদে চীৎকার করে ওঠে,—‘হেরম্বকে খুন করো! হেরম্বকে খুন করো!’

‘আরে! আরে! আরে!’ মহীউদ্দীন ধমকে ওঠে, ‘কি করছ তুমি? কি বলছ পাগলার মত?’

রামপাল অসহায়ের মত রম্ভার দিকে তাকায়।—‘তুমি যে বললে?’

‘আমি ওকথা বলতে বলেছি? আমরা কি বলছি শুনতে পাওনা, হেরম্বেরা নিপাত যাক?’

‘ও, হাঁ। ভুলে গেছিলাম।’ রামপাল সলজ্জভাবে হাসে, ‘মাথার কি ঠিক আছে ছাই। ছেলাপিলা হবে তোমার, তুমি এ রোদের মধ্যে—’

আবার রম্ভার ভ্রূকুটি দেখে রামপাল থেমে যায়।

পাঁচনিখে পৌঁছে রম্ভার শরীর একটু অস্থির অস্থির করতে থাকে,

তলপেটে একটা এই-আছে-এই-নাই অস্বস্তি পাক দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। রোদের তেজ বাড়তে বাড়তে এখন মাথার তালু পুড়িয়ে দিচ্ছে, রাস্তা গরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ থেকে জোরালো হাওয়া না বইলে সকলে তারা আরও বেশী কাবু হয়ে পড়ত। পাঁচনিখের থানার কাছাকাছি রস্তায় হঠাৎ এত জোরে বমি ঠেলে ওঠে যে সে সামলাতে পারে না। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে সে বমি করতে বসে।

চুণকাম করা সাদা দেয়াল থানার, খড়ের পুরু চালা। সামনে কাঁকর বিছানো পথে দু'ভাগ করা ছোট বাগান, তাতে সযত্নে সাজানো ফুলের গাছ। দু'ঘণ্টা আগে একটা রিপোর্ট লিখতে বসে শৈলেন দাস আর চেয়ার ছেড়ে ওঠে নি। সামনে মাত্র কয়েকলাইন লেখা রিপোর্টটা পড়ে আছে। তার উপরে খোলা ফাউন্টেন পেন। পেনটি শৈলেন স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল কিন্তু থার্ড ক্লাসের বিদ্যা নিয়েও কল্যাণী মাসে অতিকষ্টে দু'খানার বেশী চিঠি কখনো লেখে না। কলমটা তাই শৈলেন নিজেই ব্যবহার করে। রিপোর্ট লিখতে আজ তার মন বসছিল না। বিরক্তি আর বিষাদ মেশানো তিক্ততা তাকে উন্মনা করে রেখেছে। মন ভার, বুকে একটা অনির্দিষ্ট নালিশের জ্বালা, কার বা কিসের বিরুদ্ধে জানা নেই। দু'বছর প্রমোশন বন্ধ। জীবনে বুঝি কিছু করা গেল না। কলেজ জীবনের কথা শৈলেনের মনে পড়ে। ভেসে আসে বন্ধুদের কথা, আদর্শের তর্ক, উত্তেজনা, আনন্দ, বিষাদ ও স্বপ্ন। চারিদিক থেকে নানা খবর এসে পৌঁছয়। কল্পনায় অতীত জীবনের বন্ধুরা সারি দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আয়, খবর নিয়ে খেলা করি।

মহীউদ্দীনের দলের আওয়াজ দূর থেকে কানে আসে। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কি করা যায়। হে ভগবান, কি করা

যায়। আবার কেন? শেষ হয়ে সব চুকে বুকে যেতে পারে না একেবারে?

জমাদার এসে বলে, 'হুজুর?'

নাঃ, চারিদিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। মন খারাপ করলেও চলবে না, মাথা গরম করলেও চলবে না।

'কেতনা আদমি?'

'পন্দরো হোগা।'

'ঠিক হায়। যানে দেও।'

কাছাকাছি এসে আওয়াজ থেমে যাওয়ায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শৈলেন বাইরে গিয়ে কনেষ্টবল ধরণীকে জিজ্ঞাসা করে 'ফিরে গেল?'

'আজ্ঞে না। সঙ্গে একটা মাগী ছিল, বমি করছে। বীরেশ্বরের মেয়ে।'

হঠাৎ কেন রাগ হয়ে গেল শৈলেন জানে না। সজোরে সে এক চপেটাঘাত বসিয়ে দিল ধরণীর গালে।

'মাগী কিরে শূয়ার?'

দুপুরে হেরম্ব এল।

'সভাটার ব্যবস্থা করতে হবে শৈলেনবাবু!

নোটের তাড়াটা মুঠো করে শৈলেন বলে, 'সে তো এমনিও করব ওমনিও করব। কেন মিছিমিছি—

হেরম্ব সবিনয়ে হাসে। 'কি যে বলেন!'

একটু সুস্থ হলে রম্ভা বলে, 'তোমরা এগোও। আমি একটু জিরিয়ে—'

শম্ভু জোর দিয়ে বলে, 'বাড়ী ফিরবে। একটা গাড়ী পেলে হত।'

মহীউদ্দীনও সায় দেয়, জোর দিয়ে বলে, 'তোমার আর আসতে হবে না। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।'

রম্ভা বলে, 'আচ্ছা। তোমরা তবে এগোও শম্ভু, আমি ওর সাথে ফিরে যাব। গাড়ী দরকার হবে না।'

তেঁতুল গাছের ছায়ায় রম্ভা ও রামপালকে রেখে অন্য সকলে এগিয়ে যায়। দূরের সমুদ্রের বাতাস গাছের পাতায় ঝির ঝির আওয়াজ তুলে বইতে থাকে, রম্ভার শরীর ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে। রামপাল চুপচাপ বিড়ি টানে, গম্ভীর মুখে মাঝে মাঝে ভৎ‍র্সনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। দেহমনে জুত পেলে রম্ভা একটু হাসে তার দিকে চেয়ে।

'বলিস নি যে আমায়?' গভীর অভিমানে রামপাল অনুযোগ দেয়।

'বলতে হবে কেন? চোখ নেই কো তোমার?'

রম্ভার সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে রামপাল শুধোয়, 'ক' মাস?'

'তিনমাস চারমাস, কে জানে বাবা, অত কে জানে!'

'বললাম এ রোদে বেরোস নি, বেরোস নি। গোঁয়ার মেয়ে বটে তুমি। হলত এবার?'

রম্ভা তবু হাসে, 'কি হল? একটু বমি হল তো কি। ও সবার হয়।'

শম্ভুরা একটা গরুর গাড়ী পাঠিয়েছিল, গাড়ী এসে পৌছবার আগেই দুজনে উঠে চলতে আরম্ভ করে। রামপালের গাড়ী সংগ্রহ করে আনার কথা রম্ভা কানেও তোলে না। চলতে চলতে রম্ভা টের পায়, তাকে নিয়ে চারিদিকে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েলি চোখ উঁকি দেয়, বাইরে পুরুষেরা চোখ বড় বড় করে তাকে ত্যাখে। এ ওর গা টিপে তাকে দেখিয়ে দেয়, আড়দৃষ্টি তার পানে রেখে কথা বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। হাসাহাসিও চলে এখানে ওখানে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। কৌতূহল, বিস্ময় আর উত্তেজনাই বেশী।

ঝুমুরিয়ার রঘু সামন্তের বাড়ীর সামনে অনাথকে ঘিরে কয়েকজন জটলা করছিল, তিরিশ থেকে বিশ বছরের সব ছোকরা। রম্ভাকে

দেখেই তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, আরম্ভ হয় অভদ্ররকমের হাসাহাসি আর মন্তব্য—রম্ভা আর রামপাল কাছে এলে তারা যাতে শুনতে পায় এত জোরে। রামপাল থমকে দাঁড়াতে রম্ভা তার হাত চেপে ধরে জোর করে টেনে এগিয়ে যায়। এখানে একজন সুর করে গান ধরে 'রম্ভা দিদিলো—'

গান তার সুরুতেই আচমকা থেমে যায়।

নরেশের হাতের মস্ত এক মাটির চাপড়া তার মুখে এসে লেগে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নরেশ যে কখন তাদের পিছু নিয়েছিল রম্ভা বা রামপাল টেরও পায় নি।

নরেশের দিকে তেড়ে যেতে গিয়ে অনাথের দল সামনে পড়ে রামপালের। দু'জনের ঘাড় শক্ত করে ধরে রামপাল অন্যদের দিকে সজোরে ঠেলে দেয়, সেই ধাক্কায় পাঁচজন আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তায়। উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে নাগালের বাইরে গিয়ে তারা গাল দিতে আর শাসাতে সুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিকে রটে যায় যে ঘোষপাড়ায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। হেরম্বের লোকেরা রম্ভাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, পাড়ার লোক মিলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি গুজবটা ছড়ায় যে রম্ভারা বাড়ী পৌছানোর আগেই হাঙ্গামার খবরটা সেখানে পৌছে যায়। জীবনলাল রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল, রম্ভা বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র সে চীৎকার করে ওঠে, 'বাড়ী ঢুকছিস লজ্জা করে না? বেরো তুই, বেরো বাড়ী থেকে।'

শ্যামলাল ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আঃ, মাথা গরম করছ কেন?'

জীবনলালের তখন চৈতন্য হয় যে রম্ভার মত বোনকে চটানো সঙ্গত নয়, পিছনে তার অনেক শক্তিশালী লোক আছে। রম্ভার সঙ্গে সে

গোলমাল করেছে ফিরে এসে একথা শুনলে মোহনলালও কি করে বসবে ঠিক নেই। রম্ভাও যদি গাঁয়ের কটা গুণ্ডা ছোঁড়াকে লেলিয়ে দেয় তার পিছনে! একেবারে সুর বদলে সে তাই বড় ভায়ের সঙ্গে অনুযোগ জানায়, 'ত্যাখ দিকি তুই কি আরম্ভ করেছিস। গাঁয়ে মুখ দেখাবার উপায় রাখলি না।'

জীবনলালের বৌ মন্তব্য করে একটু তফাৎ থেকে, 'কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাবু গেরস্ত ঘরে! বাপের জন্মে এমনটি দেখি নি আর!'

রম্ভা নাক সিঁটকে জবাব দেয়, 'বাপের জন্মে দেখবে কিসে, কেমন বাপে জন্ম দিয়েছে সেটা তো দেখতে হবে।'

বৌ গলা ছাড়া মাত্র জীবনলাল ধমকে তাকে থামিয়ে দেয়, রম্ভাকে মিনতি করে বলে, 'যা না দিদি তুই এবার কলকাতা ফিরে? রেহাই দে মোদের?'

রম্ভা বলে, 'যাব গো, যাব। থাকতে আসি নি তোমাদের বাড়ী আজ কালের মধ্যেই যাব, তোমাদের বাপের মরণের একটা বিহিত করে।'

৫

দুপুর থেকেই লোক আসতে সুরু করে বটতলার মাঠে। রোদকে অগ্রাহ্য করে দুক্রোশ পথ হেঁটে এসে মানুষ প্র- বটগাছটার ঘন ছায়ায় বসে ঘাড় মুছে গামছা নেড়ে হাওয়া খ-রে গোড়ায় দু'চারজন, তারপর বেলা একটু পড়ে এলে পিল পিল ক- চারিদিকের গাঁ থেকে মানুষ আসা আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে লোকা- হয়ে ওঠে বটতলার মাঠ। বড় মেলায় এরকম জনতা হয়, স- রিয়ায় আজ পর্য্যন্ত কোন সভায় এত লোক জমতে কেউ দ্যা- উত্তেজিত মানুষের এমন ভিড়। ভীরু ও দুর্ব্বল একক মনে মানুষের বিরাট সান্নিধ্য তেজস্কর সঞ্জীবনীর কাজ করে, ভীরুতা দু- চাপা পড়ে জাগে বেপরোয়া সাহস।

মহীউদ্দীন, শম্ভু এরাও এতটা ভাবতে পারে নি। লোক যথেষ্ট হবে এটা তারা জানত কিন্তু এমন ভিড় হবে আর আগে থেকেই সকলে এত গরম হয়ে থাকবে, এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। তারা ক'জন সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করে। অন্য কর্মীদের সাবধান করে দেয়। দুরন্ত, অদম্য উল্লাসে রম্ভা এবং আরো অনেকের রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। রামপালের লড়ায়ের কামনা উগ্র হয়ে ওঠে, কাঠ গোলার হাঙ্গামার দিন যতটুকু হয়েছিল তার [illegible] বেশী।

শৈলেনও এটা ভাবতে পারে নি। জনতার দিকে তাকিয়ে, [illegible] কমিয়ে জনতাকে সংযত করতে অপটু অনভিজ্ঞ মহীউদ্দীন [illegible] গলদঘর্ম্ম হতে দেখে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। সে প্রস্তুত [illegible] এসেছে, কিন্তু এ অবস্থার জন্য নয়। এই জনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবার ক্ষমতাও তার নেই, আগে জানলে সদরে খবর [illegible] ব্যবস্থা করতে পারত। তার সময়ও আর নেই। শৈলেন [illegible] র, একেবারে নিষ্ক্রিয় থেকে কোন মতে সভাটা হয়ে যেতে [illegible] ন শ্রেয়, আর কোন উপায় নেই। সমবেত এই জনশক্তিকে একটু টাতে গেলেই আজ বিপদ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। মহীউদ্দীন [illegible]ার শম্ভুরাই একমাত্র ভরসা, যদি পারে ওরাই এদের সামলাতে পারবে।

তাড়াতাড়ি একটা চিট লিখে সে হেরম্বের কাছে পাঠিয়ে দেয়। [illegible] গুরুতর, হেরম্ব যেন তৎক্ষণাৎ তার লোকদের সভায় হাঙ্গামা [illegible] বারণ করে নির্দ্দেশ পাঠায়, নইলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

চিট পড়ে হেরম্ব মনে মনে হাসে। শৈলেন ভয় পেয়ে গেছে! [illegible]তর হাঙ্গামাই তো সে চায়! হাঙ্গামা হোক, লাঠি আর গুলি [illegible]ক, গণ্ডায় গণ্ডায় জখম হোক আর মরুক, শৈলেন আর দু'চারজন

পুলিশ যদি খুন হয় তো আরো ভাল, পুলিশে গাঁ ছেয়ে যাক, দলে দলে ধরা পড়ুক, এমন শিক্ষা পাক যেন চিরদিনের জন্ম বাছাধনেরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাথা তুলতে আর সাহস না পায়।

বটতলার মাঠ থেকে হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনি অস্পষ্ট ভেসে আসে। ভরা বন্দুকের মসৃণ নলে হাত বুলিয়ে হেরম্ব গ্রাস মুখে তোলে।

সূর্য্য যখন ডুবু ডুবু, হেরম্বেরই গাঁইতি কোদাল শাবল দিয়ে তৈরী রাস্তা খোঁড়া আরম্ভ হল, পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তার লরী আর তাঁবুতে, বন্দুকের গুলি খেয়ে হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মরে গেল, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পোড়ানো হল তার বাড়ীর দক্ষিণের চালাঘরের আগুনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুন ধরল বীরেশ্বর ও ঝুমুরিয়ার আরও পাঁচটি বাড়ির চালায়। একদল লোক গিয়ে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে এল। শৈলেন আগেই বটতলার মাঠে মারা গিয়েছিল। সভায় আরও মরেছিল তেরজন লোক আর দু'জন পুলিশ। তার মধ্যে ছিল জগৎ দাসের ছেলে শিশু। জখম হয়েছিল বহুলোক।—

দু'দিন পরে আরিফ ও মমতা ঝুমুরিয়া ষ্টেসনে নামল। নরেশের খোঁজ নিতে পরেশ এবং কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ নিতে পূর্ণেন্দু তাদের সঙ্গে এসেছে। ঝুমুরিয়া ও আশেপাশের গাঁয়ের কয়েকজন সদরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল, বাপ দাদা ভাই ছেলের জামিনের জন্য সদরে গিয়ে চেষ্টা করবে। তাদের মুখ ম্লান, বিষণ্ন।

'মিছে যাচ্ছেন। বাইরের লোককে গাঁয়ে যেতে দিচ্ছে না।'

আরিফ বলে, 'দেখি চেষ্টা করে।'

কাগজে সংক্ষেপে খবর বেরিয়েছিল, ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ এদের কাছে জানা গেল।

মমতা বলল, 'ইস্! কেষ্টদা থাকলে এসব কিছুই হত না, কেষ্টদা সামলে নিতে পারত।'

'আমরাও তাই বলি। কৃষ্ণেন্দুবাবু আর মোহনলাল গাঁয়ে থাকলে এ কাণ্ড হত না। লোক উঠল ক্ষেপে, গাঁয়ে একটা যোগ্য লোক নেই, কে তাদের সামলায়?'

মমতা শুধোয়, 'রম্ভার খবর জানেন কেউ? বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা?'

'তাকে ধরে নিয়েছে। জেল হবে ক'বছর।'

পরেশ শুধোয়, 'নরেশ বলে একটি ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে—'

'হাঁ, বীরেশ্বরের ঘরে ছিল। তার কোন পাত্তা নেই আজ তক।'

'মারা গেছে?'

'মারা গেলে তো জানা যেত, দেহটা থাকত। ছেলেটা একেবারে নিখোঁজ।'

সদরের গাড়ী চলে গেলে লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে চারজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে বাঁক ঘুরে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যায়। গাড়ী থেকে যে কজন নেমেছিল, ষ্টেসন থেকে বেরিয়ে তারাও চোখের আড়াল হয়। ওরা কোন গাঁয়ে যাবে কে জানে।

সমাপ্ত